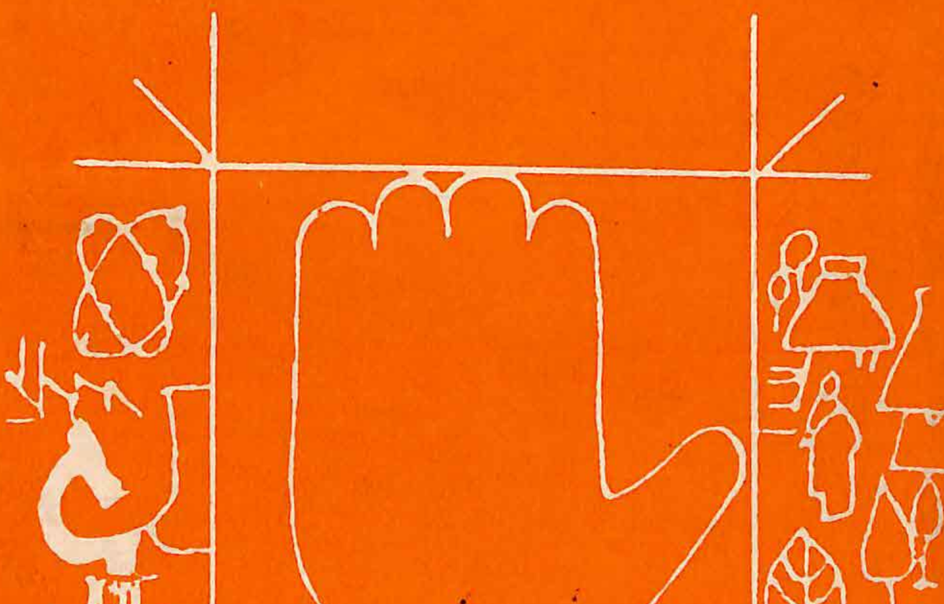
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ



উৎস মানুষ সংকলন

৮৪২

S.C.E.R.T., W.B. LIBRARY 31.7.01
Date
Acc. No. 10127

BIJNAN JYOTISH SAMAJ an Utsa Manush Samkalan ; Price Rs. 14.00

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪,
তৃতীয় প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৫, চতুর্থ প্রকাশ : জুন ১৯৮৮

প্রকাশক : উৎস মানুষ, পবন মুখোপাধ্যায়, বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪

মুদ্রণ : প্রিন্টিং সেন্টার, কাশীনাথ পাল, ১৮ বি ভুবন ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

বাঁধাই : নিবারণ সাহা

দাম : চোদ্দ টাকা

প্রসঙ্গ : চতুর্থ সংস্করণ

আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিপুণ চতুরতায় জ্যোতিষ যখন তার ব্যাধি-সংক্রমণের স্রোতকে বহমান রাখছে, তখন আমরাও মনে করেছি বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি আর অন্ধবিশ্বাস-বিরোধী চেতনাকে আরো গভীর প্রত্যয়ে এবং ধৈর্যশীল ব্যাপকতায় সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমাগত পৌছে দেওয়া দরকার। আর, বই-ইতো চেতনার অন্যতম হাতিয়ার। এতএব 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ' চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন সাধন জরুরী হলো।

আগের লেখাগুলির পরিমার্জন বিশেষ হয় নি। নতুন কয়েকটি রচনা সংযোজিত হয়েছে (যেগুলি অবশ্যই, যথারীতি, উৎস মানুষ-এ প্রকাশিত হয়েছিল)। যেমন, প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীরা পরীক্ষায় ফেল, গণৎকার…ঝনৎকার, বসু বিজ্ঞান মন্দির ও জ্যোতিষ চর্চা, অষ্টধাতুর নষ্টামি, ইত্যাদি। আর একটি কাজ করা হয়েছে; প্রত্যেকটি রচনার শেষে সেটি উৎস মানুষ-এ কবে প্রকাশিত হয়েছিল তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে পাঠক সেই সেই রচনার পরিপ্রেক্ষিতটা প্রয়োজনে চিনে নিতে পারেন। অপরিহার্য কারণে অবধারিতভাবেই বই-এর দাম বাড়াতে হয়েছে। আশা করি উৎস মানুষের পাঠক বন্ধুদের এ নিয়ে কৈফিয়ত দাখিল করতে হবে না। এবং সবশেষে, এই সংস্করণের গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের প্রাপ্য, সেটা যেন পাই।

পরিচালকমণ্ডলী

উৎস মানুষ

নামে 'জ্যোতিষ' হলেও শুধুমাত্র জ্যোতিষ (Astrology)-এর মধ্যে এই বই-এর বিষয়সূচীকে ধরে রাখা হয় নি। জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজ, মানবমন, পঞ্জিকা, ভাগ্য, লটারি, হস্তরেখা, ভুয়া-বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক দিকগুলিকেও রাখা হয়েছে সামগ্রিক আলোচনার স্বার্থে। এক বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে আজকের মানুষ ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, পূর্বজন্ম-পরজন্ম, নিয়তি-নির্দেশিত জীবন—ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক বোধের শিকার এবং সেই পটভূমিই হলো জ্যোতিষ-বিশ্বাসের লালনগৃহ। তাই জ্যোতিষ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করতে গেলে গোটা সামাজিক ছবিটার প্রয়োজন।

'মানুষ নিজেই তার ভাগ্য গড়ে নেয় ; Man is the architect, of his fate'—ছেলেমেয়েরা আজও পরীক্ষার খাতায় এই বিষয়ে রচনা লিখছে অথচ রাস্তাঘাটের বিজ্ঞাপনে, পথচলতি কথাবার্তায়, বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তারা দেখছে কিভাবে ঠিকুজি-কোষ্ঠী, ভাগ্য, গ্রহরত্নের প্রতি অন্ধ-নির্ভরতা দিব্যি বেঁচে আছে। একটি কিশোর এভাবেই বড় হচ্ছে এক বিভ্রান্তিকর বাতাসে।

বৈজ্ঞানিক বিচারের মধ্যে দিয়ে ভুয়া-বিশ্বাস আর পিছিয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর ধারণাকে চিনিয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিছক আক্রমণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে নিম্ন আয়ের মানুষটি শেকড়, পাথর, অষ্টধাতু বা ঘোড়ার নাল বিক্রি করে বা হাত দেখে আধপেটা খেয়ে বাঁচে তার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ মানুষের সুস্থ অগ্রগতির স্বার্থে এদের বিপর্যস্ত হওয়া তো অবধারিতই! চলতি দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত 'রাশিফল', 'আজকের দিনটি', 'সপ্তাহ কেমন যাবে' ইত্যাদি মানবমনকে পঙ্গু করে ; কায়েমী মহলের এই ক্ষতিকারক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও বিজ্ঞান-মনস্কতার জেহাদ দরকার। তবে রাগ-আক্রোশে গলা ফাটিয়ে নয়, ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই সে প্রত্যাঘাত কার্যকর হতে পারে। আর এ-সবের জন্যই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর, প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর নির্ভেজাল নির্ভরতা।

বহুলোক জেনেশুনেও রত্ন-আংটি-মাদুলি-বালা পরেন বিশেষ মানসিক অবস্থায়।

হতাশাক্লিষ্ট, সমস্যাজর্জরিত, অসহায় মনের অবলম্বন যখন হয় জ্যোতিষ, তখন সেই ব্যক্তিকে যুক্তি-তর্ক-জ্ঞান দিয়ে মুক্তির পথ দেখানো যায় না। যে বাস্তব অবস্থার জন্য তার স্বাভাবিক সাম্য হারিয়েছে, সেই অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া পর্যুদস্ত মনকে সুস্থির করা বোধহয় সম্ভব নয়।

অবশ্য পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য হারানোটা সাধারণ চিত্র নয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বাভাবিক অবস্থাতেই নিরাপত্তাহীন জীবনে সহজে পরিত্রাণ পাওয়ার লোভে কিংবা হঠাৎ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অন্ধ প্রত্যাশায় জ্যোতিষজাতীয় গুপ্তবিদ্যার কাছে আত্মসমর্পন করে। ফল দাঁড়ায়—অগণিত দুর্বলচিত্ত, কর্মোদ্যোগহীন, আত্মবিশ্বাসবর্জিত মানুষে ঠাসা এক সমাজ।

তাই সবার আগে দরকার বিজ্ঞানের কীটনাশক দিয়ে ভুয়া-বিদ্যার ভ্রান্তিকে নিধন করা। এ কাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ও অবৈজ্ঞানিক বোধসম্পন্ন বিজ্ঞানী। এরা নানা অপযুক্তি দিয়ে, ধোঁয়াটে ব্যাখ্যা দিয়ে, ফলিত-জ্যোতিষকে সমর্থনের চেষ্টা করেন। ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় ভীষণভাবে। নিজের প্রতিষ্ঠানে বা পরীক্ষাগারে একজন যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানী, অথচ পরিবারে বা সমাজ-জীবনে তার আচরন সম্পূর্ণ বিপরীত নিয়মে চলে; পদার্থবিজ্ঞানে 'বস্তুর নিত্যতা সূত্র' পড়ান যে অধ্যাপক তিনিই গুরু-বাবার শূন্য থেকে 'বিভূতি' আনার ঘটনায় বিমোহিত হন; নিজের হাতে ছুরি ধরে রোগীর প্রাণ রক্ষা করেন যে ডাক্তার তিনিই কপালে হাত ঠেকিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকেন। শিক্ষিত সমাজের এই গোঁজামিলে ভরা মন ও আচরণ সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে এক বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। এই পরিচয়টি পাওয়া দরকার সকলের।

সত্যি বলতে কি, জ্যোতিষচর্চার কার্যকারিতা দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতিষীর প্রতি মক্কেলের ভরসার মাত্রার ওপর। জ্যোতিষীবিদ্যা যদি তার প্রাচীন তত্ত্ব আর এই মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকাটুকুর দাবি নিয়েই আত্মতৃপ্ত থাকতো তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এই বিদ্যা বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ-বিরোধী হয়েও আবার বিজ্ঞানেরই সমর্থন খুঁজতে চায়, বিজ্ঞানেরই খোলস গায়ে চড়াতে চায় আপন মর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। গোল বাঁধে তখনই—জটিল চক্রটা জটিলতর হয়।

এই ছোট বইটি পড়েই পাঠক সচেতন হয়ে উঠবেন—এমন ভাবনা আমাদের নেই। আমরা শুধু এটুকুই চাই যে, মানুষ নিজের চিন্তাকে নিজেই পরিচ্ছন্ন করে তুলুক। জ্যোতিষ যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে, যাচাইযোগ্য পদ্ধতিতে, সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়ায় কারুরই আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু কট্টর জ্যোতিষবিশ্বাসী ও পণ্ডিতদের কাছে

আমাদের বক্তব্য সহজে গৃহীত হবে বলে মনে হয় না, কেননা বিজ্ঞানসচেতন মানুষদের তারা বড় অপছন্দ করেন। বিজ্ঞানকে খণ্ডন করার মতো যুতসই তথ্য-তত্ত্বের সংস্থান না থাকায় তারা দার্শনিকের ভূমিকা নেন। গত ৩০শে আগস্ট ১৯৮১ তারিখে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটী হল-এ 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি' যে জ্যোতিষ সম্মেলন আহ্বান করেছিল তাতে প্রধান অতিথির ভাষণে জ্যোতিষ-বিরোধী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের উদ্দেশে বলা হয়:

"আমরা জানি এরা অজ্ঞ। এদের
ঘৃণা করব না, শুধু মানবপুত্র যীশুর
মতো প্রার্থনা করব-হে ঈশ্বর,
এরা জানে না এরা কী করছে,
তুমি এদের ক্ষমা করো।"

জ্যোতিষমার্তণ্ডদের এর চেয়ে বড় 'যুক্তি' বোধহয় আর নেই।

'উৎস মানুষ' পত্রিকার অক্টোবর-নভেম্বর '৮২ সংখ্যাটি 'বিশেষ জ্যোতিষ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। এর সব ক-টি কপি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর অল্প কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করে বই হিসেবে প্রকাশ করা হলো। সাধারণ পাঠকদের কাছে সহজলভ্যতার কথা মনে রেখে এর দামও যথাসম্ভব কম রেখেছি আমরা।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎস মানুষ-এর পক্ষে

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

নতুন করে বলার বিশেষ কিছু নেই। যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে 'বিজ্ঞান-জ্যোতিষ-সমাজ'কে আমরা সাধারণ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছিলাম সেই লক্ষ্য-আদর্শ পরিবর্তিত হওয়ার প্রশ্ন আসে নি, বরং অভিজ্ঞতার দৌলতে আমাদের পদক্ষেপে পরিণতি এসেছে ; এই বইটির মাধ্যমে অনেক সমাজমুখী বিজ্ঞান সচেতন সংগঠক ও প্রগতিশীল বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগসূত্র খুঁজে পেয়েছি আমরা। ব্যবসা-সর্বস্ব বাজারী বই-এর জঙ্গল থেকে বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজকে বহু মানুষ যে স্ব-প্রয়াসে আবিষ্কার ও সংগ্রহ করে নিয়েছেন তার সম্যক প্রমাণ হলো কোনরকম বিজ্ঞাপন বা ব্যবসায়িক প্রচার ছাড়াই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে এক বছরের মধ্যেই।

বর্তমান সংস্করণে পরিবর্তন বিশেষ হয় নি, রচনাগুলির অল্প-সল্প পরিমার্জন হয়েছে মাত্র। সর্বস্তরের পাঠক ও সংগঠকদের কাছে আমাদের সেই একুই অনুরোধ আবারো তুলে ধরছি—এই বইটি এবং উৎস মানুষ পত্রিকার মূল আদর্শকে কার্যকর করতে আপনারা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা ও সমালোচনা করুন, আলোচিত বিষয় বা সমস্যাগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের আরো বেশি অভিজ্ঞ করুন এবং সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা—বই'এর পাতা থেকে কাজের মাটিতে নেমে আসতে আমাদের সাথী করুন।

পরিচালকমণ্ডলী
উৎস মানুষ

তৃতীয় সংস্করণে যেটুকু বলার

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। না, ব্যবসায়িক প্রচার এবারও আমরা কিছুই করি নি, তবুও সচেতন পাঠক, হাজার বই-এর ভিড়ে, খুঁজে যে নেবেন এ প্রত্যাশাটুকু আমাদের ছিল। এই সংস্করণে পরিমার্জন কিছু করা হলো না, তবে '৮৫ সালে 'উৎস মানুষ'-এ প্রকাশিত দুটি লেখা সংযোজিত করা হলো।

পরিচালকমণ্ডলী
উৎস মানুষ

সূচীপত্র

পুরনো দিনের পৃষ্ঠা থেকে

ফলিত জ্যোতিষ

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রামেন্দ্রসুন্দর-এর বিজ্ঞান ও দর্শনে পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না। তার ঋজু সংস্কারমুক্ত মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জ্বলন্ত প্রতিফলন দেখা যায় এই 'ফলিত জ্যোতিষ' রচনাটিতে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'রামেন্দ্র রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড) থেকে নিচের রচনাংশটি উদ্ধৃত হলো। 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (পৃ ৩৫৩-৩৫৯) এই 'ফলিত জ্যোতিষ' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রদীপ' সাময়িকীতে, চৈত্র ১৩০৫ সংখ্যায় [ইং ১৮৯৯]। স. ম.

এ-কালে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করেন; তাঁহাদের একটা ভয়ানক দুর্নাম আছে যে, তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা এ জন্য যথেষ্ট তিরস্কারের ভাগী হইয়া থাকেন। সম্যক্ প্রমাণ পাইয়া তাঁহারা যদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের হেতু ঘটিত না ; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে যাঁহারা গালি দিবার সময় অত্যন্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ উপস্থিত করিবার সময় তাঁহাদিগকে একেবারে নিশ্চেষ্ট দেখা যায় ; এবং যখনই তাঁহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা যায় তখনই তাঁহারা প্রমাণের বদলে তত্ত্বকথা ও নীতিকথা শোনাইতে প্রবৃত্ত হন।

তাঁহারা তর্ক করিতে বসিবেন, রামচন্দ্র খাঁয়ের পুত্রের জন্মকালে বুধ গ্রহ যখন কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুত্র ভাবীকালে ফিলিপাইনপুঞ্জের রাজা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি ? ইহা অসম্ভব কিরূপে ?...

আবার চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, ইহা যখন কবি কালিদাস হইতে বৈজ্ঞানিক কেল্‌বিন পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতেছেন, তখন সেই চন্দ্র বৃহস্পতির সমীপস্থ হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃপীড়া কেন না ঘটিবে ? একটা যদি সম্ভব হয়, আর একটা অসম্ভব কিসে হইল ? বিশেষতঃ মহাকবি সেক্ষপীয়র যখন বলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন কত কি আছে যাহা মানবের জ্ঞানাতীত।

বাস্তবিক স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন কত বিষয় আছে, যাহা মানবের পক্ষে স্বপ্নাতীত। বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচকগণ যে তাহা না জানেন, এমনও নয়।

স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে কেন, এই মর্ত্ত্যেই দেখ, প্রীষ্টলী ক্যাবেণ্ডিশ লাবোয়াশিয়ার পর হইতে একশত বৎসরকাল আমরা রসায়নগ্রন্থে মুখস্থ করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমাদের অন্তরীক্ষে গোটা পাঁচেকের বেশী বায়ু নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই কয় বৎসরের মধ্যে সেই চিরপরিচিত অন্তরীক্ষমধ্যে অজ্ঞাতপূর্ব অশ্রুতচর কত নূতন বায়ুর অস্তিত্ব বাহির হইতে চলিল, এই পৃথিবীর যাবতীয় রসায়ন-গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করার প্রয়োজন হইয়া উঠিল; কয়েক বৎসর আগে ইহা কে ভাবিয়াছিল? বিধাতা অত্যন্ত যত্নের সহিত মনুষ্যের বীভৎস অস্থিকঙ্কালকে মোলায়েম মসৃণ ত্বকের আবরণের ভিতর সঙ্গোপনে রাখিয়া পেলীর ও তাঁহার শিষ্যগণের নিকট দূরদর্শিতার ও সৌন্দর্য-বুদ্ধির জন্য কত বাহবা পাইয়া আসিতেছিলেন, সহসা ক্রুক্স্ টিউবের ভিতর হইতে নূতন ধরনের রশ্মি বাহিরে আসিয়া সেই কঙ্কালকে প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাই বা কে জানিত!

অহো, সকলই যথার্থ; তথাপি বৈজ্ঞানিক আপনার জেদ ছাড়িবে না। সে বলিবে, সবই যথার্থ—জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। উল্কাবর্ষণে রাষ্ট্রবিপ্লব, যোগবলে আকাশবিহার ও মন্ত্রবলে পিশাচসিদ্ধি, কিছুই অসম্ভব নহে। অমুক ঘটনাটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের প্রতিকূল, অমুক ঘটনাটা শক্তির নিয়মের প্রতিকূল, ইত্যাদি বলিয়া তাহার অসম্ভাব্যতা সপ্রমাণ করিতে বসা ঠিক নহে। এমন কি, সেকালের বীরেরা দেবতার সহিত কারবার করিতেন এবং একালের বীরেরা উপদেবতার সহিত কারবার করেন, ইহাতেও অসম্ভব বলিয়া উপহাসের কথা কিছুই নাই। আমার বোধ হয়না, এ-কালের কোন বৈজ্ঞানিকের এরূপ দুঃসাহস আছে যে, তিনি যুক্তিবলে ঐ সকল ঘটনার অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন।…

তবে কোন একটা ঘটনার খবর পাইতে সেই খবরটা প্রকৃত কিনা এবং ঘটনাটা প্রকৃত কিনা, তাহা রেজিষ্টারির পূর্বে জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অনুসন্ধানকার্য্যই বোধ করি তাঁহার প্রধান কার্য্য। প্রকৃত তথ্যের নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। বরং তজ্জন্য তাঁহার বুদ্ধি নানা সংশয়ের উদ্ভাবন ও সেই সংশয় অপনোদনের বিবিধ উপায়, আবিষ্কার করে। আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য। আমরা যত সহজে কোন একটা ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া ফেলি, তিনি তত সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না, নানারূপ প্রমাণ অনুসন্ধান করেন। আমরা ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস নিতান্ত অসামাজিক কাজ ও অনুচিত কাজ মনে করি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের এই সামাজিকতা-বোধ অতি অল্প, তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না।

এইটাই বিজ্ঞানবিদের ভয়ানক দোষ ; তবে তাঁহার এই সংশয়পরতা কেবল অন্যের প্রতিই নহে, তাঁহার নিজের উপরেও তাঁহার বিশ্বাস অল্প। তিনি আপনার ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করেন না ও আপনার বুদ্ধিকেও বিশ্বাস করেন না। কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে, কখন্ কবে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও একটা স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিবেন এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা আকুল। তাঁহার যখন নিজের প্রতি এইরূপ সংশয়, তখন তাঁহার পরের প্রতি অবিশ্বাস ক্ষমাযোগ্য।

প্রমাণ সংগ্রহ যে সকল সময়েই অত্যন্ত কঠিন, এমন নহে। এমন অনেক নূতন ঘটনা সর্ব্বদা আবিষ্কৃত হয়, যাহাতে প্রমাণ খুঁজিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। মনে কর, সেদিন যে একটা নূতন প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল যে, এমন একরকম আলো আছে যাহার সাহায্যে বাক্সর ভিতর টাকা রাখিলেও ধরা পড়ে, মানুষের অস্থিকঙ্কালে হাড় কয়খানা, তাহা দেখান চলে। এই ব্যাপার সত্য কি না, তাহা প্রমাণ পাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটা কাঁচের গোলার ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া তন্মধ্যে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ পুনঃ পুনঃ চালাইতে থাক ও একখানা কাগজে একটা প্রলেপ মাখাইয়া আঁধার ঘরে সেই কাগজখানা ঐ গোলার সম্মুখে ধর ; উভয়ের মাঝে ধরিলেই সেই প্রলেপের উপর বাক্সর ভিতরের টাকার ছায়া ও হাতের হাড়গুলার ছায়া দেখিতে পাইবে। পাঁচ মিনিটের পরিশ্রমেই ব্যাপারটা যে-কোন ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এরূপ স্থলে ঘটনা সত্য কি না, প্রতিপন্ন করিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি আমার কোন বন্ধু আসিয়া বলেন, কাল রাত্রিতে চন্দ্রলোক হইতে একটা ভালুক আসিয়া আমার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া গিয়াছে ও সেই ভালুকের তিনটা চোখ ও লম্বা দাড়ি, তাহা হইলে আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কথাটা মিথ্যা বলিলে আমাকে বন্ধুর প্রেমে বঞ্চিত হইতে হইবে, আর সত্য মনে করিয়া অন্যের নিকট গল্প করিতে গেলে অন্যরূপ বিপদের আশঙ্কা রহিবে। অথচ ঘটনাটা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা কোন তার্কিকেই সাহস করিয়া বলিবেন না। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান লোক কি করিয়া থাকেন? বন্ধুর সত্যপরতায় তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও তিনি 'বানরে সঙ্গীত গায়' ইত্যাদি প্রবচন স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন ; কিন্তু ঘটনাটা মিথ্যা, কি সত্য, তাহা অপ্রতিপন্ন থাকিয়া যায়।

বস্তুত ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগের সংশয়ের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান, ততটুকু তাঁহারা পান না। তার বদলে কু-যুক্তি পান —চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা বাড়ে, ইত্যাদি

যুক্তি। কালকার ঝড়ে আমার বাগানে কাঁঠালগাছ ভাঙিয়াছে, অতএব হরিচরণের কলেরা কেন না হইবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। গ্রহগুলা কি অকারণে এ-রাশি ও-রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে—যদি উহাদের গতিবিধির সহিত আমার শুভাশুভের কোন সম্পর্কই না থাকিবে, এরূপ যুক্তি কু-যুক্তি। নেপোলিয়নের ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোষ্ঠী ছাপানর পরিশ্রমও অনাবশ্যক। একটা ঘটনা **গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র গণনায় যাহা না মিলিবে তাহা চাপিয়া যাইব** অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, এরূপ ব্যবসায় প্রশংসনীয় নহে।

...অবিশ্বাসীরা যেসব প্রমাণ চাহেন, বিশ্বাসীরা সেরূপ প্রমাণ দেন না। বিশ্বাসীরা যে প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অবিশ্বাসীরা সে প্রমাণে তুষ্ট নহেন। এই আত্যন্তিক সংশয় জন্য বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীকে গালি দেন। বলেন, আমি যে প্রমাণে তৃপ্ত হইলাম, তুমি তাহাতে তৃপ্ত হইতেছ না কেন ; আমি কি নির্ব্বোধ, আমি কি অন্ধ, আমি কি বধির, ইত্যাদি। এ সকল যুক্তি বিফল হইলে তাঁহারা লাঠি বাহির করেন, তখন প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে হয়।

একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া মানুষের ভবিতব্য কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে, তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে। কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল হইবে, তাহা খোলসা করিয়া বলিতে হইবে। বলিবার ভাষা যেন স্পষ্ট হয়—ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তারপর হাজারখানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে ; শিশুদের নাম-ধাম-পরিচয় স্পষ্ট দেওয়া চাই, যেন যাহার ইচ্ছা সে পরীক্ষা করিয়া জন্মকাল সম্বন্ধে সংশয় নাশ করিতে পারে। গণনার নিয়ম পূর্ব্ব হইতে বলা থাকিলে যে-কোন ব্যক্তি গণনা করিয়া কোষ্ঠীর বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিতে পারিবে। যতদূর জানি, এই গণনায় পাটীগণিতের অধিক বিদ্যা আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে ; যতটুকু মিলিবে, ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয়-শ মিলিয়া যায়, মনে করিতে হইবে, ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে ; যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে, মনে করিতে হইবে, তেমন কিছু নাই। হাজারের স্থানে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে যে রীতিতে ফলাফল

গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে গঙ্গার জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

পুরনো দিনের পৃষ্ঠা থেকে

হাত গণনা

সবার পড়া 'আবোল তাবোল' বই এর ৪২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত। মানুষের মনে হস্তরেখা-বিচারের প্রভাব সম্পর্কে সুকুমার রায়ের মানসিকতা এই ছোট্ট অথচ অত্যন্ত বাস্তবমুখী কবিতাটি থেকে সম্যক প্রকাশ পায়।

স. ম.

ও পাড়ার নন্দ গোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো।
ছিল না তার অসুখ-বিসুখ, ছিল সে যে মনের সুখে,
দেখা যেত সদাই তারে হুঁকোহাতে হাস্যমুখে।
হঠাৎ কি তার খেয়াল হ'ল চল্‌ল সে তার হাত দেখাতে
ফিরে এল শুকনো সরু, ঠকাঠক্‌ কাঁপছে দাঁতে!
শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে,
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে।
শুনে লোকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বদ্যিমশাই,
সবাই বলে, "কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দ গোঁসাই?"
খুড়ো বলে, "বলব কি আর, হাতে আমার পষ্ট লেখা
আমার ঘাড়ে আছেন শনি, ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা।
এতদিন যায়নি জানা ফিরছি কত গ্রহের ফেরে—
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখবে কে রে?
ষাটটা বছর পার হয়েছি বাপ-দাদাদের পুণ্যফলে—
ওরে তোদের নন্দ খুড়ো এবার বুঝি পটোল তোলে।
কবে যে কি ঘটবে বিপদ কিছু হায় যায় না বলা"—
এই বলে সে উঠ্‌ল কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা।
দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো,
বুড়ো আছে নেই কো হাসি, হাতে তার নেই কো হুঁকো!

সুকুমার রায়

এদেশীয় সংস্কার বিদেশীর চোখে

ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ১৬৫৮ সাল থেকে ১৬৬৭ সাল পর্যন্ত ঘুরেছিলেন ভারতবর্ষে। থেকেছেন দারাশিকোর সঙ্গে, আওরংজেবের সঙ্গে। দেখেছেন এদেশকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। সুশিক্ষিত চিকিৎসক ছিলেন বার্নিয়ের। তার সুবিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—'**Travels in the Mogul Empire (1656-1668 A.D.)**' বইটিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি রয়েছে পাতায় পাতায়।

ভারতবর্ষের জ্যোতিষী, সাধু, ফকির প্রভৃতিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বার্নিয়েরের। তার বর্ণনায় ফুটে উঠেছে এদের প্রতারণার ছবি, বর্তমান নিবন্ধে তার বৃত্তান্তের শুধুমাত্র এই অংশগুলোই আমরা সামনে আনছি।

সামগ্রিকভাবে এশিয়া সম্পর্কে বার্নিয়ের বলেছেন যে—অধিকাংশ লোকই স্বর্গরাজ্যের সঙ্কেত ও নির্দেশের ওপর অতিরিক্ত আস্থাবান। পৃথিবীর সব ঘটনাকেই তারা উর্ধ্বলোকের নির্দেশ বলে মনে করে। পদে পদে শরণাপন্ন হয় গণৎকারের। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছুটো সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করে 'সাহেৎ' অনুষ্ঠানের জন্য—শুভ মুহূর্ত ঘোষণার জন্য। সেনাপতি নিয়োগ, বিয়ে, কোনও জায়গায় যাওয়া, নতুন পোশাক পরা—সর্বত্রই চূড়ান্ত রায় দেন 'মঁসিয়ে গণৎকার'। এগুলোকে তিনি বলেছেন জঘন্য কুসংস্কার। জ্যোতিষীরা নাকি সর্বশক্তিমান, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তাদের নখদর্পণে—মানুষের একান্ত বিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসের বেলুনকে ফুটো করে দেওয়ার মতো কিছু ঘটনা আছে বৃত্তান্তে। একবার প্রধান রাজজ্যোতিষী পড়লেন দীঘিতে, উঠতে পারলেন না, মরলেন ডুবে। এ ব্যাপারে সন্দিহান হয় সাধারণ লোকও। নিজের মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ জানতে পারেন না যিনি, তিনি কেমন সবজান্তা? সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে গণৎকারের দল—পেশার ভবিষ্যৎ ভেবে। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো জ্যোতিষীদের সম্বন্ধে নানান ব্যাঙ্গাত্মক গল্প।

অনেক গণৎকার বসতো একটা বাজারে। লেখকের ভাষায় 'ভণ্ড, বুজরুক, হাতুড়ে, বৈদ্য, জাদুকর' ইত্যাদি। মাটিতে আসন পেতে, নানারকম কাঁটাকম্পাস নিয়ে, অদৃষ্ট শাস্ত্রের এক বিশাল বই খুলে বসে থাকে এরা। সামনে থাকে

গ্রহ-উপগ্রহের স্থানাঙ্কিত একটা চিত্রপট। এক পয়সার বিনিময়ে 'ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি'রা লোককে বলে দেয় ভবিষ্যৎ। পদ্ধতিটা এরকম—গণৎকার প্রত্যেক মক্কেলের হাত ও মুখ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে, গণনার ভান করে দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করে, বইয়ের পাতা ওল্টায়। দেখাতে চায় সে কত বড় পণ্ডিত, কাজটা কত শ্রমসাপেক্ষ। এইসব ভড়ং দেখিয়ে মক্কেলকে বশ করে ফেলে সে, তারপর কানে কানে বলে দেয় শুভ মুহূর্তটির কথা—'অমুক মাসে অমুক সময়ে অমুক দিনে শুরু করো ঐ ব্যবসা, উন্নতি সুনিশ্চিত!' এখনকার জ্যোতিষীদের সাথে পদ্ধতিটার কোন মৌলিক তফাৎ আছে কি? শুধু পুরুষ নয়, হাত দেখাতে আসতো মেয়েরাও। লেখকের মতে, এইসব অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, গ্রহ-উপগ্রহের বিরাট প্রভাব আছে মানুষের জীবনে, মাটির পৃথিবীতে তার নিয়ন্ত্রণের হদিশ দিতে পারে গণৎকাররাই।

এক অশিক্ষিত পলাতক পর্তুগীজ গণৎকার বসতো বাজারে। সম্বল পুরনো একটা নাবিকের কম্পাস আর পর্তুগীজ ভাষায় দু-একটা প্রার্থনা-পুস্তক। এইসব বইয়ের ছবি দেখিয়ে সে মক্কেলদের বলতো যে এগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের পর্তুগীজ চিত্র। এক রেভারেণ্ড জেসুইট ফাদার তাকে বাজারের মধ্যে হাতেনাতে ধরে ফেলে এসব কাজ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়—যস্মিন দেশে যদাচারঃ।

১৬৬৬ সালে সূর্যগ্রহণের সময়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন বার্নিয়ের, তা অনেকেরই জানা। কিছুদিন আগে সূর্যগ্রহণের সময়ে এদেশে বীভৎস অজ্ঞতার নজির দেখেছি আমরা। মৌলিক কোন তফাৎ পাওয়া যায় নি ১৬৬৬ সালের সাথে। লক্ষণীয়, তিনশো বছর আগে 'গ্রহণ'কে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত অজ্ঞতা আর কুসংস্কারকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন বার্নিয়ের। বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না।

কুসংস্কারের জন্য বার্নিয়ের দায়ী করেছেন ব্রাহ্মণদের—পার্থিব সুখের জন্যেই তারা এইসব করে থাকে। পুরীতে রথের সময়ে একটি সুন্দরী মেয়েকে বলা হতো 'জগন্নাথের কনে'; জগন্নাথের পাশে বসিয়ে সমারোহ করে তাকে নিয়ে যাওয়া হতো মন্দিরে, সেখানে নাকি রাত কাটাতো জগন্নাথের সঙ্গে। রাত কাটানোর আগে লোকে তাকে নানারকম প্রশ্ন করে; রাতে পুরোহিত তার কানে কানে বলে দেয় উত্তর, আর সেইসব কথাকে সাক্ষাৎ জগন্নাথের উক্তি মনে করে পরদিন সে উত্তর দেয় লোকদের। লোকে নির্দ্ধিধায় বিশ্বাস করে।

সাধুসন্ন্যাসীদের কথা বলেছেন বার্নিয়ের; ভস্মমাখা নগ্নদেহ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ, পন্থা জানেন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের। পরজন্মে রাজা হওয়ার আশায় এ-জন্মে দুঃখবরণ করতো এরা—সেরকমই ধারণা হয়েছিল

লেখকের। এদেরকে তিনি বলেছেন নিতান্ত নির্বোধ। যোগীদের বা ফকিরদের কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন বার্নিয়ের। এদের একটা অংশ প্রচার করতো যে, তারা অনেক কিছু গুহ্য ব্যাপার জানে। মানুষের বিশ্বাস ছিল, এদের আছে ঐশ্বরিক শক্তি, যে কোনো পদার্থকে তারা সোনা করে দিতে পারে। অভ্রজাতীয় এমন এক পদার্থ তারা তৈরি করে, যা সামান্য দু-এক দানা রোজ সকালে খেলে যে কোন অসুস্থ লোক সুস্থ হয়, দুর্বল শরীরে শক্তি আসে, যা খাওয়া যায় তা তৎক্ষণাৎ হজম হয়ে যায়। আরো মজার, এই শ্রেণীর দু-জন সাধু হঠাৎ কোথাও মিলিত হলে শুরু হয় অলৌকিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাদুবিদ্যার খেল্। কে কি মনে মনে চিন্তা করছে তা গড়গড় করে বলে দেয়। ফলফুলহীন শুক্নো গাছের ডালে মন্ত্র পড়ে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়। এক ঘণ্টা এমনকি পনেরো মিনিটের মধ্যে বুকের ভেতর ডিমে তা দিয়ে পাখির বাচ্চা ফোটায়, উড়িয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। বার্নিয়েরের সুযোগ হয় নি নিজে দেখে যাচাই করার। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তার ধারণা হয়েছিল যে সমস্ত ব্যাপারটাই চালাকি আর ধাপ্পাবাজি, কোন অলৌকিক শক্তির চিহ্ন নেই। একবার দানেশমন্দ খাঁ-র টাকা চুরি যায় আর এক সাধুবাবা কৌশল দেখাতে শুরু করে 'বাটি চেলে' চোর ধরার। বার্নিয়ের ফাঁস করে দিয়েছিলেন চালাচালির চালাকিটা। আর একবার দানেশমন্দ খাঁ ডেকে পাঠান এক সবজান্তা ফকিরকে। দানেশমন্দ বলেন যে, আগে থেকে একটা কাগজে তিনি মনের কথা লিখে রাখবেন, ফকির তা না দেখে বলে দিতে পারলে পুরস্কার পাবে তিনশো টাকা। বার্নিয়েরও বলেন যে, তার মনের কথা বলতে পারলে ফকিরকে তিনি দেবেন পাঁচশো টাকা। কৌতুকের সঙ্গে উল্লেখ করছেন বার্নিয়ের—সাধুবাবা আর তাদের বাড়িমুখো হয় নি।

বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তৎকালীন ভারতবর্ষের কুসংস্কারের বর্ণনার সাথে সাথে আমরা পরিচয় পাই এক যুক্তিবাদী মনের, বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার। তিনশো বছর আগেকার এই মানুষটির মানসিকতার সাথে তুলনা করলে আজকে আমাদের একটু লজ্জা পেতেই হয়।—কতোটা এগিয়েছি আমরা?

লেখাটি তৈরি করতে প্রধানত সাহায্য নিয়েছি বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত বিনয় ঘোষের 'বাদশাহী আমল' গ্রন্থটির। সংকলক

সংকলক : অসীম চট্টোপাধ্যায়

চীনা জ্যোতিষীর উপাখ্যান

জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী কেমন কাকতালীয়ভাবে মিলে যায় তা নিয়ে চীন দেশে এক মজার গল্প চালু আছে। এর মুখ্য চরিত্রটি হলো 'হুয়াং' নামে এক গণৎকার।

গণৎকার হিসেবে হুয়াং-এর পরিচিতির পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা কাজ করেছিল। হুয়াং-এর বউ ছিল আর্থ্রাইটিস বা বাতের রোগী ; বৃষ্টির দিনে ভিজে আবহাওয়ায় তার পায়ে বাতের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠতো। বৃষ্টির সঙ্গে বউ-এর পায়ের ব্যথার যোগসূত্র সম্পর্কে আধুনিক ডাক্তার যা-ই বলুন, গল্পের নায়ক চতুর হুয়াং এই যোগসূত্রকে কাজে লাগিয়ে তার গ্রামের মানুষদের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানাতে শুরু করেছিল। আলো ঝলমল সকালে যেদিন বউ-এর বাতের ব্যথা শুরু হয় হুয়াং সেদিন ছাতা নিয়ে মাঠে যায় চাষ করতে। এর জন্য সঙ্গিসাথীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। হুয়াং কিন্তু নির্বিকার, কারণ ও তো জানে—বউ-এর যখন পায়ের ব্যথা চাগিয়েছে তখন ভিজে হাওয়ার আমদানী নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে ; বৃষ্টিতো এল বলে। তা, সত্যি-সত্যিই বৃষ্টি শুরু হয়। ছাতা মাথায় দিয়ে হুয়াং গটগট করে বাড়ির দিকে রওনা দেয় আর সঙ্গিসাথীরা বিস্ময়ে 'হাঁ' করে ভিজতে থাকে। এর ঠিক উল্টো ঘটনাটাও ঘটে মাঝে মাঝে। আকাশজুড়ে মেঘ করার দিনে যদি বউ-এর কোন জ্বালা-যন্ত্রণা না থাকে হুয়াং বোঝে—সেদিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে সবাই যখন ছাতা বগলে রাস্তা চলে—হুয়াং তখন ঝাড়া হাত-পায় মাঠে গিয়ে অন্যান্যদের তাক লাগিয়ে দেয়।

এরকম ঘটনা দু-চারবার ঘটার পর পাড়াপড়শীদের মনে হলো—হুয়াং-এর নিশ্চয়ই বিশেষ কোন ক্ষমতা আছে যার ফলে ভবিষ্যতের আগাম খবর ও দিতে পারে। ব্যাস্ অমনি সকলে ছোটে হুয়াং-এর কাছে। ঝাং-পরিবারের পুত্রবধূ তার কানের দুল হারিয়ে হুয়াং কে এসে বলে, "চাচা, আমার কানের দুলটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে ?" অন্যসব জ্যোতিষীদের মতো হুয়াং-ও নানারকম ভড়ং করে ; মাটিতে ছক্ কাটে, 'অং বং' উচ্চারণ করে, আঙ্গুলে কিসব গোণে, তারপর বলে, "উনুনের চারধার আর পুকুরঘাটের পাশটা একবার খুঁজে দেখ দিকিন্।" তা, গ্রামের বৌ-দের সারাদিনের কাজকর্ম যখন ঐ দুটো জায়গাতেই তখন হুয়াং-এর গণনা যে মিলবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

লি-নামে আর এক প্রতিবেশী ব্যবসার কাজে বিদেশ গেছে, মাস তিনেক হলো ফেরার নাম নেই। লি-র বউ এসে হুয়াং-কে ধরে। হুয়াং আবার নানা-রকম আঁক কষে বলে, "চিন্তা করো না, এ মাসের মধ্যে তোমার স্বামী আসবেই।" আসলে, হুয়াং জানতো—লি-র বউ-এর সে মাসেই বাচ্চা হওয়ার কথা। লি নিশ্চয়ই তার আগে এসে পড়বে, তা ভেবেই হুয়াং তার ভবিষ্যদ্বাণী করে। বস্তুত দিন দশেক পর লি যখন বাড়ি ফিরে আসে হুয়াং-এর খাতির তখন তুঙ্গে ওঠে।

এইভাবেই দিন কাটছিল। হুয়াং-এর গণৎকারী চলছিল ঢিমে-তালে, যদিও আশপাশের দু-পাঁচ গাঁয়ের লোকের কাছে তার কেরামতির খবর পৌঁছে গিয়েছিল। এমন সময় একদিন রাজপ্রাসাদ থেকে রাজার অতিপ্রিয় এক বিস্তর দামী গজমুক্তো গেল চুরি। ক-দিনের মধ্যেও সে চুরির কিনারা না হওয়ায় রাজাতো রেগে কাঁই। মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "তিন দিনের মধ্যে দেশের সেরা জ্যোতিষী-গণৎকারকে ধরে আনো। সে গুণে বলুক মুক্তো আছে কোথায়।"

এদিকে মুক্তো চুরির ষড়যন্ত্রের নায়ক হলেন মন্ত্রী নিজেই। পাছে ধরা পড়েন এই ভয়ে জ্যোতিষী বাছাই-এর কাজটা নিজের হাতেই নিলেন তিনি। চেনা-জানা জ্যোতিষীদের কাছে গিয়ে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেমন গণনা করো?" উত্তরে দুনিয়ার সর্বকালের সব জায়গার জ্যোতিষীদের মতো সেই গণৎকাররাও বলে, "একেবারে একশ'ভাগ নির্ভুল। পরীক্ষা করে দেখুন।" মন্ত্রীমশাই অবশ্যই তাকে আর পরীক্ষা করেন না। তিনি আসলে খুঁজে বেড়ান এমন এক গণৎকারকে যার গণনা ভুল হবার সম্ভাবনাটাই বেশি। কারণটা পরিষ্কার। গণনা ঠিক হলে মন্ত্রীরই গর্দান যাবে যে!

একসময় মন্ত্রীর এক অনুচর এসে হুয়াং-এর খবর দিল। মন্ত্রী যখন তার দলবল নিয়ে হুয়াং-এর বাড়ি হাজির হলেন, হুয়াং-এর বউ তখন পায়ের যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। মন্ত্রী বললেন, "কিহে, তুমি নাকি লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পার?"

হুয়াং ভাবলো, মন্ত্রীর কাছে মিছে কথা বলে লাভ নেই, শেষে কোন ফ্যাসাদে পড়বে। হাত কচলাতে কচলাতে ও তাই বললো, "কি যে বলেন হুজুর, আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করে দু-চারটে কথা বলেছি। ওসব জ্যোতিষ-গণনার আমি কিচ্ছু জানি না।"

মন্ত্রীতো এমন লোকই খুঁজছিলেন। বললেন, "চলো আমার সঙ্গে। রাজামশাইয়ের গজমুক্তো হারিয়েছে—তোমায় গণনা করে তার খোঁজ দিতে হবে।"

হুয়াং তো হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠলো, "সত্যি বলছি হুজুর, ওসব

জ্যোতিষ-ট্যোতিষ সব বুজরুকি। রাজার মুক্তো আমি খুঁজে বের করতে পারবো না। আমাকে ছেড়ে দিন হুজুর।" একটু পরেই বউ-এর ছটফটানীর কথা মনে আসতেই বললো, "আমি শুধু আবহাওয়ার আগাম খবরটাই দিতে পারি। আজ হয়তো বৃষ্টি হতে পারে।"

হুয়াং-এর কথায় আর মন্ত্রীমশাই কি কান দেন? নিরুপায় হয়ে হুয়াং বউ-এর কাছে গেল বিদায় নিতে। কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, "বড় বিপদে পড়েছি! আমার সব বুজরুকি এবার ধরা পড়বে। পালিয়ে আসার হয়তো একটাই পথ খোলা আছে। যদি কালকের মধ্যে ফিরে না আসি তবে পরশু রাত্রে আগুন লাগিয়ে দেবে রান্নাঘরের চালায়। যা বলছি, তার অন্যথা যেন না হয়।" বউ মাথা নেড়ে সায় দিতেই হুয়াং রওনা দিল রাজবাড়ির দিকে।

রাজধানীতে হুয়াং-কে নিয়ে এসে তোলা হলো রাজপ্রাসাদের কাছেই এক বাসায়। চারপাশে তার পাহারার ব্যবস্থা, যাতে না হুয়াং পালাতে পারে। ঠিক হলো পরদিন সকালে হুয়াংকে নিয়ে যাওয়া হবে রাজার কাছে; সেখানেই তাকে আঁকজোক করে চুরি যাওয়া মুক্তোর হদিশ দিতে হবে।

রাত্রিবেলা জানলার বাইরে উদাস চোখে তাকিয়ে হুয়াং নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবে। চীৎকার করে অভিসম্পাত করে নিজেকে আর মন্ত্রীকে। এদিকে হুয়াং-এর পূর্বাভাষ মতো সন্ধ্যের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হতেই মন্ত্রীর টনক নড়ে। ভুল করে একজন বড় জ্যোতিষীকেই কি শেষে ধরে আনলেন তিনি। ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হয়। মন্ত্রী গুটি গুটি এসে দাঁড়ান হুয়াং-এর ঘরের দরজার পাশে। হুয়াং তখন চোরকেই গাল পাড়ছে গলা ফাটিয়ে।

"ব্যাটা চোর, তোর এত সাহস যে শেষে রাজার মুক্তোয় হাত দিস।" তারপর একটু থেমে মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে গায়ের ঝাল ঝাড়ে, "আমি বললাম আসবো না, তাও আমায় জোর করে ধরে নিয়ে এলে। আমাকে এনে তোমার কোন লাভ হবে না। তোমার কপালে মৃত্যু লেখা আছে।"

দরজার বাইরে থেকে হুয়াং-এর হম্বিতম্বি শুনে মন্ত্রী ভাবেন, তাহলে তো ধরা পড়ে গেছি। সত্যি লোকটার ক্ষমতা আছে। দৌড়ে এসে হুয়াং-এর পায়ে পড়েন তিনি। বলেন, "দয়া কর। রাজাকে বলে দিও না, আমি মুক্তোটা সরিয়েছি।"

নিজের বুদ্ধি দিয়ে হুয়াং পরিস্থিতিটা বুঝে নেয়। মন্ত্রীকে তুলে ধরে বলে, "আমায় সব খুলে বলুন। আপনি না বললেও অবশ্য সমস্ত জানতে পারবো। কথা দিচ্ছি, আপনার কোনও ক্ষতি করবো না।"

মন্ত্রী নিজের অপকর্মের কথা খুলে বলেন। তারপর হুয়াং-এর হাতে একটা টাকার থলি গুঁজে দিয়ে বলেন, "রাজবাড়ির পাশে তালগাছের নিচে মাটি খুঁড়লেই একটা ছোট্ট বাক্স মিলবে তার মধ্যেই রয়েছে রাজার মুক্তো। তুমি আমাকে বাঁচাও। রাজাকে আমার নাম বলো না।"

হুয়াং সায় দেয়। পরদিন সকালে রাজসভায় রাজার সামনে হিজিবিজি ছক্ কেটে, চোখবুজে বিড়বিড় করে হুয়াং বলে, "রাজবাড়ির পাশে তালগাছটার নিচে মাটি খুঁড়লেই আপনার হারানো মুক্তো পেয়ে যাবেন।"

হুয়াং-এর কথামতো মাটির নিচে মুক্তোর খোঁজ মিলতেই রাজা বলেন, "এবার চোরের নামটা বলো।"

উত্তর তৈরিই ছিল। হুয়াং বলে, "অনেকদিন ধরে আপনার অন্ধকার রত্ন-ভাণ্ডারে পড়ে থাকতে থাকতে মুক্তোটার একটু রোদ খাবার সাধ হয়েছিল, নিজে নিজেই তাই ও রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।"

হুয়াং-এর কথায় সভাসদ্‌রা হেসে ওঠেন। রাজা তো এদিকে রেগে কাঁই। বলেন, "আমার সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে? শীগগির চোরের নাম বলো, আমি তার গর্দান নিই।"

হুয়াং এবারে প্রমাদ গোণে। হাত জোড় করে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলে, "আমার গণনা তো বলছে—এটা কোন চোরের কাজ নয়। মুক্তোটা আপনা থেকেই স্থানান্তরিত হয়েছে। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন হুজুর, বাড়ি যাই। আমার মন বলছে, কাল আমার বাড়িতে আগুন লাগবে। আমি না ফিরলে আগুন নেভাবে কে?"

রাজা বলেন, "বেশ, তোমার গণনা কতটা ঠিক সেটা একবার পরীক্ষা করেই দেখি।" তারপর অনুচরদের বলেন, "কালকের দিনটা কাটলে খবর নেবে, সত্যিই ওর বাড়িতে আগুন লেগেছিল কিনা। ততক্ষণ ওকে আটকে রেখে দাও।"

এদিকে নির্দিষ্ট সময় পার হতেই, হুয়াং-এর নির্দেশমতো তার বউ রান্নাঘরের চালায় আগুন লাগায়। পরদিন সকালে অনুচররা হুয়াং-এর বাড়িতে আগুন লাগার খবর নিয়ে ফিরে আসতেই রাজার টনক নড়ে। হুয়াং-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেন, "সত্যিই আপনি ক্ষমতাবান। আপনার গণনা অব্যর্থ। আপনি গ্রামে ফিরে যান, আজ থেকে আপনার আর খাওয়া-পরার অভাব হবে না।"

মুচকি হেসে বাড়ির পথ ধরে চতুর জ্যোতিষী হুয়াং।

সংগ্রহ : অমিত চক্রবর্তী

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

Library
31.7.01

জ্যোতিষীদের ভাগ্যগণনা উপহাস করেছেন বাল্মীকি

কোষ্ঠী নির্মাণ করার সময় জ্যোতিষশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বাণী লিখে দেওয়া হয় "সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ" অর্থাৎ জ্যোতিষের ভাগ্য গণনা যে সফল, তার সাক্ষ্য দেয় চন্দ্র ও সূর্য।

জ্যোতিষীদের ঐ আদর্শ-বাণীটির প্রতি উপহাস করে নৈয়ায়িকরা বলেন, "বিফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং রামে রাজ্য বিবাসিতে"। অর্থাৎ মহাকবি বাল্মীকিই সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন—জ্যোতিষ গণনা একেবারে বিফল হয়েছিল রামের রাজ্য নির্বাসনের দ্বারা।

কথাটা খুলে বলি—

রাজা দশরথের অন্দরমহলে সাড়ে তিন-শ' পত্নী বা রক্ষিতা ছিলেন (রামায়ণ/অযোধ্যা কাণ্ড/৩৯ সর্গ ৩৬ শ্লোক); সেরা পত্নী বা রাণী ছিলেন তিন জন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার দ্বিতীয় সন্তান রাম। প্রথমটি কন্যা, শান্তা। কৈকেয়ীর ছেলে ভরত আর সুমিত্রার দুই পুত্র—লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

মনের প্রকৃত অভিসন্ধি লুকিয়ে রেখে একদিন দশরথ নিজের অনুগত রাজাদের ডেকে বেশ একটা সভা বসিয়ে রাজাদের জানালেন, "চারিদিকে নানান বিপদ-আপদের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, আর আমারও শরীর জরাগ্রস্ত হচ্ছে, কখন কি হয় বলা যায় না, তাই ঠিক করেছি সত্বর রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক করার কাজ সেরে নিই। আপনারাও নিশ্চয় এ বিষয় অনুমোদন করছেন।" সভায় উপস্থিত রাজন্যবৃন্দ দশরথের প্রস্তাব মেনে নিলেন। কোন কোন রাজা কানাকানি করলেন, "কি ব্যাপার? এমন একটা রাজকীয় অনুষ্ঠানে সীতার বাপের বাড়ির কেউ উপস্থিত নেই, এবং কেকয়রাজও নেই, এমন কি দাদা রামের রাজ্যাভিষেক হবে—ভরত শত্রুঘ্নও থাকছেন না?"

দশরথ ব্যাপারটাকে গড়াতে না দিয়ে বললেন, "দেখুন, আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে একাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাই। ওদের পরে খবর দেবো, আর ওরা শুনতেও তো পাবেন।" তারপর দশরথ ধ্বনি-ভোটে নিজের প্রস্তাবটি

পাস করিয়ে নিয়ে উপস্থিত রাজন্যবৃন্দকে বললেন, "আপনাদের অনুমতি নিয়ে আর একটি প্রস্তাব করছি। আমি আগামীকালই রামকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করতে চাই, কারণ আগামীকাল পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত হয়ে চন্দ্রের অবস্থান ঘটছে?" দশরথের এ প্রস্তাবও ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

ইত্যবসরে সভাসদ ও কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য মাননীয় বৃন্দোসমীপে এসে উপস্থিত হলেন রাম। তাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দশরথ বললেন, পুত্র! তুমি আগামীকালই রাজপদে অভিষিক্ত হবে, সমগ্র প্রজাকুলের এই ইচ্ছা। জ্যোতিষীরা বলেছেন, আমার জন্মনক্ষত্র দারুণ গ্রহ সূর্য, মঙ্গল ও রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অনেক অশুভ স্বপ্নও দেখছি—

অবষ্টবধংচ মে রাম!
নক্ষত্রং দারুণ গ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞা
সূর্য্যাঙ্গারক-রাহুভিঃ ॥

জ্যোতিষীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, চন্দ্র যখন পুনর্বসু নক্ষত্র থেকে পুষ্যা নক্ষত্রে যান, তখন সব দিক থেকেই মঙ্গল হয়। আজ চন্দ্র আছেন পুনর্বসু নক্ষত্রে কাল যাবেন পুষ্যা নক্ষত্রে, সেই যোগটি অতীব শুভ, তাই তোমাকে কালই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবো—

অদ্য চন্দ্রো ভ্যুপগমৎ পুষ্যাৎ পূর্বং পুনর্বসুম্।
শ্বঃ পুষ্য যোগ জিয়তং কথ্যন্তে দৈব চিন্তকাঃ ॥
তত্র পুষ্যে ভিষিঞ্চস্ব মনস্তরয়তীব মাম্।
শ্ব স্তাহম ভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্য পরন্তপ।

(রা/থ/৪র্থ)

দশরথের খেয়াল হলো, রাম যদি প্রতিবাদ করে—ভরত শত্রুঘ্ন এখানে নাই, তাদেরও আনা হোক,—তাই তাড়াতাড়ি সেই উত্তরটুকু শুনিয়ে দিলেন, "তুমি তো জান, ভরত শত্রুঘ্ন তোমার একান্ত প্রিয় ও অনুরক্ত, তোমার সুখেই তাদের সুখ! আর একটা কথা, যে কোন ভালো মানুষের মনও মাঝে মাঝে রাগ-দ্বেষে আক্রান্ত হয়, তাই শুভকাজটি দ্রুত সেরে নিতে চাই।" রাম কোন উত্তর দিলেন না।

প্রাসাদ কৌটিল্য, বঞ্চনার কুৎসিৎ রূপ, আর সর্বোপরি তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার ছবি—সবই লিপিবদ্ধ করেছেন মহাকবি বাল্মীকি। সর্বজ্ঞ পণ্ডিত অথবা বেদজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠের অজ্ঞতা এবং জ্যোতিষীদের গণনাবিদ্যাটি যে কত অসার তাও বাল্মীকি লিখেছেন। পুষ্যাযোগ এসেছিল কিনা কেউ জানতে পারল না,

তার শুভশক্তির অস্তিত্বও কেউ জানতে পারল না, কিন্তু রাত্রিটি মাত্র পার হওয়ার পরই রামের বনবাস হলো; বশিষ্ঠের দৈবজ্ঞতা ব্যর্থ হলো, আর জ্যোতিষীদের বা দৈবজ্ঞদের মুখে চুনকালি পড়ল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

গণৎকার...ঋনৎকার

পুরনো সভ্যতার দেশ হলে দায়ভাগের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়। বহু ব্যাপারে গর্ব করার জিনিস যেমন থাকে, তেমনি অনেক জঞ্জালও জুটে যায়। জ্ঞানবুদ্ধি যতই বাড়ুক, কিছুতেই সেগুলো যেতে চায় না। ঝেঁটিয়ে বিদায় না করা পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই পায়ে পায়ে বাধে।

জ্যোতিষের কথাই ধরা যাক। কতদিন আগে ভারতে এর চর্চা শুরু হয়েছিল তার ঠিক ঠিকানা নেই। গোড়ায় জ্যোতিষ বা নক্ষত্রবিদ্যা (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২, মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।১।৪-৫) বলতে বোঝাত অ্যাস্ট্রনমি। যজ্ঞের সময় ঠিক করার জন্যেই বেদের ষড়ঙ্গের একটি ছিল জ্যোতিষ। পরে ভাগ্যগণনা, ভবিষ্যৎ বলা, কুষ্ঠি-ঠিকুজি সবই তার মধ্যে ঢুকে গেল। আর্যভটেও (জন্ম : ৪৭৬ খ্রী) এ জিনিস পাওয়া যাবে না। বরাহমিহিরেই (৫০৫-৫৮৭ খ্রী) দেখি অ্যাস্ট্রনমি আর অ্যাস্ট্রলজি একাকার হয়ে গেছে। গ্রহ-গণিতভিত্তিক 'সিদ্ধান্ত'-র পাশাপাশি কোষ্ঠী তৈরি, যাত্রার শুভ-অশুভ সময় বাৎলে দেওয়া ইত্যাদির অপবিজ্ঞান 'হোরা'ও এসে গেল। জ্যোতির্বিদ্যার 'তত্ত্ব' গ্রন্থের পাশাপাশি আরও দুটো উটকো ব্যাপার ঢুকে পড়ল : চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ ধূমকেতু ইত্যাদির 'ফলগ্রন্থ' (বরাহমিহির বোধহয় একেই বলেছেন 'সংহিতা', গর্গ বলেছেন 'শাখা'), আর জন্মর দিন-ক্ষণ-মুহূর্ত বিচার করে শিশুর ভবিষ্যৎ ঠিক করার কারচুবি 'জাতক'।

বরাহমিহিরে ছত্রিশটি গ্রীক শব্দ পাওয়া যায়। ভেবর, কার্ন, প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতরা বলেছেন : গ্রীকদের কাছ থেকেই ভারত তথাকথিত ফলিত জ্যোতিষ বলে অপবিজ্ঞানটি শিখেছিল। মেঘনাদ সাহা, ফিলিওজা ইত্যাদি মনে করেন : খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই 'সিদ্ধান্ত' ও 'হোরা'র ক্ষেত্রে এই ঋণের সূচনা। কিন্তু ক্ষেত্র তৈরি না থাকলে কি সে বীজ ধরত?

মেগাস্থেনিস-এর ভারত বিবরণ থেকে জানা যায় : মৌর্যযুগেই এক শ্রেণীর পণ্ডিত বছরের গোড়ায় লোককে 'অনাবৃষ্টি, বর্ষা, সুবাতাস, ব্যাধি ও শ্রোতৃবর্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় গণনা করিয়া বলিয়া দেন।' তবে উল্টোপাল্টা বলার বিপদও ছিল : 'যদি কাহারও গণনা তিনবার মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী থাকিতে হয়, ইহাই বিধি।' আরিয়ান এর সঙ্গে যোগ করেছেন : 'যিনি এই মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য করিতে পারে এমন জন সংসারে নাই।' এখনকার রাজজ্যোতিষী, মন্ত্রী-জ্যোতিষী ইত্যাদিদের মতো নিরঙ্কুশ না হলেও ভবিষ্যৎ গণনার একটা ধারা—নিজস্ব বা ব্যাবিলন, কলডিয়া, বা পারস্য থেকে ধার করা—ভারতে অনেক আগে থেকেই ছিল। গ্রীক ও রোমান ফলিত জ্যোতিষীরা তার ওপর আর এই উপকারটা না করলেও পারতেন।

কিন্তু সবাই কি চিরকালই চোখ বুজে এই অপবিজ্ঞানে বিশ্বাস করতেন? আমাদের তথাকথিত 'হিন্দু' ধারায় জ্যোতিষী ও চিকিৎসকের আদর ছিল খুব, যদিও সামাজিক মর্যাদায় দু-দলই ছিলেন খাটো। জৈনরা জ্যোতিষে ঘোর বিশ্বাসী। অন্যদিকে বৌদ্ধ ঐতিহ্য কিন্তু জ্যোতিষ ও ভবিষ্যৎ গণনার যাবতীয় কুসংস্কারের ঘোরতর বিরোধী। 'দীঘনিকায়'-এর ব্রহ্মজালসূত্র, 'জাতক'-এর গল্প ও অন্যত্র এ নিয়ে বিরোধিতা ও বিদ্রূপ আছে। কিন্তু সে এক আলাদা প্রসঙ্গ।

ধর্মমতের পার্থক্য ছাড়াও, জ্যোতিষ ও জ্যোতিষীদের নিয়ে চমৎকার কয়েকটি শ্লোক আমাদের এই ঘোর ভাগ্যবাদী সমাজেও চালু ছিল—বিদ্রূপে ক্ষুরধার, ব্যঙ্গে উজ্জ্বল। তার থেকে বোঝা যায় : ভারত কোন দুনিয়া-ছাড়া দেশ নয়, বেদ-ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সঙ্গে রাজশক্তির গাঁটছড়া সত্ত্বেও এদেশে এমন লোকও ছিলেন যারা এসব বুজরুকিতে আস্থা রাখতেন না। নিজেদের অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবুদ্ধি দিয়েই তারা এসবের অসারতা বুঝে নিয়েছিলেন, 'আধুনিক ইংরাজি শিক্ষা'র দরকার পড়ে নি। সরকারি সংস্কৃতি ছাড়াও যে একটা জনগণের প্রতিসংস্কৃতি (কাউন্টার-কালচার) এখানেও ছিল তার প্রমাণস্বরূপ ছ-টি উদ্ভট (লেখকের (নাম না-জানা, বই-এর বাইরের) শ্লোক নীচে দেওয়া হলো। 'সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডাগার' বলে একটি শ্লোকসংগ্রহে 'কুগণক নিন্দা' শীর্ষকে এগুলি পাওয়া যায় (প্রথম দুটি শ্লোক খুবই সরল কিন্তু ঝাঁঝালো, সেগুলোর মূল ও অনুবাদ দুইই দিলুম, বাকি চারটির অনুবাদ)।

গণয়তি গগনে গণকশ্চন্দ্রেন সমাগমং বিশাখায়াঃ।
বিবিধ-ভুজঙ্গ-ক্রীড়াসক্তাং গৃহিণীং ন জানাতি ॥

গণক আকাশে বিশাখা নক্ষত্রে চন্দ্রের সমাগম গণনা করছে। (ওদিকে) নানান উপপতির সঙ্গে ক্রীড়ায় আসক্ত (নিজের) গৃহিণীকে (অর্থাৎ তার খবর) সে জানে না। ১ ॥

গণিকা গণকৌ সমানধর্মৌ নিজপঞ্চাঙ্গ-নিদর্শকাবুভৌ।
জনমানসমোহকারিণৌ তৌ বিধিনা বিত্তহরৌ বিনির্মিতৌ ॥

গণিকা আর গণক—দু-এরই ধর্ম এক। দুজনেই নিজের পঞ্চাঙ্গ দেখায়। দুজনেই লোকের মনকে মোহগ্রস্ত করে। বিধাতা এই বিত্তহরণকারীদের তৈরি করেছেন। ২ ॥

[পঞ্চাঙ্গ—পাঁচটি অঙ্গের সমাহার। দুটো হাত, দুটো পা ও মাথা (গণিকা পক্ষে)। বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ—এই পাঁচ (গণক পক্ষে)।]

দেহধারীরা মাঝে মধ্যেই সুখের পরে দুঃখ বা কর্মের ক্ষয়বৃদ্ধি ভোগ করে। জ্যোতিষী, তুমি তাহলে কি করে এমন বল : 'আমি তো আগেই বলেছিলুম, শেষে তা-ই ফলল'? ৩ ॥

গণক লোকের সত্যমিথ্যা ঠিকুজি তৈরি করে, যদি ফলে যায় তো নিজের দক্ষতা জাহির করে। যদি না ফলে তো বলা হবে সেটা লগ্নদ্রষ্টার ভুল। হায়! কুগণক এইভাবেই লোকের ধন হরণ করে। ৪ ॥

দৈবাৎ মানুষের আনন্দ বা দুঃখ উপস্থিত হলে সে (গণৎকার) এই মিথ্যা কথা বলে, 'আমি আগেই এটা বলেছিলুম।' ইষ্টের গণনা ও অনিষ্টের পরিহারে একান্ত আসক্ত লোকদের সে ভেড়ার মতো গণ্য করে ঘোরায়। ৫ ॥

জ্যোতিঃশাস্ত্র-সাগর নিবিড় হয়ে আছে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম স্বরূপ কল্লোলে। এরা (গণৎকার) তার কয়েকটি কণা লাভ করেই যেন কৃতার্থ। দীর্ঘায়ু, পুত্র-সন্তান, ধনসম্পদ ইত্যাদি কথা বলে এই কুগণকরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধনীদের বারবার মোহিত (মোহগ্রস্ত) করে। ৬ ॥

পাঠকরা আগ্রহী হলে আমাদের সাহিত্যে এই প্রতিসংস্কৃতির আরও নমুনা জোগাড় করতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'স্টাডিজ ইন দ হিসট্রি অব সায়েন্স ইন ইণ্ডিয়া' নয়া দিল্লী : এডিটরিয়্যাল এণ্টারপ্রাইজেস, মার্চ/এপ্রিল ১৯৮২ (দ্বিতীয় খণ্ড)। ভাউ দাজী, প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কার্ন ও ফিলিওজার রচনা এখানেই পাওয়া যাবে।

২. শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'মেঘনাদ রচনা সংকলন', কলকাতা : শ্রীমতী রমা সাহা, ১৮৮৭ শকাব্দ।
৩. রজনীকান্ত গুহ (অনূদিত), 'মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬৩ (পুনর্মুদ্রণ)।
৪. নারায়ণ রাম আচার্য (সম্পাদিত), 'সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডাগার', বোম্বাই : নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯৫২।
৫. পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে, 'হিসট্রি অব ধর্মশাস্ত্র' (খণ্ড ৫, ভাগ ১) পুণা : ভাণ্ডারকর ওরিএণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট, ১৯৫৮।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অক্টোবর ১৯৮৪

জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও মানবসমাজ

প্রাচীনকালের মানুষের জগৎ-চিন্তা ও জীবনবোধ ছিল অস্পষ্ট, কখনো বা ভ্রান্ত। বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা ছিল অনুন্নত। সমকালীন সমাজের বিজ্ঞান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তাকে কতটা কি দিতে পারে সে-বিষয়ে বিশেষ ধারণা ছিল না। শত সহস্র বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-অভিজ্ঞতার সঠিক সারাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। অসার ও ভ্রান্ত ধারণা, তথ্য ইত্যাদি বিজ্ঞানে বর্জিত হলেও মানুষের মনে আজো তার যথেষ্ট প্রভাব রয়ে গেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার আশায় মানুষ আজো নানা ক্রিয়াকর্ম করে থাকে যার সবগুলিই বাস্তবসম্মত নয়। অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে পঞ্জিকা মানা, কোষ্ঠী ও ভাগ্যবিচার, গ্রহরত্ন-ধারণ ইত্যাদিও পড়ে কিনা—সেসব একটু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য। এসবের মূলে রয়েছে ফলিত জ্যোতিষ বা অ্যাস্ট্রোলজি (Astrology)।

বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও, অনেক হিসাব-নিকাশ আঁক-জোক থাকলেও অ্যাস্ট্রোলজি (বর্তমান প্রবন্ধে একে শুধু 'জ্যোতিষ' বলেই অভিহিত করা হবে) কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রোনমি (Astronomy) থেকে ভিন্ন।[১] অ্যাস্ট্রোনমি বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিই হলো যন্ত্রপাতিযোগে বাস্তব পর্যবেক্ষণ,

পরিমাণ ও গাণিতিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত সিদ্ধান্ত। এসব থেকে পাওয়া তথ্যাবলী সর্বত্রই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে ; এর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী বা তত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী হাতে-কলমে প্রমাণ করা যাচ্ছে। মহাকাশযুগের আধুনিক বিজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যাকে আরো পরিশুদ্ধ, উন্নত, ব্যাপক ও জ্ঞানগর্ভ করে তুলেছে।

জ্যোতিষীরা মনে করেন মানুষের স্বভাবচরিত্র, আয়ু, ভাগ্য ইত্যাদি ভালোমন্দ সবকিছু নির্ভর করে তার জন্মলগ্নের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ওপর ; আবার একই সঙ্গে (আশ্চর্য স্ব-বিরোধিতা !) জন্মমুহূর্তের প্রতিকূল গ্রহ-নক্ষত্রের অশুভ প্রভাব কাটিয়ে তাবিজ-কবচ-ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সৌভাগ্যবৃদ্ধির বিধানও তারা দিয়ে থাকেন। অতএব জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী তৈরির ব্যবস্থাও বহুল প্রচলিত।

যদিও জ্যোতিষচর্চা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রজীবনে জ্যোতিষীদের প্রভাব, অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। তবু ভাগ্য, অদৃষ্টবাদ, জ্যোতিষবাণীর ওপর জনসাধারণের আস্থা কখনো খুব বেড়ে গেছে, কখনো কিছু কমেছেও। দেখা যায়, গত প্রায় এক দু-দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে মানুষের মধ্যে কোষ্ঠী ও ভাগ্যবিচার, শনিঠাকুর আর নামকীর্তনের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, অ্যাস্ট্রোলজারের চেম্বার বেড়েছে, তাবিজ-কবজ-মণিরত্ন ব্যবসায়ীদের কারবার জমজমাট হয়েছে। অনেক বিজ্ঞান-পড়া গবেষণা-করা ভালো লোকেরাও জ্যোতিষের পক্ষে যুক্তি-তথ্য-উদাহরণ উপস্থাপনা করে এর ব্যাপকতর প্রসারের চেষ্টায় মেতেছে। উন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহেও (এমনকি কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশেও) ভাগ্যগণনা, রত্নধারণ, হাত-দেখা ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা বেড়েছে ছাড়া কমে নি। ব্যাপারগুলি জটিল এবং বিতর্কমূলক—বিজ্ঞানের আলোয় এর পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের সত্যতা, প্রামাণ্য, শক্তি, ব্যাপ্তি, আজ সর্বজনস্বীকৃত। সব জানা হয়ে গেছে একথা বিজ্ঞান কখনোই বলে না, বরং সর্বদাই অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতায় যেতে চায়। একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞান তার সত্য উপলব্ধির ভিত্তিকে আরো দৃঢ় এবং মজবুত করে। সুতরাং অ্যাস্ট্রোলজির আলোচনায় বিজ্ঞানের ইতিহাস অপরিহার্য সহায়ক। কোন প্রামাণ্য ইতিহাসই জ্যোতিষীবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে নি, সর্বত্রই একে ভুয়া বিজ্ঞান বা pseudo-science বলা হয়েছে। বড় বড় বিজ্ঞানী ও বহু প্রাজ্ঞ সচেতন মানুষ একে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলে অভিহিত করে গেছেন। তথাপি জ্যোতিষ ও ভাগ্যবিচার রয়েছে এখনো। সুতরাং এটা বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন—কেন সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পৃথিবীতেও এর এত প্রচলন।

জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস ও বিস্তার

প্রাচীনকালে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তার কৃষিকর্ম, নৌ-চালনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির তাগিদে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছে। তখন জ্যোতিষীবিদ্যা (Astrology) আর জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তখন দূরবীক্ষণ বা টেলিস্কোপ ছিল না, গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নি। ফলে মানুষের জ্ঞান ছিল সীমিত ও নিম্নমানের। কালক্রমে, বিশেষত ইওরোপীয় নবজাগরণের কালে, কোপার্নিকাস-ব্রুনো-গ্যালিলিও-টাইকোব্রাহে-কেপলার-নিউটনের হাত ধরে পরীক্ষা ও মননলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে অস্পষ্ট-অসম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণাগুলি পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হয়ে বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যার রূপ নিল। অ্যাপোলোনিয়াস, হিপার্কস, আর্যভট, ভাস্করের জ্যোতিষবিদ্যায় গণনা থাকলেও তা বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে নি, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাই বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যেমন—তন্ত্র বা কিমিয়াবিদ্যা (Alchemy) নয়, আধুনিক রসায়নই বিজ্ঞান। যেমন—ডাইনীবিদ্যা বা ভেল্কি নয়, আধুনিক 'মেডিক্যাল সায়েন্স'-ই বিজ্ঞান। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন :

> "বেশির ভাগ বিজ্ঞানই গোড়ার দিকে ভ্রান্তবিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল, যার ফলে তাদের ছিল কিছু অলীক মূল্য। জ্যোতির্বিদ্যা ছিল জ্যোতিষীবিদ্যার সাথে, কেমিস্ট্রি ছিল কিমিয়াবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত।"[২]

পুরাতনকালের সেইসব অস্পষ্ট বোধ বা ভ্রান্ত ধারণা আজকের যুগে অচল এমনকি হাস্যকর মনে হলেও সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে এদেরও যথেষ্ট অবদান আছে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সুমেরিয়া, আক্কাদ, ব্যাবিলন, মিশর, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে সভ্যতার কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠে যেগুলি ছিল রাজা ও পুরোহিতশাসিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে সে-স্থানের মানুষেরা শিখলো মাপ-জোক, গণনা ও সাধারণ হিসাব।[৩] কিন্তু তখন ঘড়ি-ক্যালেণ্ডার ছিল না, মাস-ঋতু-বৎসরের কোন ধারণা ছিল না। প্রকৃতির সাথে একাত্ম মানুষ, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঋতুতে আসা-যাওয়া ও আচার-আচরণ দেখে নিজেদের অনেক কাজ করত। কাক-মোরগ বা অন্যান্য পশুপাখির ডাক শুনে রাত শেষের সংকেত অনুমান করত, কোকিল বা অন্য পাখির ডাক শুনে বুঝতো শীতের শেষ আসন্ন—বসন্ত সমাগত। মিশরের প্রাণ নীলনদে প্রতি বছরেই বন্যা

হতো, আর বন্যায় আনা উর্বর পলিতে চাষ হতো। জীব-জগতের বিবিধ লক্ষণ দেখেও মানুষ নানা কাজের জন্য প্রস্তুত হতো। ……ক্রমে মানুষের দৃষ্টি পড়ল আকাশের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাগুলির নিয়মবদ্ধ চলাচলের দিকে। এসব থেকেই আবিষ্কৃত হলো সময় গণনা, ক্যালেণ্ডার। নীলনদের বন্যা সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মিশরে সৌর-ক্যালেণ্ডার আবিষ্কৃত হয়, অন্যত্র চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিকে ভিত্তি করে চান্দ্র-ক্যালেণ্ডার বানিয়ে কাজ চলতে থাকে। তাই চাঁদ ও তিথি-গুলিকে কেন্দ্র করে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান গড়ে ওঠে, যার অবশেষ এখনও চলছে আমাদের দেশে—অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন আজও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বাভাবিক বাস্তববুদ্ধির বলে প্রায় সব সভ্যতার ঊষাকালেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল কৃষিকাজ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, প্রভৃতির জন্য সূর্যের গুরুত্বই সমধিক। তাই চাঁদের ওপরে সূর্যদেবতার স্থান হলো। শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই সমসাময়িক কালে সূর্যবন্দনা গুরুত্ব পায়। সুমেরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি স্থানে মিশরের মতো সৌর-ক্যালেণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা ততো না থাকায় সেখানে পুরোহিতরা চান্দ্র ও সৌর বৎসরের ভিতর সামঞ্জস্য বিধানের মতো কঠিন কাজটিতে ব্রতী হয়েছিলেন। শেষ অবধি সফল না হলেও, গাণিতিক জ্যোতিষ তাতে অনেক উপকৃত হয়েছিল। একটি বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করা, দিনকে ২৪ ঘণ্টায়, ঘণ্টা ও মিনিটকে ৬০ ভাগ করা ইত্যাদি সুমেরিয়াতেই হয়। ৭৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে সমস্ত গ্রহগুলির একটি তালিকা প্রণয়নই সম্ভবত ব্যাবিলনীয়দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি; প্রায় ৯০০ বছর পরে টলেমী এই তালিকা ব্যবহার করে গণিত সহযোগে বিশ্বের একটি গঠন-পরিকল্পনা দেন যা ষোড়শ শতাব্দীর কোপার্নিকাস পর্যন্ত প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। "আকাশের এলোমেলো কিছু বিভাজন, উজ্জ্বল কিছু জ্যোতিষ্ক চেনা এবং গুরুত্বপূর্ণ বায়ু বা গগনমণ্ডলীয় কিছু ঘটনাবলীর (প্রায়ই তারিখবিহীন) সংগ্রহের বেশি কিছু ছিল না প্রাচীন ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষচর্চায়। এইসব থেকে শুভ-অশুভ-অনাগত ঘটনাবলীর ইঙ্গিত বোঝবার চেষ্টার লিখিত প্রমাণও পাওয়াযায়। আকাশের জ্যোতিষ্কদের এই সংকেত বা নির্দেশ বোঝার প্রয়াস থেকেই জ্যোতিষীবিদ্যা বা আস্ট্রোলজির যাত্রা শুরু। বিবদমান রাজ্যগুলির ভাগ্য গণনা শাস্ত্রকে **Judicial Astrology** বলে, যা পরবর্তীকালের ব্যক্তির ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করার জটিল পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে 'কোষ্ঠী গণনা শাস্ত্র' তৈরি করে।"[৪]

দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের (খ্রী ১৬০৮) আগে পর্যন্ত আকাশ ও জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সম্বন্ধে নূতনতর ও উন্নততর তথ্য ও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব ছিল না।

সুতরাং ষোড়শ শতাব্দী অবধি পুরাতন জ্ঞানের সুসংবদ্ধ গ্রন্থনা ও ভাগ্য-গণনার প্রসারই হতে থাকলো ; এর সঙ্গে যুক্ত হলো রসায়নের বিকৃত রূপ অ্যালকেমি। [এই অ্যালকেমি বা কিমিয়াবিদ্যা মূলত ইউরোপীয় ধারণা। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশগুলিতে এসব নিয়ে অনুসন্ধান বিশেষ হয় নি। ভারতে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ও নানারকম ধারণবিধির মধ্যে কিমিয়াধারণা লক্ষ্য করা যায়।] জাগতিক বস্তুসমূহ ও গ্রহতারার জগৎ যখন একই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট, তখন তাদের ভেতর নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে—এমনি ছিল ধারণা। প্রাচীন যাদুবিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর কিছু রত্নপ্রস্তরের সাথে গ্রহতারায় রং-এর সাদৃশ্য কল্পনা করে গ্রহরত্ন ধারনের বিধি চালু হলো। এভাবেই কিমিয়াবিদ্যা, ধর্মীয় কুসংস্কার, তাবিজ-কবচ-পাথর-শিকড়-বাকড়, আর জ্যোতিষ মিলিয়ে সামাজিক আবহাওয়া দূষিত হয়ে ওঠে। ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "জন্মলগ্নের কোষ্ঠীবিচার থেকে কারো ভবিষ্যৎ সঠিকভাবে বলা যায়, আবার নানা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে দুর্ভাগ্য এড়িয়ে সৌভাগ্যও আনা যায়। বেশিরভাগ লোক দুয়েতেই বিশ্বাস করত এবং এদের ভিকরকার অসঙ্গতি কখনো লক্ষ্য করেনি। প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা পর্যন্ত অ্যাস্ট্রোলজিতে বিশ্বাস করতেন। ভাবজগতে এইসব গোলমাল মানুষের বুদ্ধিকে দুর্বল করেছিল, তার চেয়েও বেশি সমাজে নৈতিক অধঃপতন এনেছিল।"[২]

প্রাচীনকালে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ছিলেন হিপার্কস (১৯০-১২০ খ্রী পূ)। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা উন্নতির শিখরে উঠেছিল গুপ্তযুগে (৪-৬ শতাব্দী) এবং তা গ্রীক প্রভাবে বিপুলভাবে প্রভাবিত ছিল [৩,৫]। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের গণিতবিদ্ আর্যভট রচিত গ্রন্থ 'আর্যভটীয়'কে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ ধরা হয়। বহু আগে থেকেই ভারতে ব্যাপক জ্যোতিষচর্চা হতো। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে, প্রচলিত গ্রাম্য ছড়া ও 'ডাক-খনা'র বচনে এর পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরে (৩২৭ খ্রী পূ) গ্রীক এবং তারও পরে রোমান জ্যোতিষও ভারতে আসে। অ্যারিস্টটলের পর গ্রীসে দু-টি বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি হয় : একটি ডায়োজিনিসের সিনিক দর্শন আর একটি জনৈক জেনোর প্রবর্তিত স্টোইক দর্শন। কামনা-বাসনার প্রতি ঔদাসীন্য ও পার্থিব দ্রব্যাদিতে বীতরাগই এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য। সিনিকদের কিছু নিয়ে পূর্ণতর দর্শন হলো স্টোইকদর্শন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (খ্রী পূ ২০৩ ও খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত[৬]) যার প্রকাশ। আগেকার বেদ ও উপনিষদগুলির সতেজ ও বলিষ্ঠ ভাবধারাকে পরাভূত করে ভারতীয় গণমানসে চেপে বসল নিয়তি, অদৃষ্টবাদ। অ্যারিস্টটলের পরবর্তী প্রায় সকল দার্শনিকের ছিল বিষণ্ণতা আর বাস্তব

সংগ্রাম থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে স্টোইকদর্শন ব্যাপক প্রসার লাভ করে আর তার সাথে এগিয়ে চলে জ্যোতিষ ও ভাগ্যগণনার প্রসার। রোমান সাম্রাজ্যের অনুরূপ ভারতে প্রথম যে-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো তা হলো মৌর্য সাম্রাজ্য। জ্যোতিষগণনার মর্মকথা নিয়তি, অদৃষ্ট, যা হিন্দুদের গীতার বা রোমান স্টোইকদেরও কথা। সেই প্রসঙ্গে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই উক্তিটি ভেবে দেখবার মতো :

"স্টোইক ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের পরিপন্থী ছিল। মানুষের আচরণ, মানুষে মানুষে সম্বন্ধ, সবকিছুই স্টোইকমতে নিয়তি-নির্ধারিত। জ্যোতিষ বিচারের মধ্যে দিয়ে কোন ব্যক্তির ভাগ্য বা নিয়তি জানা সম্ভব এবং সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্যে স্টোইকরা নিজেদের মনকে তৈরি করত। কর্তব্যে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সে তার আত্মার পরিশুদ্ধি করত এবং বিশ্বাত্মার সাথে অবশ্যম্ভাবী বিলীন হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করত। এর ফলে গবেষণা বা নতুন জ্ঞান আহরণের জন্যে কোন উৎসাহ-ই হতো না।"[২]

এই সময়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার শুরু হয়। এবং প্রথমযুগের খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতরা জ্যোতিষ গণনা ঘৃণা করতেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রসারে স্টোইক দর্শনের প্রভাব কমে যায় যা ইউরোপে আবার ত্রয়োদশ শতকে ফিরে আসে আরবদের প্রভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আবির্ভাবে। ভারতে ধর্ম বা দর্শনের এইরকম কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় নি, যার ফলে ভারতীয় সমাজও থেকে গেছে প্রায় অপরিবর্তিত। বঙ্গদেশে সেনযুগে (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী) ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষের চর্চাও বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। সেন আমলের অধিকাংশ গ্রন্থই স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত। এই যুগের প্রধান লেখক ছিলেন ভট্ট ভবদেব। এই সময়ে রক্ষণশীল রাজশক্তি যুক্তিনিষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে জ্যোতিষের মতো পরাবিদ্যাকে উৎসাহিত করেছিল—এমন অনুমান করা হয়ে থাকে। গৌরবময় পুরাতন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পচে পচে কুসংস্কার-অপজ্ঞান ও বীর্যহীনতায় ভারতীয় সমাজ ক্রমে ক্রমে আরও দারিদ্র্য, নৈরাশ্য আর অন্ধকারে তলিয়ে চলেছিল।

বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসেও ভারতে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, শিক্ষিত লোকেরা এমনকি বিজ্ঞানকর্মী ও মার্কসবাদীদের অনেকে এই সবে বিশ্বাস করেন এবং সমাজ থেকে এগুলো দূর করার প্রচেষ্টা নেই। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী

মেঘনাদ সাহার একটি বক্তব্য ভারতের অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে সাহায্য করবে :

"আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৯৯ জন লোক পঞ্জিকা ও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। ইউরোপে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন—কিন্তু তাদের অনুপাত কত? ইংলণ্ডে পুরুষের মধ্যে ৫ জন ফলিত জ্যোতিষে পূর্ণ আস্থাবান, ১৫ জন আংশিক বিশ্বাসী এবং ৮০ জন লোক মোটেই বিশ্বাস করেন না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং ৩৩ জন আংশিক বিশ্বাস করেন, বাকী ৩৩ জন মোটেই বিশ্বাস করেন না। এই সমস্ত তথ্য বহু গবেষণার ফলে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ৯৯ জন পুরুষ ও ১০০ জন স্ত্রীলোক ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। এখনো তথাকথিত শুভদিন না হইলে. কোষ্ঠী না মিলিলে বিবাহ হয় না। পঞ্জিকাকথিত শুভদিন না দেখিয়া অধিকাংশ লোকের বিদেশ-যাত্রা হয় না। হাঁচি, টিকটিকি ও পাঁজী সমস্ত হিন্দু জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। আমার বিশ্বাস যে, হাঁচি, টিকটিকি ও পঞ্জিকার অন্ধবিশ্বাস জাতীয়-জীবনের দৌর্বল্যের দ্যোতক।"

জ্যোতিষীবিদ্যা কি বিজ্ঞানসম্মত

আধুনিক সৌরকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার জন্মদাতা নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)। তিনি শুধু জ্যোতির্বিদ্যাতেই বিপ্লব আনলেন না, তার আবিষ্কার মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক সমাজ ও বিজ্ঞানের সূচনা করল। তার আগে যে বিশ্ব-তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তাতে পৃথিবী ছিল বিশ্বের কেন্দ্রতে। আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমী প্রাচীন জ্ঞানাবলী গ্রন্থনা করে গণিত সহযোগে এই বিশ্বতত্ত্বটি দেন আনুমানিক ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে তখন কুষাণ রাজত্ব। গ্যালিলিও-র (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ) আগে দূরবীক্ষণ যন্ত্র না থাকায় গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত, অস্পষ্ট। আধুনিক বিজ্ঞানের বিপরীতে জ্যোতিষীবিদ্যার পুঁথিগুলি পুরাতন। স্বল্পজ্ঞানী, এমনকি ভুয়াজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আজও গণৎকাররা সেইসব অচল-বিদ্যার আধারদেরই প্রামাণ্য বলে প্রচার করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো গ্রহগুলি জ্যোতিষীদের হিসাবে নেই। অন্য জ্যোতিষ্করা, এমন কি এদের চেয়ে বহুদূরের নক্ষত্রাবলী যদি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে এরা বাদ যায় কেন?

অপরপক্ষে আদিম মানুষের কল্পনাজাত রাহু ও কেতু নামক স্বর্গীয় দুই দানবের প্রভাবও এরা গণনায় আনেন। যুক্তিতে মুস্কিলে পড়ে গিয়ে পরবর্তী জ্যোতিষীরা রাহু ও কেতুকে অদৃশ্য অন্ধকার গ্রহ বলে চালাতে সচেষ্ট হলেন, এদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা সত্বেও এরা নাকি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। পুরাতন জ্যোতিষীরা জানতেনই না যে, সূর্য একটি নক্ষত্র, গ্রহ নয়।

যে জন্ম-সময়টি সমস্ত গণনার ভিত্তি সেই জন্ম-সময় নিয়ে জ্যোতিষীদের মধ্যেই মতভেদ আছে। কেউ কেউ মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার সময়কেই জন্মলগ্ন ধরেন, কেউ বা নাড়ি কাটার সময়কে। অথচ শিশু ভ্রূণের জন্ম হয়েছে এর প্রায় ২৮০ দিন আগে গর্ভধারণ কাল থেকে—প্রাচীন ব্যাবিলন ও গ্রীস দেশে এই ভিত্তিতেই কোষ্ঠী রচনা হতো। একটা বড় হাসপাতালে অনেক শিশু একই সময়ে জন্মাতে পারে, তাদের ভাগ্য কিন্তু এক হয় না। বিভিন্ন পরিবেশে, পারিবারিক অবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে তাদের দেহ, স্বভাব-চরিত্র, ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

জন্মলগ্নের ভিত্তিতে জ্যোতিষী-রচিত কোষ্ঠীতে আকাশের যে চিত্র থাকে তাও যথার্থ ও সঠিক নয়। সূর্য বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক থেকে আলো আসতে নির্দিষ্ট কিছু সময় লাগে (আলোর বেগ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল)। জ্যোতিষী পণ্ডিতরা কেউই জানতেন না যে ১২টি রাশিচক্রে এমন একটি নক্ষত্রও নেই যা থেকে আলো আসতে ৪২ বছরের কম সময় লাগে। কোন নক্ষত্র যদি আজ বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়েও যায়, তা জানতেও যে শত শত সহস্র সহস্র বছর লেগে যাবে (কারণ নক্ষত্ররা বহু আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত) জ্যোতিষীরা এসব ব্যাপার জানেন কি ?

এককথায় জ্যোতিষ-গণনা, ভাগ্যবিচার ইত্যাদি যে একেবারেই ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত—তা পরিষ্কার। অতীতের অসার, ভুল, অচল জ্ঞানরাশির আবর্জনাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের সরলতা ও মানসিক দুর্বলতাকে ব্যবহার করে জ্যোতিষী গণক সেজে আজও লোক ঠকিয়ে চলেছে। ষোড়শ শতকের কোপারনিকাসের পর বড় বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেউই জ্যোতিষ গণনা করেন নি। কেপলার এই ব্যবসা করলে কপর্দকহীন হয়ে মরতেন না। প্রায় আশি বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'যদি নক্ষত্র আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে ফেলুক, তাতে ক্ষতি নেই। যদি কোন নক্ষত্র আমাদের জীবনকে বিব্রত করেও তাতে কিছু যায় আসে না। আপনারা এটা জানুন যে, জ্যোতিষে বিশ্বাস সাধারণতঃ একটি দুর্বল মনের লক্ষণ। সুতরাং, মনে এই দুর্বলতা এলেই আমাদের উচিত ডাক্তার দেখিয়ে ভালভাবে খাওয়া আর বিশ্রাম করা।'

তবু কোষ্ঠীরচনা, ভাগ্যগণনা, তাবিজ, কবচ, পাথর-ধারণ চলেছে ব্যাপকভাবে। কেন চলে এইসব? সাধারণ মানুষ যারা জীবনসংগ্রামে জর্জর, অথচ জীবন-পিয়াসী, যাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সীমিত, যাদের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার ক্ষমতা সীমিত, তারা বহুলাংশে প্রচলিত সংস্কার ও আবেগ দ্বারাই জীবনে পরিচালিত হন। জ্যোতিষীরা বেশ লোকের মন বুঝে কথা বলতে পারেন। দুর্বল লোকেরা অনিশ্চিত এমন কি মিথ্যা হলেও—নিজের সম্বন্ধে ভাল কথা, আশার কথা শুনতে চান। সাধারণ মানুষকে অতীত ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে গ্রহ-নক্ষত্র বা অন্য কোন কিছুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে, বর্তমানের জন্য প্রশংসা আর ভবিষ্যতের জন্য আশা দিয়ে, জ্যোতিষীরা তাদের মক্কেলদের দোহন করেন। সমাজে যতই অবক্ষয় বাড়ে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট বাড়ে, বিপন্ন মানবমন ততই অবলম্বন খোঁজে। তাই বর্তমান সামাজিক অবস্থার দিকে তাকালেই ভক্তিরস আর দৈব বিশ্বাসের বাড়-বাড়ন্তও চোখে পড়বে।

এটাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মধ্যযুগ নয়, বিংশ শতকের মধ্যভাগ, বিশেষ করে দুই বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরেই হলো জ্যোতিষীদের স্বুবর্ণ যুগ।[৮] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকে (কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, কেপলার, ব্রাহের সময় থেকে) উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষবিদ্যা প্রায় ডুবেই গিয়েছিল। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান-শিল্প প্রভৃতি গড়ে তোলার কাজে ইউরোপীয়রা এত ব্যাপৃত ছিল যে জ্যোতিষবিদ্যা লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সমাজে যখন সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে, নৈরাশ্য বেড়েছে, পরশ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীরা তখন এই ভুয়াবিদ্যার চর্চা পুনরুত্থাপন করেছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার হেতু 'দুষ্ট গ্রহরা' যে আকাশে নয়, মাটির পৃথিবীর এই সমাজেই বিচরণ করে, এই বোধ, এই চিন্তাধারা যাতে সাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ না করে তার জন্য নানাভাবে জ্যোতিষচর্চা ভাগ্য-গণনাদির চল রাখা, এমন কি সম্প্রসারণ করারও চেষ্টা দেখা যায় শাসকশ্রেণীর আনুকূল্যে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উন্নত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও জ্যোতিষচর্চা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে জোতিষ পড়ানো হয় বিজ্ঞান ফ্যাকালটিতে নয়, প্রাচ্যবিদ্যা ও ঈশ্বরতত্ত্ব ফ্যাকালটিতে 'চক্রবর্তী' ও অন্যান্য ডিগ্রীর জন্য।[৯]

সঙ্কটে নৈরাশ্যে পড়লে দৈব বা জ্যোতিষ্কের অনুগ্রহ মানুষকে বাঁচাতে পারবে না। মানুষকে বুঝতে হবে যে মানুষই তার নিজের ভাগ্য গড়ে অথবা তাদেরই মত আর এক শ্রেণীর মানুষ তাদের জন্য দুঃখ ও দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। যুক্তি, বুদ্ধি

ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই মানুষকে সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে হবে। সেজন্যে আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান ও কর্মোদ্যোগই মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

নির্দেশিকা :

১. Encyclopaedia Britanica, 15th Edition 1975.
২. Bertrand Russell : A History of Western Philosophy ; Simon and Schusters.
৩. J. D. Barnal : Science in History ; Penguin.
৪. Charles Singer : A short History of Scientific Ideas to 1900 ; ELBS.
৫. সমরেন্দ্র নাথ সেন : বিজ্ঞানের ইতিহাস।
৬. D. D. Kosambi : The culture and civilisation of Ancient India.
৭. মেঘনাদ সাহা : রচনা সংকলন।
৮. Man, Myth and Magic : AnIllustrated Encyclopaedia of the Supernatural, Vol. I ; Marshall Cavendish Corporation (New York) 1970.
৯. Universities Hand Book, 1973 ; published by Inter University Commonwealth Universities Year Book Board 1977-78, Vol-2, C-1.

অণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

জন্ম মাটিতে ভাগ্য আকাশে

এক কথায় বলতে গেলে—জ্যোতিষ্ক ও মানুষের ভাগ্যের সম্বন্ধসূত্র থাকা সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্তের সাথে সাথেই অনিবার্যভাবে যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তাহলো—যদি না ভিত্তি কিছু থাকে তাহলে যুগ যুগ ধরে এটা চলে আসছে কিভাবে? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। সেজন্যই তো ব্যাপারটাকে উড়িয়ে না দিয়ে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তবে এটাও ঠিক, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বলেই যে যে কোন-কিছু ধ্রুব সত্য এবং অখণ্ডনীয় হবে, এ ধারণাও সঙ্গত নয়।

ফলিত জ্যোতিষে যা করা হয় তা হলো—মানুষের জীবনের শুভ-অশুভ ঘটনা-দুর্ঘটনা ইত্যাদিকে যুক্ত করা হয় গুটিকয়েক গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনচক্রের নিয়ম-কানুনের সাথে। যুগ যুগ ধরে অন্য অনেক কিছুর সাথেই এরকম যোগসূত্র রচনার চেষ্টা চলছে। ফলে টিকটিকি ডাকলে মঙ্গল, কাক ডাকলে অমঙ্গল, হাঁচি দিলে বিপদ—এহেন ছেঁদো ঘটনার ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী থেকে শুরু করে হাতের চেটোর আঁকি-বুকি, চোখ-নাক-কপালের উঁচুনীচু ভেদ, দেহের আনাচ-কানাচের তিল-জড়ুল চিহ্ন—কিছুই বাদ যায় নি মানুষের ভাগ্যের সাংকেতিক পাঠ হিসাবে।

তবে এসবের মধ্যে রাশি-চক্র বিচারে জ্যোতিষ-গণনার প্রক্রিয়াটির কদর কিছু বেশি। বেশি তার কারণও কিছু আছে। সীমাহীন আকাশের বুকে জ্যোতিষ্কদের নিখুঁত শৃঙ্খলার আবর্তন সবযুগেই মানুষের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। মনে জাগিয়েছে ভক্তিভাব। কল্পনা করা হয়েছে জ্যোতিষ্কদের দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে। মানুষ অর্ধেক কাবু এতেই। এর ওপর আসল দুর্বলতা আড়াল দিতে কঠিন বর্মের মতো দাঁড়িয়ে আছে কিছু আপাত বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক হিসাব-নিকাশের কারিকুরি। সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করতে এ আয়োজন যথেষ্ট।

প্রথমে ফলিত জ্যোতিষে জ্যোতির্বিদ্যার অংশটুকু আলাদা করে নিই। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই রকম: এই শাস্ত্রে বিশ্বকে পৃথিবীকেন্দ্রিক বলে কল্পনা করা হয়েছে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ আমাদের পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে। প্রাচীনেরা একে একটি গোলক হিসেবে ভেবে নিয়েছেন—যার বহিঃসীমানায় রয়েছে নক্ষত্রগুলি। মাথার ওপর জ্যোতিষ্কগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে যাচ্ছে। পূর্ব-পশ্চিমে ওই গোলকের গায়ে একটি বৃত্ত কল্পনা করা হয়েছে যার নাম

ক্রান্তিবৃত্ত। আসলে পৃথিবী যে-পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, গোলকের ওপর তারই অভিক্ষেপ (projection) হলো ক্রান্তিবৃত্ত। এই ক্রান্তিবৃত্ত বরাবর ১৪ ডিগ্রী চওড়া একফালি আকাশ যদি আলাদা করে নিয়ে ভাবি তো মনে করা যেতে পারে, ঠিক যেন বিশাল এক নাগরদোলার রিং পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলছে অবিরাম। এর নাম ক্রান্তিবলয়। এই ক্রান্তিবলয়ের ওপর অবস্থিত কিছু গ্রহ এবং নক্ষত্রদের গতিবিধি এবং আপেক্ষিক সরণ ফলিত-জ্যোতিষের বিবেচ্য বিষয়। এখানে লক্ষণীয়, জ্যোতিষের গণনার ভিত্তি কিন্তু আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক নয়। বেছে বেছে গুটিকয়েক গ্রহ এবং নক্ষত্রকে নেওয়া হয়েছে।

এইস্থানে একটি মন্তব্য বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সকলেই জানেন ফলিত জ্যোতিষের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ওপর জ্যোতিষ্কদের প্রভাব নির্ণয় করা। যদি তাই হবে তাহলে বেছে বেছে গুটিকয়েকের প্রভাব থাকবে—অন্যগুলোকে উপেক্ষা করা হবে—সেটা কেমন যুক্তি? এও কি দেবতার মহিমা, নাকি হিসাবের সুবিধা—তাই এ বাছাই? বোধ হয় হিসাবের সুবিধাটাই এর কারণ হবে। প্রভাব বলতে, প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়—বস্তুরাজির অন্তর্নিহিত একটি ভৌতক্রিয়াকে। এক্ষেত্রে তা স্বীকার করে নেওয়ার সুযোগ থাকছে না, কেন না বিচারের পদ্ধতিতেই ফাঁক—সব আকাশীয় বস্তুকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হচ্ছে না। কাজেই এটা বুঝে নেওয়া যায় যে, কয়েকটি বিশেষ গ্রহ-নক্ষত্রকে নেওয়া হয়েছে তাদের অলৌকিক ক্ষমতার জন্য নয়, নেওয়া হয়েছে নিছক হিসাবপত্র ও গুনতির সুবিধার জন্যই। কারণ এদের গতিবিধির নিয়মকানুন এত নিখুঁত সূত্রে গ্রথিত যে, এর ভিত্তিতে যে-কোন হিসাব মোটামুটি নির্ভুল হতে পারে।

পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। আকাশে চোখ রাখলে—ক্রান্তি-বলয়ের ওপর স্থির থেকে নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণরত। গ্রহরা চলে এই বলয় বরাবরই, তবে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে। ক্রান্তিবলয়ের ওপর মোট ২৭টি নক্ষত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেমন ১. অশ্বিনী ২. ভরণী ৩. কৃত্তিকা ৪. রোহিণী ৫. মৃগশিরা ৬. আর্দ্রা ৭. পুনর্বসু ৮. পুষ্যা ৯. অশ্লেষা ১০. মঘা ১১. পূর্বফাল্গুনী ১২. উত্তরফাল্গুনী ১৩. হস্তা ১৪. চিত্রা ১৫. স্বাতী ১৬. বিশাখা ১৭. অনুরাধা ১৮. জ্যেষ্ঠা ১৯. মূলা ২০. পূর্বষাঢ়া ২১. উত্তরষাঢ়া ২২. শ্রবণা ২৩. ধনিষ্ঠা ২৪. শতভিষা ২৫. পূর্বভাদ্রপদ ২৬. উত্তরভাদ্রপদ ২৭. রেবতী।

এ থেকে কয়েকটি করে নক্ষত্র নিয়ে কল্পনা করা হয়েছে এক একটি নক্ষত্র-মণ্ডল। পুরো বলয়টিকে ৩০ ডিগ্রি করে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যার এক

একটি ঘরে একটি নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থান। এই নক্ষত্রমণ্ডলের প্রত্যেকটিকে এক-একটি রাশি বলে ধরা হয়েছে যেমন, মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট-সিংহ-কন্যা ইত্যাদি। গ্রহ হিসাবে যে ক'টিকে ধরা হয়েছে তারা হলো—রবি (সূর্য) চন্দ্র-মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র-শনি-রাহু ও কেতু। এদের আবর্তনকাল ভিন্ন ভিন্ন। সূর্য যেমন প্রতি এক মাসে একটি রাশি অতিক্রম করে এবং এক বছরে পুরো রাশি-চক্র ভ্রমণ করে, চন্দ্র তেমনি প্রতি চান্দ্রমাসে একবার সম্পূর্ণ রাশি-চক্র আবর্তন করে। অর্থাৎ মোটমাট যে চিত্রটি পাওয়া গেল, সংক্ষেপে তাহলো—১২টি রাশি নিয়ে একটি রাশিচক্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে একটি নির্দিষ্ট গতিতে। তার ওপর রয়েছে ন-টি গ্রহ যারা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে এই চক্রের পথে পরিভ্রমণরত। এর ফলে যে কোন একটি সময়ে বিভিন্ন রাশিতে একটি দু-টি বা ততোধিক গ্রহ ছড়িয়ে থাকবে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের অবস্থানও পরিবর্তিত হবে। যেহেতু গতিবেগ নির্দিষ্ট, অতএব কোন এক সময়ের জন্য এদের আপেক্ষিক অবস্থান জানা থাকলে তার আগে কিংবা পরের যে কোন সময়ের জন্য তাদের অবস্থান নির্ণয় করা শুধুমাত্র কিছু অঙ্ক কষার ব্যাপার।

এ অবধি যা বলা হলো তা তো জ্যোতির্বিদ্যারই বিষয়—তবে পুরনো সব ধারণা রয়েছে এই যা। যেমন সূর্যকে গ্রহ বলা হয়েছে, রাহু-কেতু নামে দুই গ্রহ হাজির থেকেছে, হালের আবিষ্কার ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো তো লিস্টেই নেই, নতুন তারার জন্ম বা পুরনো তারার মৃত্যুর বিবেচনা নেই, ইত্যাদি। কিন্তু এ-ব্যাপারে বিতর্ক তুলে কোন লাভ আছে বলে মনে করি না। কারণ স্থূলভাবে কিছু হিসাব করার ভিত্তি হিসেবে গ্রহ-নক্ষত্র-রাশিকে দেখাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কোন্ বস্তু আছে আর কি নেই তার বিচার না করে, হিসেবের ফলাফলটা পর্যালোচনা করাই দরকার। আসল গোঁজামিলটা রয়েছে অন্যত্র, যেখানে মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি ঘটনাকে যুক্ত করা হয়েছে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির সাথে ; আসতে হবে সেই প্রসঙ্গে।

প্রকৃতপক্ষে এই সম্পর্কটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। নিছক মনগড়া কতকগুলি শর্ত স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে গোড়াতে যার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। যেমন, প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র-রাশির ওপর স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে আরোপ করা হয়েছে কিছু কিছু দোষ-গুণের বৈশিষ্ট্য। এর ভিত্তি কি ? জানা নেই। মজা হলো রাশির কল্পনায় যেসব জন্তুর ছায়া দেখা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যেও কল্পনা করা হয়েছে অনুরূপ গুণ। যেমন, মেষরাশি—তার বৈশিষ্ট্য মেষের ন্যায় একগুঁয়ে, অথবা বৃষ-রাশি—তার স্বভাব কাউকে গ্রাহ্য না করা, ইত্যাদি।

গ্রহদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ গুণ আরোপ করা হয়েছে শর্ত হিসেবে। কেউ শুভ গ্রহ কেউ বা অশুভ। বৃহস্পতি, শুক্র— শুভগ্রহ; রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু, কেতু—অশুভ। অবশ্যই এসব আমাদের অবসর সময়ে মনে নানান ভাবের সৃষ্টি করে কিন্তু জীবনের খাত নির্ধারণে নিশ্চয়ই কোন ভূমিকা এদের নেই।

এরপরও রয়েছে আরও সূক্ষ্ম পর্যায়ের বাছবিচার। তাতে আর গিয়ে লাভ নেই। বরং আসা যাক ফলিত জ্যোতিষের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের ভাগ্য গণনায় এর প্রয়োগ কিভাবে হয়।

এখানে একটি শর্ত স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়ার ব্যাপার আছে—যার প্রমাণ চাওয়া যাবে না। ধরে নেওয়া হচ্ছে জন্মমুহূর্তেই মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় গ্রহ-নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান অনুযায়ী। তাই জন্মসময়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের ভিত্তিতে রাশি-চক্রে গ্রহদের অবস্থান অনুযায়ী দু-টি বৈশিষ্ট্য নির্দেশক রাশিকে চিহ্নিত করা হয়। যাদের বলা হয় জন্মলগ্ন ও জন্মরাশি। জাতক যেখানে জন্মাচ্ছে সেখান থেকে দেখলে যে রাশিটি পূর্ব আকাশে উদিত হচ্ছে সেই রাশিই হলো জাতকের জন্মলগ্ন। আর সেই মুহূর্তে চন্দ্র যে-রাশিতে অবস্থান করছে সেই রাশিটি হলো তার জন্মরাশি। সুন্দর একটি ছকের সাহায্যে সেই মুহূর্তের গ্রহ-রাশিদের আপেক্ষিক অবস্থান দেখানো হয়। এর একটি নমুনা ছক এই বই-এর ৪৫ পাতাতে দেখা যাবে। এর বারোটি ঘর বারোটি রাশির স্থান নির্দেশ করে। এর মধ্যে সময়ের হিসেবে গ্রহদের যথাস্থানে বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল জন্মকালীন রাশি-চক্র। এরপর জাতকের যে কোন বয়সকালে গ্রহদের অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। বাকি যা থাকে তা হলো—বিভিন্ন রাশিতে গ্রহসমাবেশ অনুযায়ী নির্দেশিত দোষগুণ বিচারে ভবিষ্যদ্বাণী করা; সেখানেই তো জ্যোতিষ-গণকের কেরামতি দেখানোর সুযোগ!

ওপরের আলোচনা থেকে ধারণা করা অসম্ভব নয় যে, যুক্তি-নিরিখে এবং বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের বিচারে জ্যোতিষ্ক ও মানুষের ভাগ্যের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বিষয়ে কোন আস্থা রাখা চলে না।

আকাশ পর্যবেক্ষণ এবং ভাগ্যগণনার বিষয় দু-টি কিভাবে একসূত্রে জুড়ে গেছে তা ইতিহাসের বিষয় এবং সে সম্পর্কে কমবেশি সকলেরই কিছু ধারণা রয়েছে। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে মানুষের যে অবিরাম ঐকান্তিক প্রয়াস প্রাথমিক স্তরে তার প্রধান এবং শ্রেষ্ঠতম স্রোতের সাথে এই ভাগ্যগণনার স্রোত মিলে মিশে একাকার হয়েছিল। ফলে সে কয়েক সহস্র বৎসর ধরে শ্রেষ্ঠ মেধা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির অধিকারী মনীষীদের ভাবনার আশ্রয় এবং সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে।

তাই, শুরু যেভাবেই হোক জ্যোতির্বিদ্যা এগিয়েছে, সাথে সাথে জ্যোতিষ-গণনার কারিকুরি কৌশলও। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, জ্যোতিষচর্চা সেই আদি পর্বে কোন কৌশলের বিষয় ছিল। যে সমস্ত মনীষীগণ এ নিয়ে চর্চা করতেন তারা সম্পূর্ণ প্রত্যয় নিয়েই করতেন। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে আসল বৈজ্ঞানিক সত্য যা, তা ওই অবিজ্ঞানের খোলস পরিত্যাগ করে প্রকৃত লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা পেয়েছি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান।

সেই ফেলে আসা অংকটিকে পুরনো ঐতিহ্যের আলখাল্লা হিসেবে গায়ে চড়িয়ে আজও কিছু মানুষ এর অল্পস্বল্প চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর চার-পাশের সামাজিক অবক্ষয়ের সুযোগ নিয়ে এরমধ্যে ঢুকে পড়েছে বেশকিছু অসাধু ব্যবসায়ী—সম্পূর্ণ হয়েছে আর এক অবাঞ্ছিত চক্র।

রবীন চক্রবর্তী

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

বিজ্ঞানীদের ঘোষণাপত্র

জ্যোতিষের প্রভাব কমবেশি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন মহলের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা তাই এগিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে, জ্যোতিষবিদ্যার ভিত্তিহীনতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে। বিজ্ঞানের স্বীকৃত তথ্য ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের নিরিখে তাদের অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। এই বিবৃতিগুলি নিয়ে একটি যুক্ত ইস্তাহারে [১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের 'দি হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়] স্বাক্ষর করেন বিশ্বের ১৮৬ জন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ; ১৮ জন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীও রয়েছেন এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে। ইস্তাহারে বলা হয়েছে :

—"গ্রহনক্ষত্রগুলির অবস্থান পৃথিবী থেকে এত দূরে যে, তারা পৃথিবীর ওপর মহাকর্ষ বা অন্যান্য অভিঘাতজনিত যে বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তার পরিমাণ অতি নগণ্য, অতএব জন্ম-মুহূর্তে গ্রহ নক্ষত্রদের আকর্ষণ-বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে—এরকম ভাবার পিছনে কোন যুক্তি নেই। এও সত্য নয় যে, ওই বহুদূরের গ্রহ-নক্ষত্রদের অবস্থান কোন বিশেষ দিন বা সময়কে কোন বিশেষ কাজের পক্ষে সুবিধাজনক করে তুলছে।"

—"মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায় ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করতে চায়। অন্যের পরামর্শে সুখের সন্ধানে ছোটে। ভাবতে চায়, পৃথিবীবহির্ভূত কোন অলৌকিক শক্তিই বুঝি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। এটা বোঝা দরকার যে আমাদের ভবিষ্যৎ নিজেদের ওপর নির্ভর করছে, কোন গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর নয়।"

—"আমরা অত্যন্ত বিচলিত কেন না বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, নামকরা সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তক-প্রকাশক পর্যন্ত ঠিকুজি-কোষ্ঠী, রাশিবিচার, ভবিষ্যদ্বাণীর মহিমা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে কোনরকম যুক্তি-বিচারের স্থান নেই। এতে মানুষের মধ্যে অযৌক্তিক ধ্যানধারণা, অন্ধবিশ্বাস বেড়েই যায়। আমরা বিশ্বাস করি, জ্যোতিষচর্চার ধ্বজাধারীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে এই চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।"[১]

যুক্ত ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছেন যেসব বিজ্ঞানী তাদের মধ্যে আছেন—স্যার ফ্রেড হয়েল, টমাস গোল্ড, কনরাড লোরেনজ, লিনাস পাউলিং, টিনবারগেন, চন্দ্রশেখর, বি. এফ. স্কিনার, ফ্রানসিস ক্রিক প্রমুখ।

এরা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বহু বিজ্ঞানী জ্যোতিষবিদ্যার অবৈজ্ঞানিক দিকটি তুলে ধরেছেন। জ্যোতির্বিদ ডিন্সমোর অলটার, ক্ল্যারেনস ক্লেমিনিশ ও জন ফিলিপস লিখেছেন :

—"গ্রহ-নক্ষত্রগুলি থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ (**radiation**) পৃথিবীতে এসে পৌছয় তা অত্যন্ত ক্ষীণ। এদের মহাকর্ষজনিত প্রভাব এতই কম যে কাছাকাছি বহু বস্তুর তুলনায় সে পরিমাণ নেহাৎই নগণ্য।"

—"জ্যোতিষীদের কোনরকম দৃঢ়, পরিচ্ছন্ন প্রকল্পই নেই যার উপর ভিত্তি করে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।"

—"জ্যোতিষচর্চায় রাশিচক্র-বিচার কোনরকম স্ট্যাণ্ডার্ড পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত নয়। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো—এই তিনটি গ্রহের আবিষ্কার হয়েছে। অথচ এই গ্রহগুলির প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের পূর্বেই জ্যোতিষীরা এই গ্রহগুলির বিভিন্ন প্রভাব সম্বন্ধে মতামত দিয়েছিলেন। এমনকি তখন এই সমস্ত গ্রহগুলির সঠিক কক্ষপথ পর্যন্ত জানা ছিল না।" সময়ের ব্যবধানে অবস্থানের কত তফাৎ ঘটে তা বোঝাতে একটি সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে—

"প্রায় দু'হাজার বছর আগে রাশি (**Sign of Zodiac**) ও নক্ষত্র সমাবেশের (**Constellations**) মিলন ঘটেছিল। বর্তমানে তাদের মধ্যে প্রায় ৩ ডিগ্রী তফাৎ হয়ে গেছে ; এটা ঘটেছে অয়নচলনের (**precession of the equinoxes**) কারণে।"[২]

নিগেল ক্যাডলার 'ভায়োলেণ্ট ইউনিভার্স'-এ লিখলেন :

—"জ্যোতিষীরা ক্রমাগত দাবি করছেন, তারা যে-কোন ব্যক্তির ভাগ্য বলে দিতে পারেন সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের প্রভাব ও আপেক্ষিক গতি থেকে ; এটা হয় মূর্খামি নতুবা ভণ্ডামি, তা ছাড়া কিছু নয়। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের বস্তুর অবস্থান জন্মমুহূর্তে কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ, ভবিষ্যৎ জীবন নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে এরকম ধারণা করা হাস্যকর। যেমন হাস্যকর ধূমকেতুর আবির্ভাব কোন অশুভ ইঙ্গিত বয়ে এনেছে ; প্রাচীনকালের মানুষ এরকম অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করত।"

হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক অ্যাস্ট্রোনমির প্রফেসর ডঃ ডোনাল্ড মেঞ্জেল তার 'অ্যাস্ট্রোনমি' বইতে লিখছেন :

—"অ্যালকেমি একটি অপবিজ্ঞান, তার সাথে রসায়নশাস্ত্রের যে সম্পর্ক, জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার সম্পর্ক সেই রকমই।"

—"জ্যোতিষশাস্ত্রের দাবিগুলির সপক্ষে একফোঁটা প্রমাণও নেই।"

পূর্বে উল্লেখিত ইস্তাহারটির প্রাথমিক খসড়া বানিয়েছিলেন প্রফেসর বোক। তিনি ১৯৭৫ সালে আমেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রোনমি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটির এককালীন সভাপতি ছিলেন। তিনি বললেন :

—"গ্রহ-নক্ষত্ররা সূর্য ও পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে তাদের মহাকর্ষজনিত বল, চুম্বকক্রিয়া ও অন্যান্য ক্রিয়ার প্রভাব নিতান্তই নগণ্য। আর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পক্ষে সূতিকাগৃহের দেওয়ালই যথেষ্ট প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। উপরন্তু সূর্য থেকে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তা চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ থেকে আসা মোট বিকিরণের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।"

জ্যোতিষীরা বলেন, প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকের একটি "বিশেষ" জাতের বিকিরণ বা কম্পন আছে। এই সমস্ত দুর্বোধ্য বা অপরিচিত কম্পনধর্মের প্রভাব পড়ে আমাদের জীবনের উপর। প্রফেসর বোক উত্তরে বলেছেন :

—"চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে যে, সূর্য-চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র সমস্তই একই বস্তুর সমষ্টি, বিভিন্ন অণু-পরমাণুর মিলিত সমন্বয়ে গঠিত। এদের গতিবিধি পদার্থবিদ্যার সূত্রের সাহায্যেই পরিচালিত।" অর্থাৎ দুর্বোধ্যতার কোন সুযোগ নেই।

সূত্র :

১. দি হিউম্যানিষ্ট, Vol. 35, 1975, নিউ ইয়র্ক। নিউ হিউম্যানিষ্ট, Vol. 91, 1975, লণ্ডন।

২. 'পিকটোরিয়াল অ্যাস্ট্রোনমি' থেকে গৃহীত।

৩. এই যুক্তি ও মতামত 'দি স্পেস এনসাইক্লোপেডিয়া' থেকে সংগৃহীত, যার লেখক স্যার বার্ণার্ড লোভেল, প্রফেসর অব রেডিও-অ্যাস্ট্রোনমি, ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর. এইচ. গারষ্টাং, প্রফেসর অব অ্যাস্ট্রোনমি, কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়।

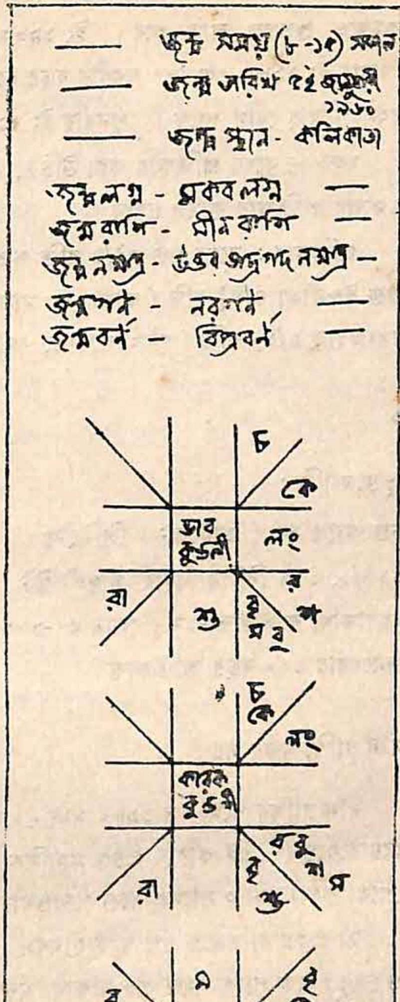
৪. পশ্চিমবঙ্গ পরিব্রাজক সমিতির পুস্তিকা—'In Defence of Reason—No. 1'।

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

নানা মুনির নানা মত

এটি একটি ঠিকুজি-কোষ্ঠীর ছক। বিভিন্ন জ্যোতিষী ও গণৎকারের কাছে এটা নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। গণনায় যিনি যা বলেছেন, তুলে দেওয়া হয়েছে এখানে অবিকৃতভাবে। বিভিন্ন জনের বক্তব্যে কতটুকু মিল আর কতখানিই বা অমিল, তা পাঠক বুঝে নিতে পারবেন সরাসরি। (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্তব্যের অস্পষ্টতা লক্ষণীয়।)

* * *



১

শরদিন্দু চন্দ্র (রামানুজ): এম. পি. জুয়েলার্স অ্যাণ্ড কোং, জি-১০ গড়িয়াহাট মার্কেট, কলিকাতা-১৯; ফোন ৪৬-৮১৩৯

জাতক ব্যাঙ্ককর্মী।

জাতকের জন্মকালীন বুধ মঙ্গল ও চন্দ্র শুভ নয়। অর্থভাগ্য শুভ। দ্বাদশে বহু গ্রহ থাকায় হঠাৎ অর্থব্যয় ও পারিবারিক কারণে বিব্রত হবার সম্ভাবনা আছে। লগ্নপতি শনির দ্বাদশে অবস্থান স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শুভ ইঙ্গিত

দিচ্ছে না। জাতক বাত ও পেটের পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। পূজার পরে কর্মস্থলে শুভফল লাভ হবে। ইং ১৯৮৩ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ শুভফল পাবেন। আবার ইং ১৯৮৫ এবং '৮৭ স্মরণীয় বছর হবে। বিবাহ না হয়ে থাকলে আগামী বৎসর বিবাহ যোগ আছে। পুনরায় ইং ১৯৮৫-তে বিবাহযোগ।

মঙ্গল ও বুধের প্রতিকার করা উচিত, তন্মধ্যে প্রথমে বুধ ও শনির। পরে মঙ্গলের প্রতিকার করলে চলবে।

প্রতিকার : বুধের জন্য ৩½/৪ রতি পান্না (কর্মে সাফল্যের জন্য)। শনির জন্য ইন্দ্রনীলা ৪/৪½ রতি (স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তির জন্য)। মঙ্গলের জন্য রক্তপ্রবাল ৯/১০ রতি (হঠাৎ আঘাত, অসুস্থতা, ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য)।

২

ভৃগুজ্যোতি :

চন্দ্র অ্যাণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
১১৬/১, ১১৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
বহুবাজার, কলিকাতা-১২ ; ফোন ৩৫-৯৮৬৬
জনসেবায় ১৫০ বছর অতিক্রান্ত

মীন রাশি, মকর লগ্ন।

মীন রাশির পক্ষে গত ১৯৮০ সাল থেকে এই জাতকের শনি খুবই ডিসটার্বড হয়ে রয়েছে। এই কারণে প্রচণ্ড মানসিক বিভ্রান্তি দেখা দেবে। ১৯৮২ সালের শেষে কিংবা ১৯৮৩ সালের মধ্যে পড়াশুনায় ছেদ পড়ে যেতে পারে।

জাতকের রাশিচক্রে চন্দ্র খুবই হীনবল। বুধের অবস্থানও ভালো নয়। রাহু ও কেতুর এক পাশে সমস্ত গ্রহ থাকায় অন্যান্য গ্রহদের বলাবল মোটেই নেই, যে কারণে পড়াশুনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাপাওয়া ও কর্মপ্রাপ্তিযোগ খুবই কষ্টকর। তবে ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ রোজগার করবে। কিন্তু সেই রোজগার সরলপথে হবে না, অসৎ উপায়ে। মাঝে মধ্যে মানসম্মান হানিকর ঘটনাও ঘটবে। গত জুন মাস থেকে কেতুর দশা শুরু হয়েছে, থাকবে ৭ বছর। কেতুর এই মহাদশায় ভাল সময় আশা করা যায় না।

প্রতিকার : বৈদুর্য্যমণি ৪-৫ রতি (৩০০-৪০০ টাকা প্রতি রতি)। মুক্তো (বসরাই) ৪-৫ রতি (২৫০-৪০০ টাকা প্রতি রতি)।

৩

পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী :
(জ্যোতিষ সম্রাট, জ্যোতিষ তীর্থ, তান্ত্রিকাচার্য্য, জ্যোতিষ মার্তণ্ড)
৭০ কৈলাশ বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ফোন ৩৫-৩৯৯২

জাতকের কালসর্প যোগ এবং চন্দ্রকেতু যোগ আছে। তাছাড়াও কেতুর দশার মধ্যে সন্ন্যাস যোগ বিদ্যমান ; জাতকের বিষয়-আশয় সংসারধর্মে অনীহা বৃদ্ধি হবে এবং বিবাগী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ২৯/৭/৮ পর আর এই যোগ থাকবে না।

প্রতিকার : স্বর্ণাভা বৈদুর্য্যমণি ৪ রতি। অথবা ছিন্নমস্তার যন্ত্রম্ ধারণ ও পূজাপাঠ করা উচিত। যন্ত্রমের মূল্য ৫০১ টাকা। সাত দিন আগে অর্ডার দিলে এখান থেকেই যন্ত্রম্ পাওয়া যাবে।

৪

তড়িৎকান্তি গোস্বামী, এম. এ., জ্যোতিষ-রত্ন
সেনকো জুয়েলারি হাউস, জ্যোতিষ বিভাগ
১৭০/২ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন ৩৪-২৮৭৩

জাতকের বর্তমান সময় অনুকূল নয়। মানসিক দিক বিশেষভাবে খারাপ করবে। উদর, শ্লেষ্মা, রক্তঘটিত অসুখ বা চর্মরোগে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা। কোনভাবে আঘাতপ্রাপ্তি বা অপারেশনের সম্ভাবনা। ২৯ বৎসর পর্যন্ত খারাপ। সারা জীবনই বিদ্যাক্ষেত্রে বাধার যোগ থাকায় অধিক দূর পড়াশুনার সম্ভাবনাও কম। চাকরি ও ব্যবসা উভয়বিধ যোগ থাকলেও ব্যবসায় ভাল হবে, তবে কোনভাবে আর্থিক ক্ষতির যোগ আছে। খনিজ, জলজ, বনজ সামগ্রী কিংবা লৌহ সংক্রান্ত ব্যবসায় ভাল, তরল পদার্থের ব্যবসাতেও ভালো হবে। অর্থভাগ্য মধ্যম। ২৯-৪৯ বছরে অধিকাংশ দিক দিয়ে ভালো। সঙ্গীতের দিকে যোগ করাবে বা অনুরূপ ব্যবসাতে যুক্ত করাতে পারে।

প্রতিকার : মুক্তা ৪/৫ রতি ডান অনামিকায় রূপায় ধারণীয়। রক্তপ্রবাল ৮/৯ রতি ডান অনামিকায় তামায় ধারণীয়। ক্যাটস আই ২/৩ রতি ডান কনিষ্ঠায় সোনায় ধারণীয় বা পান্না ৬/৭ রতি ডান কনিষ্ঠায় সোনায় ধারণীয়।

৫

স্বামী বাবা, তন্ত্রসাধক
বালী, হাওড়া

জাতক অধ্যাপক বা ব্যাঙ্ক অফিসার হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর রাশিচক্রে মিল রয়েছে, অর্থাৎ মীন রাশি, লগ্নে বৃহস্পতি। সুতরাং লক্ষণ খুবই ভালো। দুইবার দার পরিগ্রহের সম্ভাবনা। প্রথমা স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হতে পারে, তবে পরে আরও একবার বিবাহযোগ আছে। জাতকের তিনটি স্থানে পাপগ্রহ আছে ; অতএব প্রথম স্ত্রীর রাশিচক্রে কোন একটি স্থানেও যদি পাপগ্রহ থাকে, তবে উভয়ে কাটাকাটি হয়ে স্ত্রী-বিয়োগ রদ হতে পারে।

৬

জনৈক অধ্যাপক
ফলিত পদার্থবিদ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৯২, আ. প্র. চ. রোড। কলিকাতা-৯

জাতকের নিকট ভবিষ্যৎ শুভ।

২৫শে নভেম্বর ১৯৮২ থেকে জীবন নতুন মোড় নেবে—উন্নতির দিকে। ১৯৮৫ থেকে '৮৭ সালের মধ্যে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা। ২৫ বছর বয়সের মধ্যে শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ হবে। ২৯-৩০ বছর বয়সটা জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়।

৭

জনৈক বিজ্ঞানী
জীব-বিজ্ঞান বিভাগ
ফরেনসিক সাইন্স লেবরেটরী, পশ্চিমবঙ্গ

জাতকের বর্তমান শরীর-মনের অবস্থা ভাল নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেওয়ায় উৎসাহ কম। শিক্ষাজীবনে বাধা আসবে। বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা।

বুধের দশা শেষ হয়ে কেতুর দশা শুরু হয়েছে। জীবিকা প্রসঙ্গে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না ; ডাক্তারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে জীবিকার সংস্থান হতে পারে। শুক্রের দশা ভালো—অর্থাৎ ৩০ বছর বয়সে উন্নতি শুরু। নবাংশে শুক্র নীচস্থ বলে ভাগ্যোন্নতিতে কিছুটা ব্যাঘাত আসবে।

জাতকের পরিচয়

(অর্থাৎ যার এই ছক)

বাবা-মার একমাত্র পুত্র। ছোটবেলায় স্বাস্থ্য রীতিমত খারাপ ছিল, এখন অপেক্ষাকৃত ভালো, তবে শ্বাসকষ্ট ও হজমের পুরনো অসুখ আছে। আর্থিক অবস্থা ভালোই। বর্তমানে (১৯৮২) পারিবারিক শান্তিতেও কোন বিঘ্ন নেই।

জাতক পার্ক সার্কাসের ইংরিজি স্কুলের ছাত্র ছিল। আই. সি. এস. ই. এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে। বর্তমানে মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, **ব্যাঙ্ক কর্মী নয়**। নিকট ভবিষ্যতে বিয়ের কোন চান্স নেই।

প্রবন্ধ লেখার অভ্যেস আছে, শিল্প-সাহিত্যে যথেষ্ট ঝোঁক। পেশা হিসেবে ডাক্তারিকে গ্রহণ করাই ইচ্ছা।

*   *   *

তুলনামূলক বিচারের জন্য কয়েকটি নমুনা কেস এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সাতটি গণনার মধ্যে প্রচুর ফারাক খুবই স্পষ্ট। প্রত্যেকটি গণনার ভেতর অস্পষ্টতা আর অমিলও চোখে পড়ে খুব সহজে। কিন্তু কোন একটি সমীক্ষা থেকে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে এই কটি পর্যবেক্ষণ কখনোই যথেষ্ট নয়, ব্যাপক পর্যালোচনা দরকার। তাই ওপরের এই তথ্য থেকে আমরা কোনভাবেই ঠিকুজি-কোষ্ঠীর গণনা ও এই বিদ্যার অপদার্থতা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করছি না, এমনকি ইঙ্গিতও দিতে চাইছি না। আমরা কেবল বিজ্ঞানসম্মত একটি প্রক্রিয়ার উদাহরণ রাখতে চাইছি—বিভিন্ন প্রান্তের উৎসাহী গোষ্ঠী ও ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ায় এগোতে পারেন নিজের নিজের এলাকায় ; সিদ্ধান্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত নিরপেক্ষ মন নিয়ে বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করে যাওয়াই সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে এগোনোর রাস্তা বলে আমরা মনে করি।

'উৎস মানুষ' প্রতিবেদক

জ্যোতিষীর ঘরে

যখন তার ঘরে ঢুকলাম, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। ছোট্ট চেম্বার। তেমনি ছোট্ট ওয়েটিং রুম। তারই মধ্যে সারি সারি সাজানো চামড়ায় বাঁধানো অল্পকিছু সরু-মোটা বই। সবটাতেই সোনার জলে নাম লেখা—জ্যোতিষীর নাম। ইনি পণ্ডিত। জ্যোতিষ সম্রাট, জ্যোতিষ তীর্থ, তান্ত্রিকাচার্য্য, জ্যোতিষ মার্তণ্ড এবং আট লাইন আরো কি কি সব।…মোটা শরীর, চুলে ববছাট। ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, বলুন—

বললাম—আমি কিন্তু দশ টাকার বেশি দিতে পারবো না।

—কেন, খবরের কাগজে দেখেন নি? আমার ফিস তো পঁচিশ টাকা! শেষ অব্দি রফা হল পনেরো টাকায়।

এরপর কোষ্ঠী বিচার করলেন। গ্রহের দশা কাটানোর জন্য প্রতিকার হিসেবে রায় দিলেন। রায় বেরোনোর পর প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, নাম লেখা না থাকলে কি করে বোঝেন ছেলের কোষ্ঠী না মেয়ের?

বড় বড় চোখগুলো আমার দিকে স্থিরভাবে রেখে উত্তর করলেন—বলে না দিলে বুঝতে পারি না।

এবার মাথাটা তার আরো সক্রিয় হল। চোখগুলো আরো সন্দেহজনক। কণ্ঠস্বরের ফ্যাসফ্যাসানি ভাবটা আড়াল করে গম্ভীর সুরে নির্দেশের স্বরে বললেন, আপনার ব্যাগের মধ্যে ওগুলো কি?

ব্যাগটা কোলে তুলে তাতে কোষ্ঠীর ছক আঁকা কাগজটা ঢুকাচ্ছিলাম বললাম, ওগুলো বই।

কি বই, কি বই, দেখি?

আমি আরো মনোযোগী হয়ে এটা ওটা করতে লাগলাম।

বললাম—কি আর দেখবেন? ওগুলো বন্যার বই।

—দেখি না, তাই দেখি না।

—দেখাচ্ছি দাঁড়ান। বলে কিছু পরে ব্যাগ থেকে বার করলাম 'উৎস মানুষে'র বন্যা সংখ্যা। প্রচ্ছদ আর পেছনের কভার ভালো করে উল্টেপাল্টে দেখলেন। পাতা উল্টেও দেখলেন না।

—আপনি ব্যাঙ্কে চাকরি করেন তো এসব বন্যা কেন ব্যাগে ?

(আগেই বলেছিলাম আমি চাকরি করি ব্যাঙ্কে।)

—তাতে কি হয়েছে, চাকরি করলে বন্যা করতে নেই ? কিনবেন আপনি ?

—থাক। আপনি কোন অর্গানাইজেশন, অ্যাসোসিয়েশন করেন নাকি ?

—আমি না। বন্ধুরা করে। তাদেরই বই। কিন্তু এসব কথা কেন ?

—আপনি স্থির হোন, সাবধানী হোন। আপনার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। সত্যি বলুন তো কেন এসেছেন এখানে ?

—কেন, কোষ্ঠী বিচার করাতে ?

—হুম্…

দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলেন জ্যোতিষী। কপালের ভাঁজে ঘনীভূত সন্দেহ। সরু চোখের দৃষ্টিতে দূরভিসন্ধি খোঁজার অকারণ চেষ্টা। অবাক হলাম নিজেই। আমি কি সত্যি কিছু অপরাধ করে ফেলেছি নাকি জ্যোতিষীর ঘরে ঢুকে ?

সঞ্জয় পণ্ডিত

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

পত্র পত্রিকায় রাশিফলের গুণাগুণ বিচার

কলকাতা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ দৈনিক সংবাদপত্র এবং সাপ্তাহিকের পাতায় নিয়মিত প্রকাশিত হয় 'আপনার আজকের দিনটি', 'আজ কেমন যাবে', 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে' বা 'রাশিফল'। এতে থাকে রাশি-গ্রহ-নক্ষত্র-চক্র অনুপাতে সেইসব দিন বা সপ্তাহের আগাম খবরাখবর। লেখেন নামকরা সব জ্যোতিষীরা, যাদের অ্যাস্ট্রোলজির উপর তকমা আছে প্রচুর। দৈনিক কাগজগুলো রবিবারে সাপ্তাহিক ফলাফল প্রকাশিত করে। সেখানে বিস্তারিত এক ভূমিকাও লেখা থাকে। জ্যোতিষীয় সব জটিল রাশিচক্রের হিসেব। কলকাতা থেকে সদ্য প্রকাশিত দৈনিক কাগজ 'বর্তমান'-এ (রবিবার, ৯ ডিসেম্বর '৮৪) 'এ সপ্তাহ কেমন যেতে পারে' শিরোনামে লেখা হয়েছে—"মনে রাখতে হবে,

চেষ্টা + ভাগ্য = ফল। ……গ্রহ-প্রভাব মানুষের জীবনে প্রধানত দুভাবে হয়। প্রথম প্রকার জন্মকালীন গ্রহাবস্থান দ্বারা আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সমকালীন গ্রহাবস্থান দ্বারা। কোটি কোটি লোকের বিভিন্নরকম জন্মকালীন গ্রহাবস্থানের উপর নির্ভর করে সাধারণভাবে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।" অবিশ্বাসীরা না মানুন, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে…।"

না, এত বিস্তারিত কথোপকথনের দরকার নেই। আমরা গত ৯ই ডিসেম্বর ১৯৮৪, রবিবার, বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক বাংলা এবং ইংরাজী সংবাদপত্র এবং একটি সর্বভারতীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক-এর রাশিফল নিচে তুলে দিচ্ছি। বলা বাহুল্য, ৯ই ডিসেম্বর '৮৪ কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ দিন নয়, অন্য সাধারণ দিনগুলোর মতোই একটা দিন এবং সপ্তাহের শুরু হিসেবেই আমরা এখানে নিয়েছি। একই দিনের রাশিফল, গণনা বিভিন্ন 'পণ্ডিতের', পর্যবেক্ষণ আমরা যতটা পেরেছি করেছি, পাঠকও অবশ্যই অনুসন্ধান করুন। প্রসঙ্গত ছোট্ট করে জানিয়ে রাখি, সর্বভারতীয় স্তরের প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয় রাশিফল। সবগুলি তুলে ধরা সম্ভব নয়। ১২টি রাশির মধ্যে প্রথম চারটে রাশির বিশ্লেষণই যথেষ্ট মনে করছি। উদ্দেশ্য একটাই—পাঠকরা নানা মুনির গণনাকে পাশাপাশি রেখে একটু বিচার করে দেখুন রাশিফলের বাণীগুলি কতটা নির্ভরযোগ্য বা কতটা অসার, অর্থহীন।

মেষ

আনন্দবাজার পত্রিকা (রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য)—শরীর মন্দ নয়। কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন ও কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনাও রয়েছে। সন্তানের উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় মিশ্রফল আশা করা যায়। গৃহনির্মাণ বা সংস্কারে ব্যয় হতে পারে। পিত্তজনিত পীড়া ও জর পীড়ার আশংকা রয়েছে। ভাইবোন ও প্রতিবেশী দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

যুগান্তর (রামানুজ)—আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল পাবার যোগ আছে। শিল্পী ও প্রফেশন্যাল লাইনে কর্মরত ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য শুভফল পাবার সম্ভাবনা আছে। শিল্পজাত দ্রব্য, পরিবহণ, ঠিকাদারি ব্যবসায়ে লাভবান হবার যোগ আছে। বিদ্যার্জনে ও পরীক্ষাদি ব্যাপারে শুভফলের সম্ভাবনা আছে। কর্মরত মহিলারা কর্মক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবেন। স্বাস্থ্য ভাল যাবে। ১৪ তারিখ শুভ।

সত্যযুগ (শ্রীভাস্করাচার্য)—সপ্তাহটি মোটামুটি ভালোই যাবে। গঠনমূলক কাজ হবে। ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের সময় শুভ। কর্মপ্রার্থী ও চাকুরিয়াদের মধ্যম ভাব। মেষ লগ্নের কর্মভাব শুভ যাবে।

দৈনিক বসুমতী (মুরারীমোহন বেদান্তাদিতীর্থ)—ব্যবসায়ে টাকা আটকে যাচ্ছে, কোন কাজে আরাম নেই, চাকরিতেও অবসর নিতে না হয়, ছেলেদের কাজের সুযোগ আছে, এক্সপোর্টের বাজার মন্দা, সংসারে দিন দিন অভাব বাড়ছে।

বর্তমান (শিবসাধন ভট্টাচার্য)—এ সপ্তাহটি আপনার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ ৯ তারিখেই আপনার কর্মক্ষেত্রে একটি সহসা পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা। সম্ভবত এই আকস্মিক পরিবর্তনে আপনার মানসিক প্রস্তুতিকে কিছু অদল বদল করার প্রয়োজন হতে পারে। এই ঘটনায় শারীরিক ও মানসিক চাপও আসতে পারে। তবে সমগ্র ব্যাপারটি দ্রুত আপনার স্বপক্ষে চলে আসবে এবং ১০, ১১ তারিখে আপনি সবদিকে স্বস্তি অনুভব করবেন। তবে ১২ তারিখে চোখ ও গলার পীড়া এবং কারও কারও ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ভুল বোঝা-বুঝি ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। ১৩ তারিখ থেকে আবার সমগ্র ব্যাপারেই কিছু পরিবর্তন দেখা দেবে। হয়ত কিছু লাভযোগ ঘটতে পারে। অথচ একই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে একটু জটিলতা দেখা দিতে পারে। ১৪ তারিখে অবস্থার খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আশা করা যায়। ১৫ তারিখ দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহের প্রথম দিনের মত এই দিনটিও আপনার পক্ষে কম বা বেশি মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। কিছু অভাবিত পরিবর্তন ঘটবেই। একেবারে আপনার নিজের লোক এমন কিছু করবে, যাতে আপনি মনে আঘাত পেতে পারেন নতুবা নিজের স্বজন সম্পর্কে এমন কিছু ঘটবে যাতে আপনার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হবে। সম্পূর্ণ সপ্তাহটাই শরীর সম্পর্কে সাবধান থাকবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা (টিনী)—এ সপ্তাহে আপনি অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী এবং আশাবাদী হবেন যদিও অনেক প্রয়োজনীয় আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি অর্থাৎ বুধবার অংশীদার এবং সহযোগীদের সাহায্য পেতে পারেন। অসহায় এবং নিরাশ হয়ে কিছুকাল কাটাবার পর এখন একটা ভাল সময় আসছে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না। যদিও সবকিছু নিয়মমত ঘটবার জন্য অপেক্ষা করা অথবা অন্য মানুষের সাহায্য নেওয়া আপনার পক্ষে কঠিন কিন্তু তা-ই করা উচিত। অন্যের প্রভাবে আপনি নিরাপদ—এদের বিশ্বাস করুন। শুভদিন : ৯, ১০, ১১।

দি টেলিগ্রাফ (নামোল্লেখহীন)—এ সপ্তাহের শেষের আগে হাতের কাজ শেষ

করা কঠিন হবে। এই সময়ে ভবিষ্যতের দিকে বেশি নজর দেওয়া উচিত। ছেলে মেয়েদের জন্য বেশি সময় ব্যয় করা উচিত বিশেষত শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনায়। প্রিয়জনদের সুখী করা কঠিন হতে পারে।

সানডে (সাপ্তাহিক) (অমৃতলাল)—এ সপ্তাহে আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে না। অনুমানের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ে কোন ঝুঁকি নেবেন না। পরিবারের কারও হঠাৎ অসুস্থতার জন্য অর্থনৈতিক সংকট বাড়তে পারে। প্রণয় এবং বিবাহ সংক্রান্ত যোগাযোগ শুভ। কেউ কেউ ভালো জায়গায় বদলি হতে পারেন। এ সপ্তাহের শেষ দিকে একটি চিঠি অবস্থার উন্নতি ঘটাবে।

বৃষ

আনন্দবাজার পত্রিকা—শরীর এক প্রকার চলবে। কিন্তু মানসিক চঞ্চলতা ও উদ্বেগ রয়েছে। কর্মসূত্রে ভ্রমণ ও উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। বিদ্যার্থীরা সাফল্য আশা করতে পারেন। পত্নীদ্বারা উপকৃত হবেন। মামলা মোকদ্দমায় জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সৎকার্যে ব্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে সপ্তাহটা অনুকূল। প্রেম প্রীতির ব্যাপারে সাফল্য ও অবিবাহিতদের বিবাহ যোগ রয়েছে।

যুগান্তর—গবেষণামূলক কর্মে সাফল্য লাভ সম্ভব। উচ্চতর পরীক্ষাদিতে শুভফল লাভের যোগ আছে। কর্মক্ষেত্রে বাধাবিঘ্নের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। পারিবারিক ব্যাপারে চিন্তান্বিত হতে পারেন। ব্যবসায়ে আশানুরূপ লাভ সম্ভব নয়। মহিলাদের প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে বাধাবিঘ্নের লক্ষণ আছে। স্বাস্থ্য খুব ভাল যাবে না। ১০ তারিখ শুভ।

সত্যযুগ—সপ্তাহটিকে ইচ্ছেমত কাজে লাগাতে পারা যাবে। যেকোনো বিষয়েই সাফল্য ও কার্যসিদ্ধির যোগ। ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট সুযোগ আছে। কর্মপ্রার্থী ও চাকুরিয়াদের নতুন খবর নেই। বৃষলগ্নের বৃহস্পতিবার হতে আর্থিক সংকট চলবে।

দৈনিক বসুমতী—কারখানা লোকসানে চলছে, শ্রমিক সম্পর্ক ভাল করুন, চাকরিতে প্রমোশন নেই, ছেলেদের হাতের কাজে নিযুক্ত করুন, লেখাপড়ায় ভাল শিক্ষা দিন।

বর্তমান—এ সপ্তাহটি আপনার পক্ষে মিশ্র ফলপ্রদ। সপ্তাহটি সম্ভবত কিছু বাধাবিপত্তি ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে আরম্ভ হবে। প্রথম দুদিনের ভিতরই অকারণ অর্থক্ষয় এবং হজমের গোলমাল বা বাত ও বায়ু রোগে একটু কষ্ট পেতে

পারেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়তো অনুভব করবেন না। তথাপি তৃতীয় দিনে দুপুরের পর থেকেই অনুভব করবেন যে সমস্ত পরিবেশই আপনার অনুকূলে যেতে আরম্ভ করেছে। তারপর ১২ তারিখেও আপনি কিছু পরিবর্তন আশা করতে পারেন। ঐ দিন আপনি আশা করেন নি তেমন কিছু লাভযোগ ঘটে যেতে পারে। ১৩ তারিখে বিকেল থেকে পরিস্থিতি একটু জটিল হয়ে উঠতে পারে। ঘনিষ্ঠ অথবা বাইরের লোক কারও সঙ্গে আপনার ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে এবং শরীরটাও কম বা বেশি পরিমাণে দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা ভালো। ১৪ তারিখে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের গ্রহ নির্দেশ সমকালীন গ্রহাবস্থান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ১৫ তারিখে নিশ্চিত ভাবেই কিছু পরিবর্তন আশা করতে পারেন। শরীরের দিকে বা মনের দিকে কোনো দিকেই পুরো শান্তি পাবেন না। যারা পুরোনো পীড়ায় ভুগছেন তাদের পীড়া সহসা একটু বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং নিজের সন্তান ও পরিবারের ব্যবহার আপনার মনের মত নাও হতে পারে, বাইরের লোকের সাথে সম্পর্ক সহসা চিন্তার কারণ হয়ে যেতে পারে।

অমৃতবাজার পত্রিকা—বন্ধুদের সাহায্যে সৌভাগ্যবান হবেন। আর্থিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবেন। ইদানিং আপনার রসিকতার জন্য কষ্ট পেলেও শীঘ্রই ফললাভ করবেন। জীবনে পুরস্কৃত হবেন এবং মানসিক ভাবে সুরক্ষিত থাকবেন। আপনার ভবিষ্যতের জন্য বেশি চিন্তিত থাকবেন। এ সপ্তাহে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবেন না। পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন থাকবেন না। শুভদিন : ১০, ১২, ১৩।

দি টেলিগ্রাফ—আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য নিঃসন্দেহে এ সপ্তাহ সুখকর হবে। নানান দিক থেকে রবিবার মনোরম হবে। বেশ কিছু কাজ তাড়াহুড়ো করে করতে হতে পারে। অংশীদার যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উদ্যমে অগ্রসর হয় তাহলে তাকে সংযত করতে হবে। বন্ধুরা সহায়ক হবে।

সানডে (সাপ্তাহিক)—এ সপ্তাহে সকলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। বাণিজ্যিক ও পেশাগত ক্রমোন্নতি হবে। খেলাধূলায় বিরল সম্মানের অধিকারী হবেন। পারিবারিক সম্পর্ক উৎসাহব্যঞ্জক। স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। প্রেম ঘটিত যোগাযোগ খুব শুভ নয়। সামান্য ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি এড়িয়ে চলুন। বিবাহের পরিকল্পনা পিছিয়ে দিন।

মিথুন

আনন্দবাজার পত্রিকা—শারীরিক উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। কিন্তু মানসিক

উদ্বেগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা চলবে। ব্যবসায় সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। ভাইবোনের স্বাস্থ্যহানিতে উদ্বেগ রয়েছে। অংশীদারীর কোন ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে মন আকৃষ্ট হবে। অবিবাহিতের বিবাহের যোগ রয়েছে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের স্বাস্থ্যহানিতে বিচলিত হতে পারেন। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। আইনজীবী ও অধ্যাপকদের পক্ষে সপ্তাহটা অনুকূল।

যুগান্তর—কর্মের চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। অর্থকরী সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। প্রফেশন্যাল লাইনে কর্মরত ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ আছে। ব্যবসায়ে একাধিক সূত্র হতে লাভবান হবার যোগ আছে। অপরের সহায়তায় লাভবান হতে পারেন। স্বাস্থ্য খুব ভাল যাবে না। মহিলাদের প্রিয়জন হতে আনন্দ ও প্রণয়মূলক ব্যাপারে শুভফল পাবার যোগ আছে। ১১ তারিখ শুভ।

সত্যযুগ—যে কোনো গঠনমূলক কাজ সুসম্পন্ন হবে। ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের কাজে-কর্মে সাফল্য আছে। কর্মপ্রার্থী ও চাকুরিজীবীদের কর্ম বিষয়ে শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মিথুন লগ্নের বৃহস্পতিবার হতে স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ চলবে।

দৈনিক বসুমতী—সারের ও কৃষিকার্যে সুযোগ নিন। চামড়া এক্সপোর্ট মন্দা, লোহার কাজে হাত দেবেন না, ধারে কারবার বিপজ্জনক, চাকরিতে সুযোগ মিলবে, বিষয়-সম্পত্তির বেচা-কেনায় লাভ।

বর্তমান—সপ্তাহের প্রথম দিক আপনার একটি শুভ পরিবেশের ভেতর শেষ হবে। সপ্তাহের ঠিক আরম্ভটি তত শুভ না হলেও প্রথম দিন থেকেই অবস্থা অনুকূলে যেতে আরম্ভ করবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে আপনি অনেকটা সহজ বোধ করবেন। এমনকি আগের ঋণ বা ব্যয়বাহুল্য বেশি থাকলেও কোন না কোন দিকে কিছু লাভ ঘটবার সম্ভাবনা। অন্যদিকে দেহ নিয়ে বা লোকজনের সম্পর্ক নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১০ তারিখে অবস্থার নতুন কোন দিকে মোড় ঘোরার সম্ভাবনা কম। ১১ তারিখ দুপুর থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে কম বা বেশি চাপ সৃষ্টি হতে পারে। ১২ তারিখে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থার একটু পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। ১৩ তারিখ বিকেলের দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারেই নিশ্চিত ভাবে কিছু উন্নতি দেখা দেবে। শরীরেও সুস্থতা বোধ করবেন, শত্রুরাও একটু দমিত হয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। ১৪ তারিখ ঐ একই অবস্থা বলবৎ থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু ১৫ তারিখ আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে একটু

ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আপনার শরীর তত ভাল নাও যেতে পারে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও অকারণ চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

অমৃতবাজার পত্রিকা—পারিপার্শ্বিক অবস্থা আপনার আয়ত্তের বাইরে এবং তাই দীর্ঘস্থায়ী পারিবারিক বন্ধনের কথা চিন্তা করবেন। এখন সামান্য ধৈর্য রাখতে পারলে ভবিষ্যতে বড় ঝামেলা এড়াতে পারবেন। পেশাগত ও সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজের জন্য সময় পাওয়া যাবে না। স্বাস্থ্যহানি অথবা বিরক্তির খপ্পরে পড়তে পারেন। ভ্রমণ আপনার সহায় হতে পারে। আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। শুভদিন : ১১, ১২, ১৫।

দি টেলিগ্রাফ—বাগান করা জাতীয় সখের কাজ আপনাকে কাজের ক্লান্তি থেকে দূরে রাখবে। পরিচিত পরিবেশ উপভোগ্য হবে। আপনার পরিকল্পনায় সাধারণের সাহায্য পাবেন। সভা সমিতিতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে লাভবান হবেন।

সানডে (সাপ্তাহিক)—সামাজিক কাজে সারা সপ্তাহ ব্যস্ত থাকতে হবে। কিন্তু অফিসের কাজে অবহেলা করবেন না। সরকারি সংস্থায় কর্মরত পেশাদারেরা উর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকুন। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে ব্যবহারের সময় একটু কৌশলের আশ্রয় নিন। প্রমোদ-ভ্রমণের এটাই উপযুক্ত সময়। প্রণয়ের জন্য উপযুক্ত সময়।

কর্কট

আনন্দবাজার পত্রিকা—সর্দি কাশি বাত-বেদনা কষ্ট দিতে পারে। মানসিক উদ্বেগ ও ভ্রমণের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনের সাথে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। বৈষয়িক ব্যাপারে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। অংশীদারীর কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। অবিবাহিতের বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। পত্নী দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় সাফল্য আশা করতে পারেন। বৈজ্ঞানিক ও শল্যবিদ্‌দের পক্ষে সপ্তাহটা অনুকূল হতে পারে।

যুগান্তর—জনকল্যাণ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। শিল্পী ও সাহিত্যিক কর্মক্ষেত্রে অপরের সহায়তা লাভে সমর্থ হতে পারেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার সুযোগ আছে। নতুন কোন যোগাযোগে ভবিষ্যতে লাভবান হতে পারেন। মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে প্রভাব বৃদ্ধির যোগ আছে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে। ১২ তারিখ শুভ।

সত্যযুগ—মঙ্গলবার দুপুর হতে সব বিষয়ে সাফল্য আছে। ব্যবসায়ী ও

বুদ্ধিজীবীদের মঙ্গলবার তুপুর পর্যন্ত সতর্কভাব দরকার। কর্মপ্রার্থী ও চাকুরিজীবীদের নতুন সম্ভাবনা নেই। কর্কট লগ্নের স্বাস্থ্য সামান্য গোলমাল করবে।

দৈনিক বসুমতী—টাকার জন্য কারখানা বন্ধপ্রায়, সংসার ভেঙ্গে না যায়, যৌথ দোকানে মামলা। ছেলেরা ক্রমেই অবাধ্য, চাকুরির অবস্থা ভাল নয়, পরীক্ষার প্রস্তুতি ভাল। গৃহলাভ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ।

বর্তমান—এ সপ্তাহটি আপনার পক্ষে কিছু বিরুদ্ধ পরিবেশের ভিতর দিয়ে আরম্ভ হবে: প্রথম দিনে আপনার অর্থনৈতিক চাপ ও স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া বিচিত্র নয়। ১০ তারিখ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকটা সহজ থাকবে। ১১ তারিখ তুপুরের পর থেকে সব কিছু সহজ হয়ে আসবে। তু-একটা ভাল যোগাযোগও ঘটতে পারে। ১২ তারিখ কারও সঙ্গে মনান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। বিশেষ ভাবে আপনজনের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। ১৩ তারিখ বিকেলের দিকে অকারণ খরচ বাড়তে পারে বা পুত্রস্থানীয়দের সঙ্গে মতান্তর ঘটতে পারে। কর্কট রাশির জাতক হিসাবে আপনি একদিকে যেমন নরম অন্যদিকে আবার কঠিন। সাধারণত উদার এবং অমায়িক হলেও ছোটোখাটো ব্যাপারে কিছুটা একগুঁয়েমি করে বসেন, সে কারণে নিজের লোকদের সঙ্গেও অশান্তির কারণ ঘটতে পারে। ১৪ তারিখে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হয় না। লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে অথবা মৌলিক চিন্তা করবার ক্ষমতা প্রভৃতির জন্য প্রশংসা লাভ করতে পারেন। ১৫ তারিখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। যদি কোন বড় কাজ আরম্ভ করার বা সূত্রপাতের ইচ্ছে থাকে তবে এদিনই আরম্ভ করুন। আপনার সময় অত্যন্ত অনুকূল চলবে এবং বিজয়, অর্থ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য যে গ্রহ-নক্ষত্র ঘটিত পরিবেশ পাওয়া দরকার সেই পরিবেশ পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত হবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা—এখনও খারাপ সময় চলছে। বুধবারই প্রমাণ হবে আপনি কত চতুর। তারপর কথা কম কাজ বেশি। আর্থিক উন্নতি আছে কিন্তু সাবধান না হলে বিপদ হতে পারে। ভাগ্য আপনার সহায়। গৃহস্থালী ও বাসস্থানের সমস্যায় ভাগ্য নিজের কাজে লাগতে পারে। নিজেকে উপভোগ করার সম্ভাবনা কম। পরিবারের সাথে শান্তি বজায় রাখুন। কমবয়সী বন্ধুদের সাথে ফুর্তি করুন। শুভদিন: ৯, ১২, ১৪।

দি টেলিগ্রাফ—হতাশাজনক অবস্থা এ সপ্তাহেও চলবে। আপনার অংশীদারকে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বার্থান্বেষী মনে হতে পারে। মেজাজ সংযত রাখুন।

উদ্ধত এবং বদমেজাজী ব্যক্তিদের সাথে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কাজে চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করুন।

সানডে (সাপ্তাহিক)—কর্মহীনদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যপূর্ণ সপ্তাহ। অনেকেই এ সপ্তাহের মধ্যে চাকরি পেতে পারেন। যারা চাকুরিরত তারা ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সাথে ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকুন। অর্থ নৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। বাজে খরচ এড়িয়ে চলুন। পরিবারের কোন সামাজিক ঘটনা আপনাকে বিচলিত করতে পারে। রাজনীতিবিদ্ ও উকিলদের পক্ষে এই সপ্তাহ দুর্ভাগ্যসূচক। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন।

উপরের রাশিচক্র-গ্রহ-নক্ষত্র-ছক-এর আমাদের বিশ্লেষণ

মেষরাশি : মেষরাশিতে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, শরীর স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্র।

শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যুগান্তর এবং বর্তমান-এর মন্তব্যের মধ্যে অমিল রয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় নির্দিষ্ট করে কিছু না বলে অতি সাধারণ, অসার মন্তব্য করা হয়েছে। আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে সানডে এবং যুগান্তর সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য করেছে। অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য ভিত্তিহীন, অমূলক। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যুগান্তর এবং সানডের মতামত বিপরীতধর্মী এবং কর্মক্ষেত্র-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সত্যযুগ এবং বর্তমানের মন্তব্যে বৈপরীত্য লক্ষণীয়।

শুভদিন যুগান্তরে বলা হয়েছে ১৪ তারিখ। কিন্তু অমৃতবাজারে বলা হয়েছে ৯,১০,১১ তারিখ। মেষরাশিতে দি টেলিগ্রাফ পত্রিকার অধিকাংশ মন্তব্যই ভিত্তিহীন, অসার।

বৃষরাশি : বৃষরাশিতে বিভিন্ন কাগজে উল্লেখযোগ্য মতামত দেওয়া হয়েছে শরীর-স্বাস্থ্য, প্রেমপ্রীতি, বিবাহ, ব্যবসা, কর্মক্ষেত্র, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে।

শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে বৃষরাশিতে যুগান্তর এবং সানডে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছে। আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য ভিত্তিহীন। বর্তমানও নির্দিষ্ট করে কিছু না বলে অসার মন্তব্য করেছে। অমৃতবাজার পত্রিকা অন্যান্য পত্রিকার বিষয় নিয়ে কিছু বলে নি এবং সম্পূর্ণ আলাদা ও অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছে।

প্রেমপ্রীতি বিবাহ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং যুগান্তর-এর সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য করেছে সানডে সাপ্তাহিক। বর্তমান এবং দি টেলিগ্রাফ অসার অর্থহীন মতামত দিয়েছে। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে সত্যযুগ এবং সানডে-এর

বিপরীত মতামত লিখেছে যুগান্তর। আবার কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং সানডে সাপ্তাহিকের উল্টো মতামত উল্লেখ করেছে দৈনিক বসুমতী। আর্থিক অবস্থা নিয়ে সত্যযুগ এবং বর্তমানের মন্তব্য ভিন্নধর্মী। অমৃতবাজার পত্রিকা এবং আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য অর্থহীন, অতি সাধারণ।

মিথুনরাশি : মিথুনরাশির যে বিষয়গুলি নিয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে সেগুলো মোটামুটি শরীর-স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মক্ষেত্র, আর্থিক অবস্থা, প্রেম-প্রীতি, বিবাহ ইত্যাদি।

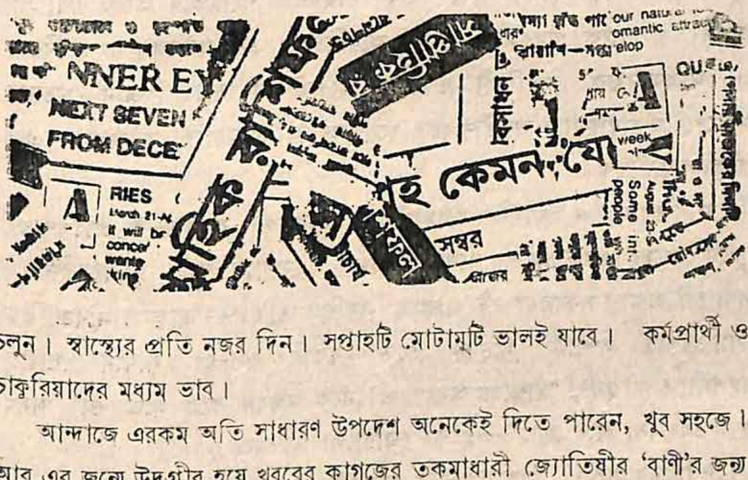
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে, যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং সত্যযুগ পত্রিকায় তিনটি ভিন্নধর্মী মতামত প্রকাশ করেছে ঐ একই বিষয়ে। বর্তমান-এ নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসা সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং যুগান্তর পত্রিকায় ভিন্নমত প্রকাশ করেছে। যুগান্তর এবং সত্যযুগ প্রায় একই রকম মতামত ঘোষণা করলেও দৈনিক বসুমতীর মন্তব্যের সাথে এ দু'য়ের অমিল রয়েছে। সানডে সাপ্তাহিকের মন্তব্য এগুলোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অর্থহীন। অর্থ নৈতিক অবস্থা নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা এবং বর্তমান পত্রিকা বিপরীতধর্মী মতামত প্রকাশ করেছে। আন্দবাজার পত্রিকার মতামত যথারীতি যুক্তিহীন ও অসার।

কর্কটরাশি : কর্কটরাশির সমগ্র অবস্থা সম্পর্কে বর্তমান-এর সাথে দি টেলিগ্রাফ এবং অমৃতবাজার পত্রিকার মতামত সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যযুগ এবং বর্তমান-এর সাথে মিল থাকলেও অমিলও রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়, যেমন শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, সত্যযুগের তিনরকম মন্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য প্রকট। সানডে পত্রিকার মন্তব্য ভিত্তিহীন। ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার সাথে বসুমতী ও দি টেলিগ্রাফ-এর সম্পূর্ণ বক্তব্য উল্টো। যুগান্তর এবং সত্যযুগ ভিন্নমত পোষণ করেছে। আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সাথে সানডে পত্রিকার মিল থাকলেও এ দু'য়ের সাথে অমৃতবাজার পত্রিকার মতামত বিপরীতধর্মী। অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য কিছুটা অর্থহীন অসারও বটে।

কর্মপ্রার্থী-সংক্রান্ত বিষয়ে সানডে সাপ্তাহিকের সাথে সত্যযুগ এবং দৈনিক বসুমতীর সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতিটি কাগজের সাথে একটা নির্দিষ্ট রাশির মিল-অমিলের পাশাপাশি রাশিরাশি ফলের মধ্যে লেখা আছে কিছু অতি সাধারণ বক্তব্য যেগুলো অধিকাংশই অসার,

ভিত্তিহীন মন্তব্য এবং সম্পূর্ণ করে কিছু বলা নেই। এরকম মন্তব্য আমরা যে কেউ সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। যেমন: মানসিক দুশ্চিন্তা রয়েছে। ব্যবসায়ে মিশ্র ফল আশা করা যায়। শরীর এক প্রকার চলবে। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ রয়েছে। সপ্তাহটিকে ইচ্ছেমত কাজে লাগানো যেতে পারে। সংসারে দিন দিন অভাব বাড়ছে। লেখাপড়ায় ছেলে-মেয়েকে ভাল শিক্ষা দিন। ধারে কারবার বিপজ্জনক। সম্পূর্ণ সপ্তাহটিই শরীর সম্পর্কে সাবধান থাকবেন। যারা পুরোনো পীড়ায় ভুগছেন তাদের পীড়া বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার ভবিষ্যতের জন্য বেশি চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন থাকবেন না। ভাগ্য আপনার সহায়। পরিবারের সাথে শান্তি বজায় রাখুন। সামান্য ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি এড়িয়ে চলুন। অনেকেই এ সপ্তাহে চাকরি পেতে পারেন। বাজে খরচ এড়িয়ে



চলুন। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। সপ্তাহটি মোটামুটি ভালই যাবে। কর্মপ্রার্থী ও চাকুরিয়াদের মধ্যম ভাব।

আন্দাজে এরকম অতি সাধারণ উপদেশ অনেকেই দিতে পারেন, খুব সহজে। আর এর জন্যে উদগ্রীব হয়ে খবরের কাগজের তকমাধারী জ্যোতিষীর 'বাণী'র জন্য উৎকণ্ঠা বাড়ানোর কোন মানে হয় কি?

আমাদের এই পর্যবেক্ষণের যা ফলাফল তা নিশ্চয়ই পাঠকদেরও স্পর্শ করবে। রাশিফলগুলির কোন তাৎপর্যই (মানুষকে অকারণ বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ফেলে দেওয়া ছাড়া) আমাদের চোখে পড়ে নি। এরপর রাশিফলের কার্যকারিতা বা গুণাগুণ সম্পর্কে পাঠকের মতামত—পাঠকরা নিজেরাই যাচাই করে নিন।

তরুণ বসু / চিত্ত সামন্ত

জানুয়ারি ১৯৮৫

জ্যোতিষশাস্ত্র ও বিজ্ঞান মুখোমুখি

২৩-২৪শে মার্চ ১৯৮৫ প্রেসিডেন্সী কলেজ সংলগ্ন 'বেকার হলে' Astrological Research Project-এর সর্বভারতীয় ও পাশ্চাত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে 'বিজ্ঞান চেতনা' নামে একটি বিজ্ঞানসংস্থা জ্যোতিষশাস্ত্রের অবৈজ্ঞানিকতা এবং অসারতা প্রমাণ করতে, মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তাকে মূলধন করে অসৎ ব্যবসা চালাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, জনসাধারণকে এ সম্পর্কে সচেতন করতে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌দের সাথে খোলা আলোচনার সম্মুখীন হতে বেকার হলের সামনে 'উৎস মানুষ-'এর সহায়তায় একটি পোস্টার প্রদর্শনী ও পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। এর ফলস্বরূপ ক্রুদ্ধ বিরক্ত এবং আক্রমণাত্মক জ্যোতিষী ও জ্যোতিষপ্রেমীদের সাথে বিজ্ঞান চেতনার সদস্যদের যে বাদানুবাদে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল তা একাধারে কৌতুককর এবং কৌতূহল উদ্দীপক।

জ্যোতিষভক্ত ও জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীরা প্রেসিডেন্সী কলেজেরই প্রবেশপথের সামনে প্রথমেই একটি চমকের মুখোমুখি হন। সেখানে দুটো ব্ল্যাকবোর্ডে যে লেখা দুটি অন্যান্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল তা হল—"ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে সচেতন হতে বেকার হল-এর সামনে পোষ্টার প্রদর্শনীতে আসুন", "মানুষের অসহায় জীবনকে মূলধন করে গড়ে ওঠা অসৎ জ্যোতিষব্যবসা ধ্বংস হোক"—এরকম জোরালো প্রতিবাদ।

ঐ দিনের অসংখ্য কথোপকথনের কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হল, যার মধ্য থেকে তাদের বক্তব্য ও ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করা যেতে পারে।

বিজ্ঞান চেতনার সদস্যরা বহুবার জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌দের সামনে যে প্রশ্নটা বিনীতভাবে রেখেছে তা হল—'চন্দ্র সূর্য পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন বা জোয়ার-ভাটা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের স্থান পরিবর্তন ও মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে। দয়া করে বলবেন কি, তারা কিভাবে ভাগ্যের চাকা ঘোরায়?' অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান চেতনা যে উত্তর পেয়েছে তার মর্মার্থ হল—এই রকম 'জটিল ও গূঢ়' সমস্যার সমাধান জ্যোতিষশাস্ত্রচর্চা ছাড়া বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। আর তাছাড়া, 'এই

খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ওসব মহাজ্ঞানের কথা বলা যায়?' জ্যোতিষীপ্রবর হরবাবু, যিনি ভারতের প্রথম দশজন জ্যোতিষীদের মধ্যে একজন বলে নিজের পরিচয় দিলেন, তিনি জানালেন যে, জগতে দুই প্রকার বল কাজ করে চলেছে—শুভ বল এবং অশুভ বল; প্লাস বল এবং মাইনাস বল। এদেরই প্রভাবে হয় ভাগ্য পরিবর্তন। এরকম বলের কথা বিজ্ঞান চেতনার সদস্যরা কস্মিনকালেও শোনে নি। তারা এইসব বলের objective reality (বাস্তব সম্ভাব্যতা) নিয়ে প্রবল সন্দেহ প্রকাশ করে প্রশ্ন করতে থাকলে ভদ্রলোক অন্য পথ ধরলেন—'চন্দ্র সূর্য ঘোরে, জান তো? ঘোরার জন্য সূর্য চন্দ্রের মধ্যে ঘূর্ণন সঞ্জাত বল তৈরি হয়। সেই বলই বিকিরিত হয়ে মানুষের ভাগ্য-পরিবর্তন ঘটায়।' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ—'ঘূর্ণন সঞ্জাত বল ঘূর্ণীয়মান বস্তুর উপরই ক্রিয়াশীল হয়। সূর্যালোকের মত তা তরঙ্গাকারে বিকিরিত হয় না। সুতরাং আপনার কথা অর্থহীন।' এরপর তিনি জানালেন ভাগ্যের জন্য দায়ী 'কসমিক রে' (Cosmic ray)। কিন্তু এতে ভদ্রলোকের বিপদ আরও বাড়লো। পদার্থ বিজ্ঞানের এক ছাত্র তাকে 'কসমিক রে' সম্পর্কে প্রভূত তথ্য পরিবেশন করে প্রমাণ করলেন যে, মানুষের ভাগ্যের উপর 'কসমিক রে'-র প্রভাব শূন্য। ইতিমধ্যে তিনি উসখুস করতে শুরু করেছিলেন; বিব্রত স্বরে জানালেন—'সত্যি ভাই, আমার কাজ আছে, আর আমি খুব অসুস্থ, ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে, এখুনি ডাক্তারের কাছে যাবার কথা।'

'সেকি, আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন কেন? পাথরে কি এ রোগ সারে না?'

'সারবে না কেন, সারে বইকি। তবে…' বলতে বলতে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়ে একরকম পালিয়ে বাঁচলেন।

নির্মলেন্দুবাবু নামে এক ভদ্রলোক তার অ্যাটাচি কেস খুলে একতাড়া কাগজ বের করে তার নিজস্ব উদ্ভট থিওরী আওড়াতে লাগলেন। ওনার বক্তব্য যে প্রথম থেকেই অযৌক্তিক ও অস্পষ্ট, একথা জানাতেই উনি 'সেট থিওরী' সংক্রান্ত কি সব বোঝাতে শুরু করলেন। অনতিবিলম্বেই, যখন তিনি বুঝতে পারলেন এ লাইনেও ঠিক সুবিধা হবে না, হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—'নিউক্লিয়াসে দুটো প্রোটন কিভাবে থাকে বিজ্ঞান কি তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে?'

বিজ্ঞান চেতনা—অবশ্যই। যে বলের ক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসে দুটো প্রোটন একসাথে থাকে তার নাম Strong interaction nuclear force। অবশ্যই এ-ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায়।

একটু পরেই জ্যোতিষীমশাই ফস্ করে একটা ফরমূলা লিখে ফেললেন—‘$A_{\circ}=C_{\circ}U_{\circ}$’

যেখানে $A_{\circ}\rightarrow$আত্মা, $U_{\circ}\rightarrow$মহাবিশ্ব, $C_{\circ}\rightarrow$ধ্রুবক। প্রশ্ন রাখা হল—‘আত্মার বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞা কি?’

জ্যোতিষীমশাই কিছুটা নিরাশ হলেন।

আবার প্রশ্ন রাখা হল—‘জ্যোতিষবিজ্ঞানের মূল থিওরীটি কি?’

এবার স্মিত হেসে জ্যোতিষীমশাই নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করলেন! অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা নয়, মানুষের বিশ্বাসই জ্যোতিষের ভিত্তি। এত তর্ক-বিতর্ক করেও আসল সত্যটিকে তিনি নিজেই উদ্ঘাটিত করলেন।

‘ভূপালের দুর্ঘটনায় বহু লোক মারা গেল। একই সঙ্গে তাদের সবারই কি মরণযোগ ছিল?’ এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল অনেকের কাছেই। বেশিরভাগই, ব্যাপারটা ঠিক প্রচলিত জ্যোতিষের আওতায় পড়ে না…এই বলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। একজন বৃদ্ধ জ্যোতিষী অবশ্য মুখ ফসকে একটা মন্তব্য করে ফেলেছেন—‘সবার মরণযোগ ছিল না ঠিকই…কিন্তু হঠাৎ গ্যাস লিক করলে আর কি করা যাবে?’

অনেকের যুক্তি ছিল যে ডাক্তররা ভুল করে, মত পাল্টায়, রুগী মারা যায়। ঠিক তেমনি জ্যোতিষী ভুল করতে পারে, কিন্তু তাই বলে জ্যোতিষশাস্ত্রকে ভুল বলা যাবে কি?

এর উত্তরে ‘বিজ্ঞান চেতনা’ বলে যে ডাক্তার একজন রুগীর লক্ষণ (Symptom) দেখে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একাধিক রোগের প্রায় একই রকম লক্ষণ থাকতে পারে। তাই প্রাথমিক চিকিৎসার পর রুগীর উপর আরও বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা চালিয়ে (যেমন মলমূত্র, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা, X-ray, ECG ইত্যাদি) সঠিক রোগ নির্ণয় করেন। কিন্তু বহু জায়গায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় বা পরীক্ষাগুলির ব্যয়বহুলতার জন্য ডাক্তার কেবল রোগের বহির্লক্ষণগুলি দেখে ওষুধ দিতে বাধ্য হন। এই জন্য ডাক্তারদের মত পাল্টানো অস্বাভাবিক কিছু নয়। অল্প কিছুক্ষেত্রে ডাক্তারদের অসতর্কতাও দায়ী হয়। তবে ডাক্তারদের চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ। এই ওষুধ দিলে এই ব্যাকটেরিয়া মরবে…এটা তারা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখে তবেই মানুষের শরীরে প্রয়োগ করেন। এই বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি না থাকার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল গণনাপদ্ধতি নিয়েই নানা মতামত আছে। বস্তুত বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রকে পরীক্ষা করার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

'বিজ্ঞান চেতনা'র প্রত্যেক সদস্যের চারপাশে জ্যোতিষপ্রেমীদের ভিড়। চলছে তুমুল হৈ চৈ, কেউ কেউ দারুণ উত্তেজিত। এক মহিলার মন্তব্য— 'জ্যোতিষশাস্ত্র বুঝতে গেলে দিব্যদৃষ্টি দরকার, বুঝলে হে?' অন্য একজন— 'কেন ওরা এখানে জালাতে এসেছে বলতো?' সেমিনারের সভাপতিকে দেখা গেল ব্যস্তভাবে ঘোরফেরা করতে। তিন-চারজন জ্যোতিষপ্রেমীদের মধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ একজন তিক্তভাবে মন্তব্য করলেন, 'খেলতে খেলতে খেলোয়াড়, আর এরা জানতে জানতে হয়েছে জানোয়ার।'

একজন বয়স্ক জ্যোতিষপ্রেমিক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন (অবশ্য বাধ্য হয়ে আমাদেরও গলা চড়াতে হচ্ছিল)। হঠাৎ এক তরুণ জ্যোতিষী এগিয়ে এসে ঝুম্ করে আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ফেললেন ও উত্তেজিত ব্যক্তিটিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তরুণ জ্যোতিষীটি জানিয়েছেন দশটি হাতের ছাপ দেখে তিনি সঠিকভাবে বলতে পারবেন, 'কোন্‌টা জীবিত/মৃত ব্যক্তির হাত, কোন্‌টা পুরুষ/নারীর হাত এবং তাদের জন্ম-তারিখ।'

'বিজ্ঞান চেতনা'র এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করা গেল, যেসব জ্যোতিষী বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তারা কিন্তু কখনোই তর্ক করতে আসেন নি। কারো কারো বক্তব্য, 'এ সব থাকা ভাল, বিরোধী মত না থাকলে কি চলে? অতীতেও নানা বিজ্ঞানীকে এমন বিরোধিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল।'

'বিজ্ঞান চেতনার' এই আয়োজনের মূল্যায়ন করলে বলা যায় প্রতারক জ্যোতিষী ও জ্যোতিষব্যবসায়ীদেরকে সামনাসামনি কিছুটা আঘাত করা গেছে, কিন্তু যেহেতু এটা তাদের ব্যবসা, সব যুক্তি হারিয়েও তারা কেউই নিজেদের জেদ ছাড়েন নি। লাভ হয়েছে অন্যভাবে, সেদিন সেমিনারে এমন অনেক মানুষ এসেছিলেন যারা নিছক কৌতূহলী। তারা অনেকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এবং আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এমন দু-চার জন, যারা দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সাথে জ্যোতিষচর্চা করে এর অসারত্ব ধরে ফেলেছেন। তাদের তথ্যনির্ভর যুক্তিগুলো আরো জোরালো হয়েছিল। কার্যকরভাবে জ্যোতিষ-বিরোধিতা করতে গেলে, জ্যোতিষশাস্ত্রের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলিও জানা প্রয়োজন। 'বিজ্ঞান চেতনা'র এই অভিজ্ঞতা নতুন ভাবনার জন্ম দেয়।

'বিজ্ঞান চেতনা'র সদস্যবৃন্দ

মে ১৯৮৫

বস্থ বিজ্ঞান মন্দির ও জ্যোতিষ চর্চা

এবারে (৯-১০ই এপ্রিল ১৯৮৮) ছিল জ্যোতিষীদের একাদশতম সম্মেলন—এককালের বিজ্ঞান সাধনার ঐতিহাসিক ক্ষেত্র, আধুনিক গবেষণায় প্রখ্যাত বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে। স্বঘোষিত জ্যোতিষ 'বিজ্ঞানী'-রা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রচার করছিলেন তারা আমাদের অর্থাৎ বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়ের বন্ধুদের জ্যোতিষ সম্পর্কে সমস্ত রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি ১৯৮৫ সালে ওনাদের ৮ম বার্ষিক সম্মেলনে (প্রেসিডেন্সির বেকার হলে) ওনাদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল,—তাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা কিছু প্রশ্ন রেখে ছিলাম যার সদুত্তর আমরা তখন পাই নি। সে কারণে প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা এবার সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন গিয়ে হাজির হলাম বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের সামনে—সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র বিরোধী পোষ্টারও ছিল। সম্মেলনের প্রায় শেষের দিকে **open session** এ আমাদের প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হল।

আমাদের প্রশ্ন ছিল :

১. গ্রহ-নক্ষত্র আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায় কিভাবে ?

২. ১৯৮৪ সালে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় একসঙ্গে প্রচুর লোক মারা যায়—এসমস্ত লোকের আয়ুরেখা কি একদিনে শেষ হয়েছিল ? আর ওদের জন্মের সময় **Steller Constelletion** কি এক ছিল ?

৩. ওনাদের নিজেদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল, রত্নরাজি নাকি 'কসমিক রে' (মহাজাগতিক রশ্মি) ধারণ করার ভাণ্ডার। প্রশ্ন, কসমিক রে-এর মধ্যে কি কি আছে? রত্নরাজি কিভাবে এসব ধারণ করে ? এটা কোন্ বৈজ্ঞানিকের তথ্য ?

৪. 'মেটাল ট্যাবলেট' কি প্রক্রিয়ায় মানুষের উপকার করে ? —বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিন।

৫. বাঁদরের হাত দেখে কি ভবিষ্যত বলতে পারেন ?

৬. আমাদের কারুর হাত দেখে এক্ষুনি তার অতীত বলতে পারবেন কি ?

৭. ডঃ আব্রাহাম কভুরের জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর রাখা চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছেন না কেন ?

প্রশ্নের লিষ্টি দেখে স্টেজে বসে থাকা বড় বড় জ্যোতিষী একে অপরের মুখ চাওয়াচায়ি করলেন বেশ কিছুক্ষণ। শেষে জানানো হল—কোন সংগঠনের প্রশ্নের উত্তর তারা দেবেন না, ব্যক্তির কাছ থেকে আসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। জানি না এ দুটিতে প্রভেদ কি। মনে হল, প্রশ্নজাল এড়িয়ে যাচ্ছেন ; তাই ব্যক্তিগত (অর্থাৎ একজনের নামে) প্রশ্ন পাঠাতে হল। বলা ভাল open session-এ জ্যোতিষভক্তরাও প্রশ্ন করছিলেন, এবং প্রায় সমস্ত জিজ্ঞাসু লোকদেরই কৌতূহল নিবৃত্ত করছিলেন এক বলশালী জ্যোতিষী, খর্বকায়, চশমা পরা, হেলে দুলে সামান্য হেসে অনায়াসে উত্তর দেন।

একটা প্রশ্নের উত্তরে উনি মন্ত্র ও বিজ্ঞান-এর যোগ খুঁজতে গিয়ে বললেন, "বায়োকেমিষ্ট্রিতে বলে জীবকোষের একটা কম্পন আছে, এই মিলিত কম্পনে একটা আবেশ তৈরি হয় মানুষের চারপাশে—আর বিজ্ঞানের ভাষায় এটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড।" এরকম 'হাঁসজারু' মার্কা বিদঘুটে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনে আর চুপ করে থাকা যায় ? সাহা ইনষ্টিটিউটে বায়োকেমিষ্ট্রিতে গবেষণা করছেন এমন একজন ফস্ করে বলে বসলেন, "এটা কোন্ তত্ত্বে আছে দাদা ? এ্যাতো পড়লাম, পাই নি তো কোথায় !" উত্তরের নামে আজে বাজে বকে সেই জ্যোতিষী অবশেষে বিজ্ঞানী **Hoyle**-এর একটা সমীকরণ আওড়ালেন—**Intelligent being = Chemical Replication + bound electrical charges**। সমীকরণটা নাকি আমাদের প্রত্যেকের জেনে তারপর প্রশ্ন করা উচিত ছিল। এ যেন ২ + ৩ = ৫ সুতরাং ২ গরু + ৩ ছাগল = ৫ গাধা এমন ধারা হিসেব ; যা খুশি সমীকরণ যেখানে সেখানে লাগানো। বহু পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও ওরা **Hoyle**-এর বইটার নাম বলেন নি বা বলতে পারেন নি।

জ্যোতিষিদের নতুন আবিষ্কার—রত্নরাজি, কসমিক রে ধারণ করার ভাণ্ডার। কসমিক রে সম্পর্কে ওদের রোমাঞ্চকর বক্তৃতা শুনলে অবাক হতে হয়। সবই নাকি বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত—স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল জাগে এই নতুন তথ্যটি কার ? কোথায় পাওয়া যাবে এসম্পর্কে সম্যক ব্যাখ্যা ? এবার উত্তর দিতে উঠে দাঁড়ালেন অন্য একজন। বিনয়ের সুরে জানালেন কসমিক রে সংক্রান্ত সমস্ত 'বৈজ্ঞানিক তথ্যই' তার লেখা 'কসমিক থেরাপী' বইটিতে পাওয়া যাবে। সুতরাং ওটা নিয়ে এখানে বিশেষ কিছু বলবার দরকার নেই।

উনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক বোঝালেন—কিছুক্ষণ চলল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে। কয়েকটা ভুল **Differential Equation** কষলেন, তারমধ্যেই এল কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ওনার ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তবে

পদার্থ বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রছাত্রীই জানবেন যে এতদিন ধরে তারা যা শিখেছেন সব একেবারেই ভুল। ওনার ধারনায় আমরা সব আজকালকার ছাত্র-যুবরা প্রাচীন ভারতের মূল্যবান জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করছি। প্রায় একই ধরনের মন্তব্য ছিল আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী সরল দেব-এর। খবরের কাগজের মাধ্যমে উনি সকলের প্রতি আহ্বান রেখেছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা রাখুন; এটা আমাদের ঐতিহ্য। বক্তা গর্বের সাথে জানালেন, "তোমরা জানতে চাও 'কসমিক রে' কেন ভাল?—VIBGYOR-এর V (Violet) ও R (Red) এবং এর মাঝের সব ভালই কসমিক রে। পুরাকালে ঘোড়ার দুটো লাগাম যাদের রশি বলা হতো সেখান থেকেই রশ্মি (রে) কথাটা এসেছে। লাগামের দুটি রশির একটা Violet (বেগুনী) আর একটা হচ্ছে গিয়ে Red (লাল) রশ্মি।" আমরা, বিজ্ঞানের ছাত্ররা সত্যিই জানি না এমন সব চমৎপ্রদ তথ্য। আমরা কসমিক রে সম্পর্কে যা জানি সেটা হল কসমিক রে বেশ শক্তিশালী, ওকে কেউই ধারণ করতে পারে না—বড় জোর অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী অন্য সব রশ্মিতে ভাগ করে দিতে পারে—তাছাড়া VIBGYOR-এর কোনটাই কসমিক রে নয়।

ভদ্রলোকের দীর্ঘ বক্তব্যের পর আমাদের এক বন্ধু আর থাকতে না পেরে বলল, "মহাশয় আমরা চেয়েছিলাম এক গ্লাস জল, পেলাম আধখানা বেল।" সেদিন মজার খোরাক কম ছিল না আমাদের। বিংশ শতাব্দীতেও "পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে", এই তত্ত্বের প্রচারক উপস্থিত ছিলেন সেখানে। খুব খুশি দেখাল তাকে,—আনন্দের চোটে বলে ফেললেন, "তিন বিজ্ঞানের সামনা সামনি লড়াই আজ। এক, আমার প্রচারিত বিজ্ঞান। দুই, বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়ের বন্ধুদের জানা সর্বজনগ্রাহ্য প্রচলিত আধুনিক বিজ্ঞান। তিন, জ্যোতিষীদের প্রচারিত বিজ্ঞান।" উনি জোর দিয়েই বললেন, একদিন ওর তৈরি বিজ্ঞানের সাথেই সকলে মিলবে। কিন্তু বিজ্ঞানী হবার ইচ্ছে সবারই বোধহয় সেদিন ছিল প্রবল। তাই ফিটফাট বাবু চেহারার জ্যোতিষীদের একজন, বাইরের রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, "কোনটাই ঠিক নয়—আমাদের পৃথিবী ও সূর্য দুটোই স্থির, কেউ নড়ছে না।"

উপরের কথোপকথন শুনলে হাসি পায় বড় জোর। কিন্তু এরাতো এই বুজরুকি ব্যবসা চালিয়ে প্রচুর টাকা কামাচ্ছে,—মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে—মানুষ আরও বেশি ভাগ্য-নির্ভর হয়ে পড়ছে। এদিকে আমরা শুনছি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সমর্থক—কিন্তু অবাক না হয়ে পারা যায় না মন্ত্রী সরল দেব-এর 'সরলতা' দেখে। ঐ সম্মেলনে তার উপস্থিত হওয়া বা ঐ

ধরনের মতামত প্রকাশ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে—মানুষের বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা বাড়ছে দিনকে দিন। তাই জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত বলে বোঝাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আছে ওদের। আমরা দেখেছি জ্যোতিষে বিশ্বাসী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক এমনকি ডাক্তাররাও। এতদিন তারা যা শিখেছেন কিংবা ছাত্রদের যা পড়ান তার ঠিক উল্টো কাজ করেন নিজেদের ক্ষেত্রে। শরীর ও মনের রোগ সারাতে পাথর পড়েন। ভবিষ্যত জানতে জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হন। এবারে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর জ্যোতিষীদের প্রচারে আরো একটু সাহায্য করলেন আর কি। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রভূমিতে বিজ্ঞানের নামে আবোল তাবোল তত্ত্ব বোঝান হল। আমরা হয়তো কোনদিন দেখব এই প্রতিষ্ঠানে মহাসমারোহে 'হরিনাম সংকীর্তন' হচ্ছে —তাতে হয়তো বিজ্ঞানীদেরও দেখা যাবে। রক্ষা, জগদীশচন্দ্রকে এসব দেখে যেতে হয় নি।

বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয় (কলকাতা)

জুন ১৯৮৮



প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীরা পরীক্ষায় ফেল

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির মধ্য দিয়ে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটলেও জ্যোতিষী, গণক, তান্ত্রিক, ভবিষ্যদ্বক্তা—এদের প্রভাব কিন্তু কমেছে বলে মনে হয় না, বরং দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে সংকট, অনটন, নিরাপত্তাহীনতার ফাটল দিয়ে পরিত্রাণের সর্টকাট কায়দাগুলির প্রতি মানুষের দুর্বলতা মেশানো মন আকৃষ্ট হয়ে পড়েই। ব্যাপক মানুষের এই আত্মসমর্পণের নমনীয় অবস্থাটাকে বেশি করে কাজে লাগাতে হলে জ্যোতিষবিদ্যা বা গণনাবিদ্যাকে যথেষ্ট মর্যাদার আসনে বসতে হয়। সেখানে বাদ সাধে বিজ্ঞান। জ্যোতিষচর্চার প্রাচীনত্ব, গ্রহ-নক্ষত্রের ভিত্তিতে রচিত রাশিচক্র, তার প্রভাবের সূত্র, দেহ এবং ধাতু, রত্ন এবং ভাগ্য—এসব হাজারো কেরামতির কোনটাই বিজ্ঞানের পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না। ১৮৬ জন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তো ১৯৭৫ সালে নিউ ইয়র্কের 'দি হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত এক যুক্ত ইস্তাহারে সরাসরি ঘোষণাই করলেন—"আমরা অত্যন্ত বিচলিত কেননা…ঠিকুজি-কোষ্ঠী, রাশিবিচার, ভবিষ্যদ্বাণীর মহিমা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রচার চলছে। সেখানে কোনরকম যুক্তি বিচারের স্থান নেই। এতে মানুষের মধ্যে অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণা, অন্ধবিশ্বাস, বেড়েই যায়। আমরা বিশ্বাস করি, জ্যোতিষচর্চার ধ্বজাধারীদের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।"

প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের এরকম সম্মিলিত মতামত উপেক্ষা করা না গেলেও মন থেকে দ্বিধা একদম ঝেড়ে ফেলাও যায় না। তাহলে মিলে যায় কি করে? বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা থাক, অতীত-ভবিষ্যৎ অচেনা-অজানা সব ব্যাপার স্যাপার যে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, আর শক্তিধর পুরুষেরা দিব্যি বলে দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে কি করে? বড় খট্‌কা এখানেই। তাত্ত্বিক বিচারে না মিললে অভিজ্ঞতার দোহাই। অনেক সচেতন স্থিতধী ব্যক্তিও মনে করেন ভবিষ্যদ্বাণী বা গণনা নাকি মিলে যায় অদ্ভুতভাবে। এই মেলা না-মেলার বিচার করবে কে? যুক্তিবাদীরা বলেন, সম্ভাব্যতা বা প্রবাবিলিটির নিয়ম জানলেই কিছু কিছু তথ্য মিলে যাওয়ার রহস্য আর রহস্য থাকে না; নজর করে বুদ্ধি খাটিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ছুঁড়ে দিলে

কয়েকটা লেগে যাবেই, তার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র এক পাতাও পড়তে হয় না। আর, এ তো মানুষের মনের ধর্মই যে, মিলে যাওয়া ঘটনাটা দিব্যি মনে থাকে অথচ না-মেলা তথ্যগুলো বেমালুম মন থেকে উবে যায়। কিন্তু এসবই যুক্তি-তর্কের কথা। মনকে মানাতে গেলে হাতে-নাতে প্রমাণ চাই। নামকরা জাঁদরেল জ্যোতিষী বা সিদ্ধপুরুষদের মুখোমুখি বসে পরীক্ষা করা চাই। বড় কঠিন চাহিদা, এরকম পরীক্ষার সুযোগ কোথায় ?

সুযোগ এসেছিল। তারই বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হচ্ছে বর্তমান রচনায়।… আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত, প্রচারিত ভবিষ্যদ্বক্তাকে আহ্বান জানানো হয়েছিল কিছু খোলাখুলি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তাদের বক্তব্য বা দাবি প্রতিষ্ঠার সুযোগ নেওয়ার জন্য যাতে তাদের উত্তরের ঠিক-ভুল সরাসরি আসরেই যাচাই হতে পারে। সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন চারজন প্রখ্যাত অতি-পরিচিত (বিজ্ঞাপনের দৌলতে) 'ক্ষমতাশালী' ব্যক্তি—

১. **ভৃগু আচার্য্য**—খুবই জনপ্রিয় রাশিবিচারক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভবিষ্যৎ গণনার কাজ করেছেন। আসল নাম শুকদেব গোস্বামী।
২. **পারমিতা**—সচিত্র বিজ্ঞাপনে পরিচিত। একমাত্র মহিলা জ্যোতির্বিদ বলে বিজ্ঞাপিত। আসল নাম শুভ্রা গঙ্গোপাধ্যায়।
৩. **অসিত কুমার চক্রবর্তী**—জ্যোতিষ সম্রাট। নামের আগে 'ডঃ' ব্যবহার করেন। প্রচার পত্রে **FIAGP** নামে আমেরিকার এক আন্তর্জাতিক ডিগ্রীরঅধিকারী বলে উল্লেখ আছে।
৪. **পাগলা বাবা**—'বারাণসী' ব্র্যাকেটে। ভারত বিখ্যাত তান্ত্রিক। চুল-দাড়ি সহ ছবির বিজ্ঞাপনে যে কোন সমস্যার সমাধান দাবি করেন। আসল নাম সুনীল কুমার ভট্টাচার্য।

এই চারজনের সঙ্গে প্রশ্নবাণ সহযোগে আলাপের রেকর্ড করা অনুষ্ঠান বেতারে প্রচারিত হয়েছে গত ১৮ই এপ্রিল ১৯৮৫, রাত্রিবেলা। গোটা অনুষ্ঠানে কিছু জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়গত প্রশ্ন ছিল, তিন ব্যক্তির হস্তরেখা ছিল, চার ব্যক্তির ঠিকুজি-কোষ্ঠী ছিল এবং কিছু 'বলুন দেখি' জাতীয় খোলা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নোত্তরগুলি চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং মাঝে মধ্যে সংকলকের কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য রাখা হয়েছে।

পর্যায় এক

প্রশ্ন ১ : মানবজীবনে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব আর মাটির বুকের রত্নরাজির প্রভাব—এ দু'এর সম্পর্ক কিভাবে নির্ধারিত করেন আপনারা ?

ভৃগু : আর্য ঋষিগণ বিভিন্ন গ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন রত্নের নিবিড় সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রত্যেক গ্রহের একটি বর্ণ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট রত্নের প্রতি তাই এক একটি গ্রহের আকর্ষণ বা প্রীতি থাকে বলে তারা বলেছেন।

পারমিতা : সূর্যরশ্মি ও অন্যান্য সব গ্রহের রশ্মি [মন্তব্য—গ্রহের কোন রশ্মি নেই কিন্তু !] সব সময়ই দেহকোষ দ্বারা মানুষের ব্রেনে সঞ্চারিত হয়ে শুভাশুভ কাজ করে। রত্নের বিকিরিত রশ্মি দেহকোষের মধ্য দিয়ে একই ভাবে শুভ-অশুভ ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে।

মন্তব্য—একজন মুনিঋষিদের আড়ালে গা লুকিয়েছেন, অন্যজন স্বঘোষিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা বুদ্ধির বিচারে অর্থহীন, ভিত্তিহীন তো বটেই। সূর্যের মত, রত্ন কোন রশ্মি বিকিরণ করে না। "শুভ-অশুভ ভাবকে নিয়ন্ত্রণ" কিভাবে করে কেউ জানে না।

প্রশ্ন ২ : আপনারা তো বলেনই যে ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত, গ্রহের প্রভাব হল অমোঘ, তাহলে আপনারাই আবার আপনাদের মক্কেল বা পেশেণ্টকে রত্ন-ধারণের পরামর্শ দেন কেন ?

ভৃগু : পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্যকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না, একথা শাস্ত্রকারগণ বারংবার বলেছেন। তবে, ঋষিগণ ধ্যানবলে যোগবলে জানতেও পেরেছেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিকার করা যায় এবং সে প্রতিকার হিসাবে তারা রত্ন-ধারণের কথা উল্লেখ করেছেন।

পা. মিতা : কোন গ্রহের অশুভ প্রতিক্রিয়াকে শুভমুখী করে তোলাই রত্নের কাজ।

অ. চ. : রত্নের দ্বারা প্রতিকার সম্ভব, কারণ রোগ নিরাময়ের থেকে রোগ প্রতিরোধই শ্রেয় বলে প্রাচীন ঋষিরা রত্ন-ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন।

মন্তব্য—যুক্তির বিন্যাসে আর যা-ই থাক, যুক্তি নেই।

প্রশ্ন ৩ : আপনারা কোন সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা করে দেখেছেন কি পাথর প'রে বা রত্ন ধারণ করে কতজনের অসুখ সেরেছে, সমস্যা মিটেছে আর কতজনের তা হয় নি ?

পা. মিতা : এরকম কোন পরীক্ষা না করলেও স্টোন দিয়ে যে কাজ হয় এটা

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, বা কোন জ্যোতিষ-সংগঠন এরকম কোন সমীক্ষা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

অ. চ. : সমীক্ষা নেই, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি।

মন্তব্য—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই ভিত্তি! অতএব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দাবি তোলাই অনুচিত।

প্রশ্ন : প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রনমির প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু মানুষের ভাগ্যবিচারক জ্যোতিষশাস্ত্র তার প্রাচীন ধারণাগুলি থেকে এক পা-ও এগোয় নি; জ্যোতিষশাস্ত্র এখনো রাহু-কেতুকে গ্রহ বলে ধরে নিয়ে এগোচ্ছে। তাহলে এই শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

পা. মিতা : আমি বলব জ্যোতিষশাস্ত্র পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত।

প্রশ্ন : কিন্তু কিভাবে, একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলবেন?

পা. মিতা : (নীরবতা)।

প্রশ্ন ৫ : আপনার কি মনে হয় ভূপালে গতবছর গ্যাস দুর্ঘটনায় অতজনের যে মৃত্যু হল তাদের সকলের জন্মছকেই কি মৃত্যুযোগ ছিল?

পা. মিতা : এরকম ব্যাপারে স্টেট-এর একটা ক্যালকুলেশন থাকে। ব্যক্তির এবং স্টেটের, দু'টো ছক থেকে গণনা করে ভাগ্য বলতে হয়। দুর্ঘটনার সময় দেশ বা স্টেট-এর ওপরে কোন্ গ্রহের প্রভাব ছিল তা দেখতে হয়।

প্রশ্ন : তাহলে আপনারা গণনা করে বলতেই পারতেন যে ও সময়ই ভূপালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা হবে, যাতে সব লোক ভূপাল ছেড়ে চলে গিয়ে মৃত্যু এড়াতে পারতো!

পা. মিতা : এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী তো আগেই করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : সে কি? এই ভূপাল সম্পর্কে? আপনারা বলেছিলেন?

পা. মিতা : না নির্দিষ্ট করে ('particular') ভূপাল দুর্ঘটনা সম্পর্কে নয়, তবে গতবছর দেশে কোথাও একটা বড় দুর্ঘটনার কথা গণনা করে বলা হয়েছিল।

মন্তব্য—নিষ্প্রয়োজন!

পর্যায় দুই

আসরে তিন ব্যক্তির হাত দেখলেন ভৃগু আচার্য্য। কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছিল। ভৃগু হাত গুণে উত্তর দিলেন, সে উত্তর ঠিক না ভুল হাতে-নাতে মিলিয়ে নেওয়া গেল ওই তিনজন হাতের মালিকের কাছ থেকে।

প্রথম হাত :

প্রশ্ন : আমার মা-বাবা দুজনেই কি বেঁচে আছেন ?

ভৃগু : আমার বিচারে পিতা বর্তমান।

[প্রকৃত তথ্য—দু'জনেই বর্তমান।]

প্রশ্ন : লেখাপড়ায় কেমন ?

ভৃগু : ভালোই। মাস্টার ডিগ্রীর (স্নাতকোত্তর) কাছাকাছি মনে হচ্ছে। ছাত্র অতি ভালো নয়, মাঝামাঝি।

[প্রকৃত তথ্য—অতি ভালো ছাত্র। ইউনিভার্সিটিতে stand করা।]

প্রশ্ন : বর্তমানে মোট আয় কত ?

ভৃগু : দু'হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা মাসিক আয়।

[প্রকৃত তথ্য—মোট আয় মাসে হাজার চারেক টাকা। ইনি Steel Authority of India'র Deputy Chief Marketing Manager।]

দ্বিতীয় হাত :

প্রশ্ন : আমি বিবাহিত। বলুন আমার বিয়ে সম্বন্ধ করে হয়েছে, না লাভ ম্যারেজ ?

ভৃগু : সম্বন্ধ করেই বিয়ে, তবে মেয়েটি পূর্ব পরিচিত। আত্মীয়ের মধ্যে যোগাযোগ করে আর কি ?

[প্রকৃত তথ্য—সম্বন্ধ বিবাহ নয়। সাধারণ সামাজিক প্রথা মেনে বিয়ে হয় নি।]

প্রশ্ন : লেখাপড়া কতদূর হয়েছে ?

ভৃগু : উচ্চ ডিগ্রীতে বিঘ্ন। **B. A.** বা **B. Com.** পাস।

[প্রকৃত তথ্য—**B. Com.** পাস।]

প্রশ্ন : পেশা কি হতে পারে ?

ভৃগু : পরিচালনামূলক কাজ। কারখানায়। ড্রাফ্‌টসম্যান বা ওভার-শিয়ার,—পরিচালনার দায়িত্বে আছেন।

[প্রকৃত তথ্য—State Bank of India'র কলকাতা হেড অফিসে অফিসার পদে কর্মরত।]

প্রশ্ন : বর্তমানে আয় কেমন ?

ভৃগু : দেড় হাজার থেকে দু'হাজার টাকা।

[প্রকৃত তথ্য—তিন হাজার মত।]

তৃতীয় হাত :

প্রশ্ন : মা-বাবা দু'জনেই কি জীবিত ?

ভৃগু : পিতা মৃত। মা জীবিত। পিতা ৮ থেকে ১০ বছর আগে মারা গেছেন।

[প্রকৃত তথ্য—মা-বাবা দু'জনেই জীবিত।]

প্রশ্ন : বিয়ে কবে হয়েছে বলতে পারেন ?

ভৃগু : ২৮ থেকে ৩০-এর মধ্যে।

[প্রকৃত তথ্য—২৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে।]

প্রশ্ন : কবে থেকে চাকরি জীবন শুরু হয়েছে ?

ভৃগু : ২৫ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

[প্রকৃত তথ্য—চাকরি ২১ বছর বয়স থেকে।]

প্রশ্ন : আমার নিজের বাড়ি আছে কি ?

ভৃগু : নির্ঘাৎ আছে। হাত দেখেই বোঝা যায়। ৩৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বাড়ি করেছেন।

[প্রকৃত তথ্য—বাড়ি নেই। এক টুকরো জমিও নিজের নেই।]

মন্তব্য—মোট ১১টি প্রশ্ন করা হয়েছে ভৃগু আচার্য্যকে, তিনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন মাত্র ১টি প্রশ্নের, বাকি সব ভুল। যে তিন ব্যক্তি হাত দেখিয়েছেন তারা ইচ্ছে করেই বেশ-বাস হাব-ভাব অত্যন্ত সাধারণ মানের মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর মত রেখেছিলেন। হাত-এর রেখা বিচারের ফাঁকে ভৃগু আচার্য্য চেহারায় চোখ বুলিয়ে কয়েকটি উত্তর দিয়েছিলেন কিনা তা প্রমাণ করা শক্ত।

এরপর, আসরে চার ব্যক্তির হরোস্কোপ বা ঠিকুজি-কোষ্ঠী পেশ করা হয়েছিল এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। গণনা করে উত্তর দেন পারমিতা ও অসিতকুমার চক্রবর্তী। উত্তর মিলিয়ে নেওয়ার জন্য চার ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যও আসরে জেনে নেওয়া হয়েছে।

জাতক ১ : জন্ম ১৯৫৩ সালের ১৩ই জুন সকাল ৫টা ৫৩ মিনিটে, কলকাতায়। নাম—সুভাষ সান্যাল।

প্রশ্ন : ইনি জীবিত না মৃত ?

পা. মি. : জীবিত।

অ. চ. : মৃত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

[প্রকৃত তথ্য—জীবিত।]

প্রশ্ন : লেখাপড়ায় কেমন ?

পা. মি. : তেমন কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই।

অ. চ. : স্নাতক মানের।

[প্র. ত.—উচ্চ শিক্ষিত। ডক্টরেট। ফিজিওলজিতে পি. এইচ. ডি.।]

প্রশ্ন : পেশা কি বা কর্মজীবন কেমন ?

পা. মি. : পৈত্রিক ব্যবসা। আর্থিক সচ্ছল। বার্ষিক আয় ৫০ হাজারের ওপর।

অ. চ. : চাকরি ভালো না বা স্থায়ী নয়।

[প্র. ত.—স্থায়ী চাকুরি। বার্ষিক আয় ২০ হাজারের মত।]

প্রশ্ন : বিয়ে ?

পা. মি. : জাতক বিয়ে না করলেও কোন মহিলার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

অ. চ. : সম্ভবত বিয়ে হয় নি, তবে ১৯৮৪ সনে যোগ ছিল।

[প্র. ত.—বিবাহিত। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে হয়।]

জাতক ২ : জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৩শে মে সকাল ১১টা ১ মিনিটে, কলকাতায়। নাম—অরুণ মুখোপাধ্যায়।

প্রশ্ন : লেখাপড়ায় কেমন ?

পা. মি. : উচ্চশিক্ষিত। সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ারিং কোন ডিগ্রী রয়েছে।

অ. চ. : উত্তম। ডক্টরেটও হতে পারে।

[প্র. ত.—B.A. পাশ।]

প্রশ্ন : কর্মজীবন কেমন ? পেশা কি ?

পা. মি. : শিল্পী। মনে হয় সঙ্গীত জগতের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া প্রশাসনিক ('administrative') কাজেও যুক্ত ছিলেন।

অ. চ. : কর্মজীবন খুব ভালো। উচ্চ এবং সম্মানজনক পদে, শিক্ষামূলক এবং সাহিত্যমূলকও হতে পারে।

[প্র. ত.—State Bank of India'র কলকাতা হেড অফিসে হেড ক্লার্ক। সঙ্গীতে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি নেই ; সঙ্গীত জগতের সঙ্গে যোগ সাধারণ শ্রোতা হিসেবেই।]

প্রশ্ন : কবে নাগাদ বিয়ে করেছেন ?

পা. মি. : বিবাহিত জীবন সুখের নয়।

অ. চ. : আগস্ট ১৯৬৬ থেকে আগস্ট ১৯৬৭'র মধ্যে প্রবল সম্ভাবনা বিয়ে হওয়ার।

[প্র. ত.—আদৌ বিবাহিত নন।]

জাতক ৩ : জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৩শে এপ্রিল সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, হুগলী জেলার জঙ্গলপাড়া গ্রামে। নাম—অরুণ চ্যাটার্জী।

প্রশ্ন : লেখাপড়ায় কেমন ?

পা. মি. : এম. কম. অথবা সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

অ. চ. : বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত।

[প্র. ত.—**M.A.** পড়তে পড়তে চাকরি। অর্থাৎ **B.A.** পাস।]

প্রশ্ন : পেশা কি ? কর্মজীবন কেমন ?

পা. মি. : এটিও শিল্পীর ছক। সম্ভবত চিত্রশিল্পের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত।

অ. চ. : চিকিৎসক হওয়ার সম্ভাবনা।

[প্র. ত.—সাধারণ চাকুরিজীবী। **State Bank**-এর ক্লার্ক পদে আছেন। সিনেমার দর্শক মাত্র।]

প্রশ্ন : দূর দেশে গেছেন কি ?

পা. মি. : চলচ্চিত্র ব্যাপারে বিদেশে বিশেষ সম্মানিত হয়েছেন।

অ. চ. : বিদেশ ভ্রমণ যোগ আছে।

[প্র. ত.—বিদেশে কোন কালেই যাওয়া হয় নি।]

জাতক ৪ : জন্ম ১৯৫১ সালের ২০শে আগস্ট দুপুর ১টা ৫৮ মিনিটে, কলকাতায়। নাম—রাজীব নিয়োগী।

প্রশ্ন : পেশা কি ? আয় কেমন ?

পা. মি. : রাজনীতি করেন। জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। নানাভাবে আয় প্রচুর।

অ. চ. : চাকুরিজীবী। মাসে ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা আয় হতে পারে।

[প্র. ত.—উচ্চ পদে চাকরি করেন **Steel Authority of India Ltd.** সংস্থায়। মাসিক আয় ৩০০০ টাকা। রাজনীতি করেন না।]

প্রশ্ন : বিয়ে করেছেন কি ? করলে কবে ?

পা. মি. : বিবাহিত।

অ. চ. : বিয়ে না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তবে জুন ১৯৮৪ থেকে জুন '৮৭ বিবাহের যোগ রয়েছে, '৮৫তেও হতে পারে।

[প্র. ত.—বিয়ে হয়েছে সাত বছর আগে, ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে।]

প্রশ্ন : বিদেশ ভ্রমণ ?

পা. মি. : বিদেশ গেছেন।

[প্র. ত.—বিদেশে যান নি।]

মন্তব্য—হিসেবটা দেখা যাক। পারমিতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মোট ১৩টি, সঠিক উত্তর হয়েছে ২টি। অরুণ চক্রবর্তী ১২টি প্রশ্নের মধ্যে একটিরও উত্তর ঠিক দিতে পারেন নি। মনে পড়বে ভৃগু আচার্য্য মোট ১১টি প্রশ্নের মধ্যে ১টির উত্তর ঠিক দিয়েছিলেন। এরকম হাটে-হাঁড়ি ভাঙা ভুল কেন হল? জ্যোতিষ-বিশ্বাসী পাঠকেরা কি বলবেন জানি না, তবে ওই প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীদের মধ্যে দু'জন এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—"সব উত্তর ১০০% নির্ভুল হওয়া কখনো সম্ভব নয়; জাতকের জন্মসময়, হাত ও চেহারা দেখলে আরো কারেক্টলি প্রেডিক্ট করা সম্ভব।" (পারমিতা)

"ভুল হওয়ার কারণ কখনো আমাদের অক্ষমতা, কখনো শাস্ত্রের অপূর্ণতা। বিজ্ঞানের সব শাখাতেই এ দুর্বলতার নজির পাওয়া যায়।" (অসিত কুমার চক্রবর্তী)

মন্তব্য—% বা শতকরা হিসেবে কতটা নির্ভুল উত্তর পাওয়া গেছে এই মুখোমুখি পরীক্ষার আসরে, তার হিসেব আগেই কষা হয়েছে। যারা বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠটুকুও নিয়েছেন (যা বর্তমানে স্কুলের ছাত্রও জানে) তারাই জানেন বিজ্ঞানের কোন শাখাতেই এরূপ দুর্বলতার নজির নেই। বিজ্ঞান যে-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তা যে-কোন স্থানে যে-কোন ব্যক্তিই দিক না কেন, উত্তর দু'রকম হতে পারে না। আমরা এই আসরেই দেখেছি একই প্রশ্নের উত্তরে দু'জন জ্যোতিষ-বিশারদ সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন। তাহলে কিসের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী বা গণনা হচ্ছে? যার কোন দৃঢ় ভিত্তিই নেই তাকে ভরসা করবেন কোন্ বুদ্ধিমান পাঠক?

পর্যায় তিন

শেষে পাগলা বাবা'র সঙ্গে আলাপ। ইনি হস্তরেখা বা কোষ্ঠী দেখেন না, মক্কেলের মুখ দেখেই তার যে-কোন রকম প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা (অলৌকিক?) রাখেন বলে দাবি করেন।......পাগলা বাবার নামের পেছনে "বারাণসী" লেখা থাকে ডিগ্রীর মত। কথা প্রসঙ্গে তাকে বলা হয়েছিল—

প্রশ্ন : পত্র-পত্রিকায় জ্যোতিষী, তান্ত্রিক বা 'শক্তিধর' ব্যক্তিদের নামের পেছনে বড় বড় ডিগ্রী দেখা যায়। যেমন, **FIAGP**, **FRAS—London**,

এম এ এ গ্রেট ব্রিটেন, **LWI**, কসমোবায়োলজিস্ট, রাজ-জ্যোতিষী ইত্যাদি। আচ্ছা, এইসব ডিগ্রীগুলির সত্যি কি অস্তিত্ব আছে? বিজ্ঞাপন ছাড়া অন্য কোথাও তো দেখা যায় না।

পা.বা.: দেখুন, আমার কোন ডিগ্রী নেই। এসব ডিগ্রী কলকাতায় বসেই অর্জন করা যায়। এম এ এ লণ্ডন অ্যাট ক্যালকাটা—এরকম আর কি! অনেকে আবার কোর্টে এফিডেভিট করে নামের সঙ্গে ডিগ্রী বা পদবি জুড়ে নেন। এটা তো খুবই সোজা কাজ।

মন্তব্য—'রতনে রতন চেনে' বলে একটা প্রবাদ বাক্য মনে পড়ে যায়।···

এরপর আসরে উপস্থিত তিন ব্যক্তি 'পাগলা বাবা'কে একটি করে প্রশ্ন করেন যে-কোন বিষয়ে।

প্রশ্ন [প্রথম ব্যক্তি]: আমার সঙ্গে যে ক্যামেরা রয়েছে, বলুন তো এতে কটা ছবি তোলা হয়েছে এ পর্যন্ত।

পা.বা.: ১৬ থেকে ১৭ টা।

উত্তর: ক্যামেরার ইনডিকেটারে দেখা যাচ্ছে ৩০ টা।

প্রশ্ন [দ্বিতীয় ব্যক্তি]: আমার মানি ব্যাগে কত টাকা আছে?

পা.বা.: ৭৭ টাকা। সেভেন সেভেন।

উত্তর: ব্যাগে ২৭০ টাকা আছে।

পা.বা.: ভুল, আমারই ভুল।

প্রশ্ন [তৃতীয় ব্যক্তি]: আমার পকেটে যে সিগারেটের প্যাকেট আছে, এতে কটি সিগারেট রয়েছে?

পা.বা.: ৭টা

উত্তর: ৯টা আছে।

পা.বা.: এইটাও আমার ভুল হল?

প্রশ্ন: কেন আপনাদের ভুল হয়?

পা.বা: ভুল হয়, নানা কারণেই হয়! হয়তো আমি মুডে নেই। সুস্থতা-অসুস্থতারও ব্যাপার থাকে। তবে আমি তিনটে প্রশ্নই ভুল করলাম দেখে আনন্দ পেলাম, কারণ আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে আমিও ভুল করি, ভুল করেছি।

মন্তব্য—মুখোমুখি পরীক্ষায় খারাপ ফল করে একজন ভারতবিখ্যাত ক্ষমতাধর "মুশকিল আসান" এরকম স্পষ্ট স্বীকারোক্তি যে করছেন তা সবিশেষ লক্ষণীয়। ভূত-ভবিষ্যৎ বাতলে দেওয়ার যে শাস্ত্র তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

নেই, যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণও নেই ; 'মিলে-যাওয়া'র রোমাঞ্চকর বেলুনও ফেঁসে চুপসে যায় মুখোমুখি পরীক্ষায় বসলে, যেমনটি আমরা দেখলাম। এরপরও যাদের কাছে জ্যোতিষ এক নির্ভরযোগ্য শাস্ত্র বলে মর্যাদা লাভ করে তাদের কাছে যুক্তিবুদ্ধির কথা তোলা বৃথা সেখানে, শুধুই বিশ্বাসে মিলায়···।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিজ্ঞান বিভাগ।

সংকলন : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৫

মেলা না-মেলা

বর্তমান দুনিয়ার বহু প্রয়াস সত্ত্বেও ঠিকুজি-কোষ্ঠী বিচার কিংবা হস্তরেখা-বিদ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের সমর্থন আদায় করতে পারে নি। অথচ ব্যাপক মানুষের ওপর প্রভাব রয়েছে এর। বিশ্বাস-ভরসার বিশাল বৃক্ষের মতো যে জ্যোতিষ আজও মোহ এবং শান্তির ছায়াবীথি রচনা করে আছে, তার শেকড়ের জোর কিন্তু অনেকটাই রয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়ার ওপর। ছক গুণে বা হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দুটো চারটে কেস মিলিয়ে দিতে পারলেই বাজিমাৎ, তখন আর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা যুক্তিশীল ব্যাখ্যার জন্য কারুর মাথাব্যথা থাকে না।

কিন্তু এই মেলা না-মেলার ব্যাপারটাই বড় গোলমেলে। ভূত-ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিক মিলল কি-না তা জানার উপায় হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের বিবৃতি। সত্যি-মিথ্যে বলাটা তার ওপরেই নির্ভর করছে। সচেতনভাবে মিথ্যে না বললেও বোঝার ভুল কিংবা গণকের "বিচার"-এর সঠিক ব্যাখ্যার হেরফের হতেই পারে। এখানে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা বিরাট। দুর্বল বিশ্বাস-প্রিয় মন মিলে-যাওয়ার দিকে ঝুঁকে থাকে বেশি। প্রাত্যহিক জীবনের অশান্তি, অতৃপ্তি, সমস্যা, শূন্যতায় আচ্ছন্ন মানুষ অবলম্বন খোঁজে, অনায়াসে সংকটমুক্তির প্রত্যাশায় উদগ্রীব থাকে —যার ফলশ্রুতি হিসেবে অতি-প্রাকৃত দৈবশক্তির প্রতি প্রচ্ছন্ন ভরসা তাকে

প্ররোচিত করে রাশি বা রেখা বিচারে মিল খুঁজে বের করতে। "খুঁজে বের করা" বলছি এ কারণে যে, একটু হুঁশিয়ার মন নিয়ে খেয়াল করলেই দেখা যাবে জ্যোতিষী, গণক, বাবা, কিংবা গুরুরা যে-ভাষায় "বাণী" দেন, অতীত ভবিষ্যৎ বলে দেন, তাতে যথেষ্ট ধোঁয়াটে ভাব থাকে (ইংরিজিতে যাকে বলা যায় **vague**) ; একটি কথার একাধিক ব্যাখ্যা করা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। ফলে একই বক্তব্য বা 'বিচার'-এর ব্যাখ্যা বিশ্বাসী লোকে এক রকম অবিশ্বাসী লোকে অন্যরকম করতেই পারে। করাও হয় তাই। অর্থাৎ ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যাটা খুঁজে বের করা। সেইজন্যই মনে হয় জ্যোতিষ-ভরসার গোড়াটাই আসলে রীতিমতো নড়বড়ে।

আর আছে কাকতালীয় মিল বা আন্দাজে লেগে যাওয়া। যে কোন মানসিক, বৈষয়িক বা সামাজিক প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর (চুলচেরা নির্দিষ্ট উত্তর নয়) বেশ কয়েকটি দিলে তার কোন একটা মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে—এটা আমি, আপনি, যে-কোন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই করতে পারেন ; এর জন্য কোন বাড়তি 'শক্তি' বা 'ক্ষমতা' লাগে না, অমুকাচার্য তমুকার্ণবের নোটিশ ঝোলাতে হয় না। কোন একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে, আন্দাজে ক-টা উত্তর কতবার বললে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটা—এরকম বিষয় আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রের সম্ভাবনাতত্ত্বের (**Theory of Probability**) আলোকেই আলোচিত হতে পারে। দক্ষিণভারতীয় যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ডঃ আব্রাহাম কোভুরের বক্তব্য হলো—গণৎকারদের আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে উত্তর মিলিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা এক-শ'-তে ছয় ; একজন প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষী এবং একজন জ্যোতিষ-অজ্ঞ সাধারণ লোককে দিয়ে পরীক্ষা করলে উভয়ক্ষেত্রে একই ফল পাওয়া যাবে। কোভুরের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে কেউ তর্ক তুলতে পারেন। কতগুলি 'কেস' নিয়ে, কিভাবে, কতসংখ্যক পর্যবেক্ষণ তিনি চালিয়েছিলেন এই মুহূর্তে আমার জানা নেই, তবে এই জাতীয় সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যাতত্ত্বের বইতে।

তবু গণৎকারদের কেরামতি সবসময় সম্ভাবনাতত্ত্বের আলোকে চিনে নেওয়া সহজসাধ্য হয় না, কেননা জ্যোতিষী কিংবা গণকের উত্তর কতটা মিলছে বা আদৌ মিলছে কি-না সেটা জানাই তো বেজায় মুশকিল। সাধারণের মানসিকতাই হলো মিলে যাওয়া ঘটনাগুলি মনে রাখা আর অ-মিলগুলো ভুলে যাওয়া। তাই যখন একজন অতি আগ্রহে গল্প করে ঠিকুজী-হস্তরেখার অপার মহিমার কথা বলে তখন তার স্মৃতিতে সঞ্চিত মিলে-যাওয়া রোমাঞ্চকর খবরগুলিই ফুটে ওঠে।

ফলত আমরা এরকম বহু 'মিলে যাওয়া'র চমকপ্রদ উদাহরণ পেয়ে যাই, না-মেলা নিদর্শনগুলো হারিয়েই যায়। নিচে এরকম কিছু হারানো-প্রাপ্তির খবর দিচ্ছি, স্মরণ করার চেষ্টা করুন—

☐ সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও জ্যোতিষের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে স্বীকার না করলেও টুস্কানির ডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড-এর ঠিকুজী তিনি এঁকেছিলেন। তা থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল ডিউক দীর্ঘজীবী হবেন। অথচ ডিউকের মৃত্যু হয়েছিল এই ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েক সপ্তাহ পরেই।

☐ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ারকে দু-দু'জন গণক পণ্ডিত বলেছিলেন তার আয়ু ৩০-৩২ বছর। কিন্তু ভলতেয়ার বেঁচেছিলেন ৮৪ বছর।

☐ জ্যোতিষীর বিচারে হিটলারের ১৯৪০ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার কথা ছিল। ইতিহাস তা ভুল প্রমাণ করেছে।

☐ ১৫৫৫ সালে এক বিশ্বখ্যাত ইংরাজ গণক বলেছিলেন কিশোর রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড অনেকদিন বাঁচবেন, যদিও ৫৫ বছর বয়সের পর রোগে আক্রান্ত হবেন। কিং এডওয়ার্ড তার পরের বছর, মাত্র ১৬ বছর বয়সেই মারা যান।

☐ ১৯৭৯ সালের ৭ই অক্টোবর জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃত্যু হয়—৭৭ বছর বয়সে। অথচ পাটনার ভারত-বিখ্যাত জ্যোতিষী গণেশকান্ত ঝা সে-বছর ('৭৯ সাল) ৮ই এপ্রিল ঘোষণা করেছিলেন জয়প্রকাশ ৯৩ বছর পর্যন্ত বাঁচবেন।

☐ হালের খবর। গত ১৯৮১ জুলাই মাসে পেরুর গণৎকার স্যানটোস পারেডেস বলেছিলেন—বিশ্বকাপ ফুটবলে পেরু দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলবেই; তার ভবিষ্যবাণী না মিললে সে মাথা মুড়োবে। শেষ অবধি সর্বসমক্ষে স্যানটোসের মাথা কামানো হয়। (অথচ এই গণৎকারের অপর এক ভবিষ্যদ্বাণী—বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আরজেনটিনাকে হারাবে বেলজিয়াম—ঠিক ঠিক মিলেছিল।)

অনসূয়া মুখোপাধ্যায়

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

তাজমহলের রত্নরাজি

আয়জুমন্দবানু বেগম, পরবর্তী নাম মমতাজমহল। জন্ম ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে, বিবাহ হয় শাহজাহানের সঙ্গে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং চতুর্দশ সন্তানের জন্মের সময় ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পর তার সমাধিসৌধ নির্মাণ শুরু করেন শাহজাহান। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, প্রায় বাইশ বছরের অবিরাম শ্রমে ২২ হাজার শ্রমিকের সাহায্যে তাজমহল নির্মিত হয়। শ্বেত পাথরের তৈরি তাজমহলে ৪৬৬.৫৫ কিলোগ্রাম সোনা ব্যবহার করা হয়েছিল সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য। এছাড়া ফিরোজা (টারকুইজ), ঘোরী, হীরা, খট্টু (অ্যাগেট), লাজবর্দ, প্রবাল, মুক্তা, নীলা, জেড, পোখরাজ, রুবি, জেসশার, এমারেল্ড প্রভৃতি ২০ রকমের রত্ন দিয়ে শ্বেত পাথরের গায়ে ফুল-ফল-পাতা নির্মিত হয়েছিল। সমাধিসৌধটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছিল ২২ লক্ষ টাকা (অন্য মতে ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮ শত ২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পাই)।

এই সমাধিসৌধের উদ্বোধনকালে ভারতীয় জ্যোতিষবর্গ শাহজাহানকে বলেছিলেন যে এই সমাধিতে ব্যবহৃত রত্ন বা পাথরের এমনই গুণ যে তার প্রভাবে সম্রাট বা তার পুত্রগণের সমস্ত বিপত্তি কেটে গিয়ে তারা চিরসুখী হবেন, এমনকি যে একবার তাজমহল স্পর্শও করবে তার সমস্ত বিপদ কেটে যাবে।

পরবর্তীকালের ইতিহাস কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীকে বড় পরিহাস করেছে। শাহজাহান তার জীবদ্দশাতেই অসুস্থ অবস্থায় ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র আওরঙ্গজেবের হাতে আগ্রা দুর্গে বন্দী হন। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহকে আওরঙ্গজেব বন্দী ও হত্যা করে ; তারপর দারার ছিন্নমুণ্ড কাপড়ে ঢেকে পিতাকে উপহার পাঠায়। শাহজাহানের আর দুই পুত্রের মধ্যে মুরাদকেও হত্যা করা হয় এবং সুজা আরাকানে পালিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়। আট বছর অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট-গঞ্জনা-লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে বন্দীজীবন কাটিয়ে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহানের জীবনদীপ নিভে যায়।

সূত্র :

১. Studies in Mughal India—J. N. Sarkar ; Calcutta, 1919.
২. বিশ্বকোষ—সাক্ষরতা প্রকাশন, দ্বাদশ খণ্ড ; পৃঃ ২৫০-২৫৪।

সংগ্রহ : পারুল ভট্টাচার্য

কোষ্ঠী বিচার বনাম ডাক্তারি পরীক্ষা

বিপিনবাবু মস্তো বড় জ্যোতিষী। জম-জমাট পসার। বহুদূর থেকে মানুষ এসে ভিড় করে। বিরাট বাড়ি। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ আর একমাত্র ফুটফুটে নাতনী—এই নিয়েই তার সংসার। সুখের সংসারই বলা যায়, তবু বিপিনবাবু অসুখী। কারণটা অদ্ভুত—নাতির মুখ আর দেখা হলো না; যতই হোক নাতনী তো আর বংশরক্ষা করতে পারে না। তাই আফসোস—নাতি কেন হলো না! বংশটা শেষ হয়ে গেল!

বিপিনবাবু নিষ্ঠাবান ভদ্রলোক। ছেলের বিয়েতে কোনো রকম ফাঁক রাখেন-নি। কথায় বলে "হাজার কথা না হলে বিয়ে হয় না"। তাই ছেলের বিয়ে দেবার আগে যাবতীয় কথাবার্তা-খোঁজখবর করেছেন। কন্যাপক্ষের অন্তত চোদ্দ পুরুষের ইতিহাস নিয়েছেন। যথারীতি পাত্রীর চুল টানা, কাপড় সরিয়ে পা দেখা ইত্যাদি সবই করেছেন। এরপর দরদাম করে বিয়ে 'পাকা' করার আগে আরেকটি জরুরী কাজও করতে ভোলেন নি। তা হলো কোষ্ঠী বিচার। পাত্র-পাত্রীর রাশি-ছক নিয়ে বিচার করেছেন নিজের হাতে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে। একেবারে রাজযোটক। নিঃসন্দেহ হয়ে তবেই বিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এমন কেন হলো? এতদিন হয়ে গেল কই নাতির মুখ তো আর দেখতে পাচ্ছেন না! গত বছর যদিও সুদিন এলো তাও বেশিদিন থাকলো না। কয়েকদিনের মধ্যেই মারা গেল বাচ্চাটা! তার ওপর আবার প্রথমে নাতনী হবার সময় নাকি অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল; নার্সিং হোমে কি যেন একটা দামি ইনজেকশন দিয়ে বিপদ কাটানো গেছে। এসবের আভাস তো কোষ্ঠী বিচারের সময় তিনি পান নি! তবে কি তার গণনা ভুল? না, তার কোন সুযোগই নেই। বারবার গণনা করে তবেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যাই হোক, অনেক চেষ্টাই করেছেন বিপিনবাবু। অনেক তাবিজ-মাদুলি-কবচ পরানো হলো। সব রকম রত্ন-ধারণও হলো। মানত-মানসিক-হত্যে দেওয়া কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু কোন ফল নেই। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের হাতেই ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিতে হলো। ডাক্তারবাবু মা-বাবার পুরোন ইতিহাস, রক্ত

পরীক্ষার রিপোর্ট ইত্যাদি দেখে রায় দিলেন যে, ভবিষ্যতে সন্তানের সম্ভাবনা কম, কারণ বিপিনবাবুর ছেলে ও ছেলের বৌ-এর রক্ত ঠিকমত ম্যাচিং হচ্ছে না।

ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। এ-পর্যন্ত মানুষের রক্তে ১৪ রকমের রক্তগ্রুপ ব্যবস্থার (**Blood group system**) সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত দু-টির একটি হলো **ABO**, এবং অন্যটি **Rh** গ্রুপ-ব্যবস্থা। **ABO** ব্যবস্থা অনুযায়ী রক্তকে মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যাকে চলতি কথায় "গ্রুপ" বলা হয় ; যেমন—**A, B, O** এবং **AB** গ্রুপ। এবং **Rh**-ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রুপ দু-ধরনের হতে পারে—**Rh(+)**, আর **Rh(−)**। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, রক্ত অনেক রকম হতে পারে, যেমন : **A(+), A(−), O(+), O(−)** ইত্যাদি। এইসব গ্রুপ ও সংকেতগুলির প্রকৃত অর্থের বিস্তৃত ব্যাখ্যার দিকে না গিয়ে সরাসরি আমাদের মূল বক্তব্যে চলে আসা যাক।

এই চার শ্রেণীর রক্তের বন্ধন বা ম্যাচিং কিন্তু সবক্ষেত্রে একরকম নয়। অর্থাৎ যে-কোন রক্ত অন্য যে কোন শ্রেণীর রক্তের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। তালিকাটি লক্ষ্য করুন :

উপযুক্ত বিবাহ		অনুপযুক্ত বিবাহ	
পুরুষের রক্তের শ্রেণী বা গ্রুপ	মহিলার রক্তের শ্রেণী বা গ্রুপ	পুরুষের রক্তের শ্রেণী বা গ্রুপ	মহিলার রক্তের শ্রেণী বা গ্রুপ
A, B, O	A, B, O	A	O
A	AB	A	B
B	AB	B	O
O	A	B	A
O	B	AB	O
O	AB	AB	A
Rh[+]	Rh[+]	AB	B
Rh[−]	Rh[+]	Rh[+]	Rh[—]
Rh[−]	Rh[—]		

অবশ্যই **ABO** গ্রুপ ব্যবস্থার বিন্যাস অনুযায়ী বিবাহের যে ছকটি দেখানো হয়েছে তাতে বাস্তবক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু মুশকিল দেখা দেয়

Rh-এর ক্ষেত্রে এবং সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরকম যোটকে বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্টই থাকে—দুর্ঘটনা ঘটেও থাকে বাস্তবক্ষেত্রে। তাই বিয়ের আগে এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ; অন্তত বিয়ের পর সন্তান প্রসবের আগে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার সাহায্য না নিলে বাচ্চার মৃত্যু কিংবা অন্য কোন বিপর্যয় ঘটে যাওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, বে-ঠিক Rh ম্যাচিং-এর জন্য, দ্বিতীয় কিংবা তার পরবর্তী সন্তানগুলির ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

এখন, এই যে রক্তের গ্রুপের কথাগুলো বলা হলো তা নির্ভর করে বংশাণু বা 'জিন'-এর ওপর। 'জিন'-কে এককথায় বলা যায় বংশগতির ধারক। যে কোন ব্যক্তির শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে জিন-এর ওপর। বংশাণুবিদ্যাচর্চার প্রাথমিক পর্বে জিনসংক্রান্ত গবেষণাগুলি রক্তের গ্রুপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের এই শাখা ব্যাপক বিস্তার পেয়েছে, নতুন নতুন জ্ঞানের রাজ্য উন্মোচিত হয়ে চলেছে, প্রচলিত হয়েছে 'Genetic Counselling' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে বর, কনের পরীক্ষাভিত্তিক যোটক নির্ধারণের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমিক রোগগুলোকে ঠেকানো যায় বা মূলোচ্ছেদ করা যায়। অথবা যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে বিয়ে অপরিহার্য সেখানে এই জিনসংক্রান্ত পরামর্শ বা counselling-এর সাহায্যে সন্তানের জন্ম পরিহার করে বহু অসুস্থ ক্ষতিকারক সম্ভাবনাকে এড়ানো যায়, যেমন—বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া (এক ধরনের রক্তক্ষরণ রোগ), থ্যালাসিমিয়া, অ্যালবিনিজম ইত্যাদি বংশগত রোগ। অবশ্য সবসময়ই যে বাবা অথবা মা-এর মধ্যে উপরোক্ত রোগের লক্ষণ থাকবেই তার কোন কথা নেই ; উভয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতেও পারে—হয়ত তাদের জিন বা বংশাণুতে ওই রোগগুলির ধারা বাহিত হয়ে চলেছে। এরকম ক্ষেত্রে সন্তানের মধ্যে সে রোগ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব শুধুমাত্র বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীকে Genetic Counselling-এর আওতায় নিয়ে এসে। এই ডাক্তারি পদ্ধতির পরামর্শ অনুযায়ী বিবাহ হওয়া না হওয়া (বা সন্তান হওয়া না-হওয়া) সাব্যস্ত করা উচিত। অগ্রসর দেশগুলো অনেকদিন আগে থেকেই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছে ও ব্যবস্থা অবলম্বন করছে অথচ আমাদের দেশে এরকম বিজ্ঞানসম্মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও সম্পূর্ণভাবেই অবহেলিত থেকে যায়। এখানে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ফলে বিয়ে পাকা করার আগে ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর কথা কেউই ভাবতেও পারেন না বরং ঠিকুজি-কোষ্ঠী না দেখলে কেমন যেন অশান্তি থেকে যায় মনে।

বিপিনবাবু যদি এ-ব্যাপারটা একটু প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন তাহলে তাকে হয়ত আজ এমন আফসোস করতে হতো না। এখন নিশ্চয়ই তিনি দোটানায় পড়েছেন, নাতনীর বিয়েতে কোন্‌টা পরীক্ষা করাবেন—কোষ্ঠী না রক্ত—এ দ্বন্দ্বটা আমার-আপনার সকলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা উচিত নয় কি ?

সূত্র :

সায়েন্স রিপোর্টার, মার্চ ১৯৮২

শঙ্কর ঘটক

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

দুর্গাপূজার দুই তারিখ, দুই পঞ্জিকার দুই মত: শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিতর্ক

একটা কথা কখনই অস্বীকার করা চলে না যে, সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারায় পঞ্জিকার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে গেছে। আমাদের দেশে কি ডাক্তার, কি বিজ্ঞানী, কি সাহিত্যিক, কি রাজনীতিবিদ, কি ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌—সর্বস্তরের মানুষকেই কোন না কোন প্রয়োজনে পঞ্জিকার সাহায্য নিতে দেখা যায়। কিন্তু যেসব তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে পঞ্জিকা তৈরি হচ্ছে, তা কি নির্ভুল এবং শাস্ত্রসম্মত ? এই বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার দিন এসেছে।

পঞ্জিকার একেবারে গোড়ার কথা বলতে হলে বলতে হয় যে, আকাশে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক অবস্থান এবং চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে আগের কালের জ্যোতিষীরা আমাদের দেশে পঞ্জিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাই পঞ্জিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিচয়।

পঞ্জিকা নামটি এসেছে পঞ্চাঙ্গ থেকে। পঞ্চাঙ্গ মানে হলো এইসব পুস্তিকার পাঁচটি প্রধান অঙ্গ—বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগ।

পঞ্জিকাতে যে-সব তথ্য দেওয়া থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তিথি এবং তারপরেই নক্ষত্র ও যোগ। তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ গণনার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সূর্য ও চন্দ্রের দৈনন্দিন নির্ভুল অবস্থান বা স্ফুট (Longitude) গণনা করা। এই গণনাপদ্ধতি এমন হতে হবে, যাতে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির গণিত অবস্থানের সঙ্গে মহাকাশে তাদের প্রকৃত অবস্থানের সম্পূর্ণ ঐক্য বজায় থাকে। একেই বলা হয় দৃক্‌সিদ্ধ পদ্ধতি—তার মানেই হলো কাগজে-কলমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণিতের সাহায্যে কোনও জ্যোতিষ্কের যে অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে, আর দূরবীন দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করলে তার যে অবস্থান পাওয়া যায়, এই দুই অবস্থানের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য থাকবে না। যখন এই দুই অবস্থানে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়, তখন সেই গণনার পদ্ধতিকে বলা হয় অদৃক্‌সিদ্ধ পদ্ধতি অথবা সাধারণভাবে প্রাচীন-পদ্ধতি।

আমাদের দেশে বর্তমানে দু-রকম পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে—দৃক্‌সিদ্ধ এবং অদৃক্‌সিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচলিত পঞ্জিকা বলতে গেলে দু-টি—গুপ্তপ্রেস এবং পি এম বাগচী; এই দুই পঞ্জিকাই অদৃক্‌সিদ্ধ বা প্রাচীন-পন্থী। ভারত সরকারের "রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ"কে (বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পঞ্জিকা) বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত একমাত্র দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা হলো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত। এখন এই দু-রকম পঞ্জিকার মধ্যে কোন্‌টি বিজ্ঞানভিত্তিক তা ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অদৃকসিদ্ধ পঞ্জিকাকারেরা তাদের গণনার জন্যে "সূর্য-সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থখানির ওপর নির্ভর করেন। এই গ্রন্থখানি আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। যে প্রাচীন সময়ে সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল, তখন দূরবীনের আবিষ্কার হয় নি (দূরবীন এসেছে সপ্তদশ শতাব্দীতে), মানমন্দির বলে বিশেষ কিছু গড়ে ওঠে নি। সেই সময়কার জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানের ভিত্তিতে, কিছু গ্রহ-সারণী বা টেবল উল্লেখিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে—সেই সারণি অনুসারে আজও অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাকারেরা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান গণনা করে চলেছেন। এই সারণিগুলির আর কোনও সংস্কার সাধিত হয় নি। তাছাড়া সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে অয়নচলনের (precession of equinoxes) কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে অয়নচলনের আবিষ্কার মহাকাশে গ্রহগুলির অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার ব্যাপারে একটা বিরাট পদক্ষেপ।

তাই বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্তের সূত্রাবলী দিয়ে গ্রহ অবস্থান গণনা করলে তা আকাশের প্রকৃত গ্রহ অবস্থানের সঙ্গে আদৌ মিলতে পারে না, যথেষ্ট পার্থক্য হয়। প্রতি বৎসর এই পার্থক্য বেড়েই চলেছে, ফলে গুপ্তপ্রেস বা পি এম বাগচী পঞ্জিকায় যে তিথি-নক্ষত্রের সময় দেওয়া থাকে তাতে ৫-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে এবং গ্রহস্ফুটে (longitude) ১১ ডিগ্রী পর্যন্ত পার্থক্য নজরে পড়ছে। কিন্তু অশুদ্ধ পঞ্জিকাকারদেরও 'গ্রহণ' গণনার তথ্যাদির জন্য আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনার ওপর নির্ভর করতে হয়—তার কারণ গ্রহণ-গণনা পঞ্জিকাতে ভুল প্রকাশ হলে সাধারণ মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে ও নিজের ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে সহজেই অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার গলদটি ধরে ফেলবেন। পঞ্জিকা-গণনার ভুল এইভাবে যাতে সাধারণ লোকের কাছে ধরা না পড়ে, সেইজন্য প্রচলিত অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকাকাররা তাদের পঞ্জিকার অন্যান্য অংশ যথাপূর্ব সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী অশুদ্ধ গণনার তথ্য লিপিবদ্ধ করে, মাত্র গ্রহণ অংশটি আধুনিক অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিসগ্রন্থ থেকে নিয়ে পঞ্জিকার সম্মান বজায় রাখেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাদের পঞ্জিকার অন্যান্য অংশও শুদ্ধ বা দৃক্সিদ্ধ করতে বর্তমানে অসুবিধাটা কোথায়? ভারত সরকারের পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টারে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী দিয়ে যে গণনা করা হয়, সেই তথ্যাদি পেতে তো কোনও অসুবিধার কারণ সেই।

অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলার আছে। অশুদ্ধ পঞ্জিকাকাররা বর্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্বিকার। এদের মুখে একটি কথা খুব শুনতে পাওয়া যায়—"বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়"। এর মানে হলো তিথিবৃদ্ধি ৬৫ দণ্ডের অধিক হবে না, আর তিথিহ্রাস ৫৪ দণ্ডের কম হবে না। বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক গণনায় দেখা যায় যে তিথির সময়ের সীমা বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের সংজ্ঞা মেনে চলতে পারে না। অথচ ধর্মকর্ম লোপ পাবে, এই অজুহাতে এইসব অশুদ্ধবাদীরা বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের বিধি উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পূর্ণিমা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা; পূর্ণিমা তিথির সময় সারা পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে একরকমই হতে হবে, তার মধ্যে পার্থক্য থাকবে কেন? আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান গণনা করে পূর্ণিমা তিথির যে সময় কষা হবে, সেটা এদের গণনার সঙ্গে মিলবে না কেন? এই কথাটা কিন্তু অদৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকাকারদের কিছুতেই বোঝান যায় না। ২০০ ইঞ্চি দূরবীন বা রেডিও টেলিস্কোপ, বর্তমান পর্যবেক্ষণের নিখুঁত যন্ত্রের কথা যতই বলুন না কেন, এরা তাদের বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের স্থবির সংজ্ঞা

তিথিগণনার ব্যাপারে কখনই বর্জন করবেন না—তাহলে নাকি আমাদের ধর্মের সব শাস্ত্রীয় বিধান নষ্ট হয়ে যাবে।

এই হলো অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি। তাহলে দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার গণনা-পদ্ধতিই বা কেমন সে সম্বন্ধেও একটু বলি। সারা বিশ্বে মাত্র আটটি দেশ থেকে অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিস প্রকাশিত হয়ে থাকে—ভারত এদের অন্যতম। এই রকম পুস্তকে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী অনুযায়ী কমপিউটারের সাহায্যে গণনা করা হয়। সারা বিশ্বে যত মানমন্দির (**observatory**) আছে সেইসব মানমন্দির থেকে দূরবীন দিয়ে মহাশ পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতিষ্কদের গণিত-অবস্থান মিলিয়ে দেখা হয়। যদি কখন কোন গ্রহের ক্ষেত্রে, গণিত-অবস্থানের সঙ্গে নিরীক্ষিত (**observed**) অবস্থানের কোনও পার্থক্য দেখা যায়, তখন কেন এই পার্থক্য হলো সে সম্বন্ধে গবেষণা করা হয় এবং প্রয়োজনে প্রচলিত গণনার সূত্রাবলীর সংস্কার করা হয়। এর জন্য রয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা—ইনটারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের কাছে বিশ্বের যে-কোন মানমন্দির থেকে এই ব্যাপারে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলে সেটা জানান হয়। তখন প্রচলিত সূত্রাবলীর কতটুকু সংস্কার করতে হবে, তার নির্দেশ দিয়ে থাকে এই ইউনিয়ন। সর্বদা গণিত-অবস্থানের সঙ্গে নিরীক্ষিত বা যন্ত্রে মাপা অবস্থানের পার্থক্য লক্ষ্য করার এই ব্যবস্থা আছে বলেই গণনায় কোন ভুলের সম্ভাবনা কখনই থাকে না। তাছাড়া আটটি দেশের এফিমারিস সেণ্টার—যেখানে এইসব গণনার কাজ করা হয়, তার প্রত্যেক সেণ্টারেই একই সূত্রাবলীর সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব তথ্যাদি কমপিউটার যন্ত্রে গণিত হয়ে থাকে বলে এদের তথ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য বা ভ্রান্তি থাকে না। দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য এবং আরও নানারকম প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এইসব অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিস গ্রন্থ থেকে নিয়ে থাকেন। তাই এখন বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার তথ্যাদি সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক বলেই তা আমাদের গ্রহণযোগ্য।

১৯৮২-র দুর্গাপূজার তারিখ নিয়ে বেশ একটা বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল। ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিনটি দেখান হয়েছে ২৪শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু গুপ্তপ্রেস এবং পি এম বাগচী—উভয় পঞ্জিকাই এই দিনটি ঠেলে নিয়ে গেছেন ২৪শে অক্টোবরে। আবার প্রথমোক্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী কালীপূজার দিন ছিল ১৬ই অক্টোবর, সেখানে গুপ্তপ্রেস

এবং পি এম বাগচী পঞ্জিকা দিনটিকে পিছিয়ে দিয়েছেন ১৪ই নভেম্বরে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুর্গাপূজা এবং কালীপূজার মতো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পূজা-পার্বনের দিনগুলির হিসাবের তফাত হয়ে যাচ্ছে দুই পঞ্জিকা অনুযায়ী—এক মাসের। কি বিভ্রান্তিকর অবস্থা! কিন্তু এমনটি কেন হলো তা বিশ্লেষণ করে দেখাও প্রয়োজন।

ওই বছর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত একটা ব্যাপার ঘটেছে, সেটা হলো, 'ক্ষয়মাস' —আর এই ক্ষয়মাস সংঘটনের জন্যই দু-রকম পঞ্জিকায় এত মতানৈক্য। কিন্তু ক্ষয়মাস ব্যাপারটা কি? ক্ষয়মাসের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপার অবিচ্ছিন্ন থাকে, সেটা হলো 'মলমাস'। এই মলমাসই বা কাকে বলে? ভারতের বৈদিক হিন্দুরা সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কেই কালনির্দেশকরূপে গণ্য করেছিলেন—বৎসর গণনায় সূর্য এবং মাস গণনায় চন্দ্র। সৌরবৎসর মানেই হলো ঋতুনিষ্ঠ বৎসর, এর গড় মান হলো প্রায় ৩৬৫ দিন। কিন্তু হিন্দুর অধিকাংশ পূজাপার্বনের তারিখ স্থির করা হয় চান্দ্রমাসের তিথি অনুসারে। এক অমাবস্যা থেকে পরবর্তী অমাবস্যা কাল পর্যন্ত সময়কে এক চান্দ্রমাস বলে—একটি চান্দ্রমাসের গড় মান হলো ২৯.৫৩ দিন এবং একটি চান্দ্রবছরের গড় মান হলো প্রায় ৩৫৪ দিন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সৌরবছরের চেয়ে চান্দ্রবছর গড়ে ১১ দিন কম। এর ফলে একটা মস্ত বড় অসুবিধা দেখা গেল। শাস্ত্রকারগণ বিধান দিয়েছেন যে, পূজাপার্বনগুলি বিশেষ বিশেষ ঋতুতে অনুষ্ঠিত হতে হবে, যেমন শারদীয়া পূজা অনুষ্ঠিত হতে হবে শরৎকালে, বাসন্তী পূজা বসন্তকালে। কিন্তু সৌরবছরের চেয়ে চান্দ্রবছর ১১ দিন কম হওয়ার দরুন ক্রমাগত একটা সরণ হয়ে চলেছে—এবারে কোন এক ঋতুতে যে-পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বেশ কিছু বছর পর সেই একই পূজা সে-ঋতুর বাইরে অনুষ্ঠিত হবে। এই বিপর্যয় রোধ করার জন্যে, হিন্দু জ্যোতির্বিদরা সৌরবছরের সঙ্গে চান্দ্র বছরের খাপ খাওয়ানোর কথা ভাবলেন এবং মলমাস গণনার পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। ১১ দিন করে চান্দ্রমাসগুলি এগোতে এগোতে এক মাসের অধিক হয়ে গেলেই একটি মলমাস গণনা করে চান্দ্রপঞ্জীকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। সাধারণত মলমাস ২ বা ৩ বৎসর পর এসে থাকে। এখন এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে—চান্দ্রমাসের নাম কিভাবে দেওয়া হয়? যে সৌরমাসে চান্দ্রমাসের প্রথম অমাবস্যা পড়ে, চান্দ্রমাসের নামও সেই সৌরমাসের নামানুসারে হয়। একটি সৌরমাসের মধ্যে যদি দু-টি অমাবস্যা পড়ে যায়, তাহলে একই নামের দু-টি চান্দ্রমাস পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথম চান্দ্রমাসকে মলমাস এবং দ্বিতীয় চান্দ্রমাসকে শুদ্ধমাস বলা হয়। আবার কখন কখন এমন ঘটে যখন একটি সৌরমাসের মধ্যে কোন অমাবস্যাই পড়লো না—তার মানে হলো ঐ

সৌরমাসের নাম অনুসারে চান্দ্রমাসটি পাওয়া গেল না অর্থাৎ ক্ষয় হয়ে গেল। এইরকম চান্দ্রমাসকে ক্ষয়মাস বলা হয়। যে-বছর ক্ষয়মাস ঘটবে সে-বছর দুইটি মলমাস ঘটবেই—একটি ক্ষয়মাসের আগে এবং অন্যটি ক্ষয়মাসের পরে। ক্ষয়মাস সাধারণত অনেক বৎসর পর পর সংঘটিত হয়ে থাকে। ১৯ বৎসর থেকে ১৪১ বৎসর অন্তর অন্তর একটি ক্ষয়মাস পাওয়া যায়।

ভারত সরকারের পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টারে এই বছরের সৌরমাস ও চান্দ্রমাসের সময়ের সূক্ষ্ম গণনা করে দেখা গেছে যে, ওই বছর মাঘ হলো ক্ষয়মাস এবং তার আগে আশ্বিন মলমাস, পরে ফাল্গুন আর একটি মলমাস। এই গণনা বিজ্ঞানভিত্তিক, তাই নির্ভুল। এখন পূজাপার্বনের দিন স্থির করার ব্যাপারে আমাদের প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারদের মতের ওপর নির্ভর করতে হয়। শাস্ত্রকাররা এ-বিষয়ে একমত যে, একটি বছরে দুইটি মলমাস থাকলে মাত্র একটি মলমাসকেই মলমাসরূপে বিবেচনা করে, সে-মাসের পূজাপার্বনাদি পরের মাসে করতে হবে। আমাদের শাস্ত্র অনুযায়ী মলমাসে পূজাপার্বন, শুভকর্ম একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন্ মাসটিকে মলমাস বলে গ্রহণ করব? প্রথমটা মলমাস না পরেরটা মলমাস? এটা নিয়েই পণ্ডিতদের মধ্যে যত বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই প্রশ্নই হলো দু-রকম পদ্ধতির পঞ্জিকার মধ্যে বিভ্রাট ও মতানৈক্যের গোড়ার কথা।

সরকারের ভূমিকা

১৯৮২ সালের ছুটির দিন কিভাবে ঘোষিত হবে এই নিয়ে ১৯৮২-র নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভার একটা বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। বেশ কিছু আলাপ-আলোচনার পরে মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার মত উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, প্রফেসর সাহা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাকেই বিজ্ঞানসম্মত বলে অভিমত দিয়েছিলেন; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ গুপ্তপ্রেস মেনে চলেন বলে শেষ পর্যন্ত ঐ মন্ত্রিসভায় ঠিক হয় যে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুযায়ীই পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপূজার ছুটির দিন ঘোষণা করবেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই সিদ্ধান্ত থেকে এইটাই প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ নাগরিক (অর্থাৎ ভোটদাতা) যা পছন্দ করেন 'জনপ্রিয়' গণতান্ত্রিক সরকার তাকে অন্ধভাবে সম্মান দেবেন, জনগণের মানসিকতা পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় যাবেন না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, বামফ্রন্ট সরকারের মতো প্রগতিশীল সরকারেরও প্রগতিবাদী দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে অনীহা বা অসামর্থ্য রয়েছে। এরাও

অশুদ্ধ মতের কাছেই নতি স্বীকার করছেন। অবশ্য পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সংশোধনী সারকুলার দিয়েছিলেন—ইচ্ছুক সরকারি কর্মীরা সেপ্টেম্বরে পূজার ছুটি গ্রহণ করতে পারেন অক্টোবরের বদলে। এজন্য কিছু ধন্যবাদ সরকারের অবশ্যই প্রাপ্য।

এবারে বলি কেন্দ্রীয় সরকারের কথা। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮১ সালের শেষের দিকে ১৯৮২ সালের ছুটির দিনগুলি ঘোষণা করেন এবং এই ব্যাপারে তারা পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টার থেকে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিসে যে বিজয়াদশমী ও দেওয়ালীর তারিখ দেখান হয়েছে সেই তারিখ অনুযায়ীই ছুটির দিন ঘোষণা করেন—অর্থাৎ ২৭শে সেপ্টেম্বরে দশহরা এবং ১৬ই অক্টোবরে দেওয়ালী। এই ঘটনায় সারা ভারতে অদৃক্‌সিদ্ধ ও অশুদ্ধ পঞ্জিকাকাররা দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন—এত বড় কথা! দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা অনুযায়ী সরকার ছুটির দিন ঘোষণা করছেন? (তাহলে তো তাদের পঞ্জিকা আর বাজারে চলবে না!) এদের দল-নেতা হয়ে এগিয়ে এলেন দিল্লীর ডক্টর গোস্বামী গিরধারীলাল। এই গোস্বামীজী কখনো দিল্লীর বিড়লামন্দিরের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। সারা ভারতের যত অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাকার রয়েছেন তারা গোস্বামীজীকে মদত দিতে লাগলেন নানারকমভাবে। প্রচুর অর্থব্যয়ে বিভিন্ন পোস্টার ছাপান হলো, পুস্তিকা ছাপান হলো এবং দিল্লীর চারদিকে এইসব পোস্টার মেরে ও পুস্তিকা বিতরণ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া হলো। বোঝানো হলো যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ছুটির দিন ঘোষণার ব্যাপারে হিন্দুধর্মের ওপর কুঠারঘাত করেছেন। গোস্বামীজী ধরলেন বড় বড় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকসভার সদস্যদের। লোকসভায় প্রশ্ন তোলা হলো—কেন সরকার দশহরা ও দেওয়ালী ছুটির দিনের পরিবর্তন করবেন না? দু'দু-বার লোকসভায় সরকার পক্ষ উত্তর দিলেন যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টার যে তারিখ স্থির করেছেন সেটা বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও শাস্ত্র অনুসারে স্থির করা হয়েছে, তাই সরকার এর পরিবর্তে অন্য তারিখে ছুটির দিন ঘোষণা করবেন না। কিন্তু আমরা যতই বিজ্ঞানের কথা বলি না কেন, যতই কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট স্থাপনের কথা চিন্তা করি না কেন, প্রচলিত একটা অশুদ্ধ গণনা যেটাকে বহুদিন ধরে দেশের সাধারণ মানুষ অন্ধের মতো মেনে চলে আসছে, সেই অন্ধ-সংস্কারের গায়ে এতটুকু আঁচড় দেওয়ার ব্যাপারেও কত সমস্যা। অতএব শেষ পর্যন্ত গোস্বামীজী ও তার দল কেন্দ্রীয় সরকারের দশহরা ও দেওয়ালীর ছুটির দিন পরিবর্তনের ব্যাপারে এক অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করে

ফেললেন—সে-বছর (১৯৮২) সেপ্টেম্বর, যখন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুর্গাপূজার আর মাত্র ১৫ দিন বাকি তখন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দশহরার ছুটির তারিখ ২৭শে অক্টোবর এবং দেওয়ালীর ছুটির তারিখ ১৫ই নভেম্বর ঘোষণা করলেন। এই হলো কায়েমী ব্যবস্থার চরিত্র। মুখে আমরা যতই আধুনিকতা এবং প্রগতিবাদের বুলি আওড়াই না কেন, প্রচলিত অশুদ্ধ সংস্কার যা ব্যাপক মানুষকে বিরাট ভ্রান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখছে তার বিরুদ্ধে এক পা-ও অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা আমাদের দেশের কোন সরকারের নেই—সাধারণ সচেতন মানুষের কিন্তু এইটাই মনে হবে।

[১৯৮২ সালে দুর্গাপূজার তারিখ ছিল দুটো—'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত' মতে ২৪শে সেপ্টেম্বর আর 'গুপ্ত প্রেস' মতে ২৪শে অক্টোবর।]

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

সরকারি পঞ্জিকা ।। তিথি-নক্ষত্র শুভ-অশুভ পূজা-পার্বন ।।
অন্ধ-বিশ্বাস বনাম বৈজ্ঞানিক প্রগতি ।।

রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ—একটি বিশ্লেষণ

ব্যাবিলনে, ভারতে, গ্রীসে সেই প্রাচীন কাল থেকেই গণিত-জ্যোতিষচর্চার সমান্তরালেই চলেছিল ফলিত-জ্যোতিষের চর্চা। সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, এমনকি রাহু ও কেতুর (যে দুটো কেবলমাত্র চাঁদের কক্ষপথ ও ক্রান্তিবৃত্তের ছেদবিন্দু—গ্রহ নয়) ওপর ব্যক্তিত্ব বা কারকতা আরোপ করে মানুষের জীবনে তাদের প্রভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা—এহেন pseudo-science বা ভ্রান্তবিজ্ঞানের চর্চাও চলতে থাকে পাশাপাশি। ফলিত-জ্যোতিষের শুভাশুভ বিচারের পথ ধরে এসেছে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, পূজা-পাঠ ইত্যাদি, গড়ে উঠেছে লৌকিক ধর্মাচরণের শাস্ত্রবচন।

এইভাবে গণিত-জ্যোতিষ আর ফলিত-জ্যোতিষের মোড়কে লৌকিক বারব্রত, একাদশী উপবাস, শুভ-অশুভ মুহূর্ত—ইত্যাদির ডালা সাজিয়ে সাজিয়ে সর্বসাধারণের জন্য পঞ্জিকার সৃষ্টি হয়েছে।

পঞ্জিকার ভালো নাম পঞ্চাঙ্গ। **তিথি, নক্ষত্র, বার, করণ, যোগ**—এই পাঁচটি অঙ্গ। এখানে যেমন গ্রহণ গণনাও দেওয়া আছে, যাত্রারম্ভের মন-গড়া শুভকালও দেওয়া আছে। যুক্তি আর অন্ধ-ভক্তির সমন্বয়।

আসুন দেখি, একটু বিশ্লেষণ করি। পঞ্চাঙ্গের প্রথম দুটো অঙ্গের উদ্ভব মূলত গণিত-জ্যোতিষ থেকে, কিন্তু কালক্রমে এরা ফলিত-জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রের কুক্ষিগত হয়েছে। পৃথিবীর বর্তমান উন্নত গণিত-জ্যোতিষচর্চায় তিথি-নক্ষত্রের মোটা হিসেবের প্রাচীন পদ্ধতি আর কোন কাজে লাগে না। বারের প্রচলন হয় আনুমানিক ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নিতান্ত প্রশাসনিক প্রয়োজনে। কালগণনার মোটা হিসেব করার জন্য এটি এখন আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে থাকি। করণকে বলা হয় তিথির অর্ধেক। যোগ হলো সূর্য ও চন্দ্রস্ফুটের (longitude) যোগফল। দুটোরই উদ্ভব শুভাশুভ কালনির্ণয়ের জন্য—ফলিত-জ্যোতিষের সুবিধার্থে।

তিথি নক্ষত্র এলো কিভাবে? রাতের আকাশে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চাঁদের কলার হ্রাসবৃদ্ধি সহজেই প্রাচীন আকাশ-পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যে-সব প্রাকৃতিক ঘটনা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বারবার ঘটছে সেই ঘটনাটিকে কাল নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রাচীন ব্যাবিলনে ও ভারতে এইভাবেই প্রথমে দিন গোণা হয়েছিল। দুটো পরপর অমাবস্যার (বা পূর্ণিমার) মধ্যবর্তী সময়টা প্রায় ২৯½ সৌরদিনের সমান। এই সময়টাকে ৩০ ভাগে ভাগ করে এক একটাকে তিথি বা চান্দ্রদিন বলা হয়েছে। তিথি, সূর্য ও চাঁদের পারস্পরিক অবস্থানকেও মোটামুটি নির্দেশ করছে, কারণ সূর্য থেকে চাঁদটা কত দূরে রয়েছে, তারই ওপর নির্ভর করছে চাঁদের আলোকিত অংশের পরিমাণ—অর্থাৎ চন্দ্রকলা। সূর্য ও চাঁদের স্ফুট-পার্থক্য ২২ ডিগ্রী হলে প্রতিপদ তিথি শেষ হলো—যখন ১৮০ ডিগ্রী হলো তখন পূর্ণিমা তিথি ইত্যাদি। পৃথিবী ও চাঁদের ধীর ও দ্রুতলয়ে চলার জন্য তিথিমান বদলায়। এই তিথিমানের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে প্রাচীন ও নবীন পণ্ডিতে বিস্তর লড়াই আছে। সূর্যসিদ্ধান্ত ও কাশীর পণ্ডিতেরা একদিকে আর বর্তমান জ্যোতির্গণিত অন্যদিকে। তিথিমান নিয়ে প্রাচীন 'বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়' আর 'সপ্তবৃদ্ধিদশক্ষয়ের' খেয়োখেয়িতে বিজ্ঞানের কোন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় না। তিথি নিয়ে দিন-মাপার

পন্থা এখন বিলুপ্ত ডোডো পাখির মতো ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তু। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে সময়ের পরিমাপ করা হয় আণবিক ঘড়ির সাহায্যে —তিথির মোটা দাগের হিসেবে পৃথিবীর গতিটা যে ক্রমশ কমছে, আর দিনের মানটা যে একটু একটু করে বাড়ছে এতসব সূক্ষ্ম পরিমাপ করা যায় না। তাই তিথি-তথ্য এখন ফেলে আসা একটি মাইলস্টোন—জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস-পথে।

সূর্যের রাশি-সংক্রমণ থেকে সৌরমাস ধরা হয়। সৌরমাস আর চান্দ্রমাস (দুই অমাবস্যার মধ্যবর্তী কাল) মাপে অবশ্যই এক নয়। সৌরবৎসরের চেয়ে চান্দ্রবৎসর ১১ দিন কম। ঋতুর সঙ্গে সম্পর্ক সৌরবৎসরের। হিন্দুদের কতকগুলো ধর্মকৃত্য হওয়া চাই নির্দিষ্ট ঋতুতে; কিন্তু উৎসবাদির তারিখ গণনা হয় চান্দ্রতিথি অনুযায়ী। সুতরাং হিন্দু পঞ্জিকা সৌর-বৎসর ও চান্দ্র-বৎসর কোনটাকেই ফেলতে পারে না। অতএব চান্দ্রমাসের সঙ্গে ঋতুর গরমিল যাতে বাড়তে না পারে, সেইজন্য ৩২ থেকে ৩৩ সৌরমাসে (অর্থাৎ ২/৩ বছর অন্তর) একটি অতিরিক্ত চান্দ্রমাসকে মলমাস বলে বাদ দেওয়া হয়। মলমাসে হিন্দুর পূজাপার্বন নিষিদ্ধ। এই মলমাস নির্ণয়েও শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই লাগে মাঝে মাঝে। জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত, রাজমার্তণ্ড, বার্হস্পত্যজ্যোতির্গ্রন্থ, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যকৃত মলমাসতত্ত্ব—ইত্যাদি নানা মুনির নানা গ্রন্থে নানা মত। ১৮৮৫ শকাব্দে (১৯৬৩-৬৪ খ্রী) যে মলমাস-ক্ষয়মাসের যুদ্ধ লেগেছিল তাতে স্মার্ত রঘুনন্দনকৃত শ্লোকাদি গ্রাহ্য করা হয় নি। ১৯৮২-র পঞ্জিকায় দেখছি সেগুলো গ্রাহ্য করা হয়েছে। মতটা রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ পালটালেন কেন বুঝলাম না। কিন্তু শেষরক্ষা তো হলো না! ব্যাপারটা সবই কোন মাসকে মলমাস ধরে বাদ দিয়ে, কোন মাসকে শুদ্ধমাস ধরলে অক্ষয়পুণ্য হবে—এই চিন্তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। আবার এর ওপরে, আমাদের দেশে তিনটি প্রধান পদ্ধতি অনুসারে পঞ্জিকা তৈরি হয়—সূর্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত আর আর্যসিদ্ধান্ত। কেউ গণনাপদ্ধতিতে কারুর চেয়ে কম নয়! অথচ—মলমাস যে কিভাবে নির্ধারিত হবে তার সোজাসুজি কোন নিয়মকানুন নেই—অতএব মতানৈক্য অবধারিত। এখন রাশি ও নক্ষত্রের কথায় আসা যাক। আকাশে তারাদের প্রেক্ষাপটে সূর্য ও চাঁদের সঞ্চারপথকে চিহ্নিত করবার জন্যে রাশি ও নক্ষত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল প্রাচীন জ্যোতিষে। রাশিচক্র মানে আকাশের নক্ষত্রস্তবকখচিত একটি কটিবন্ধ—১৮ ডিগ্রী প্রশস্ত। এটিকে ভাগ করা হয়েছে ১২টি রাশিতে—১২টি সৌরমাসের সঙ্গে মিল রেখে। প্রতি রাশির উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি নিয়ে প্রাচীন

জ্যোতিষীরা এক-একটা আকৃতি কল্পনা করে সেই আকৃতির নামে রাশিগুলোর নামকরণ করেছেন মেষ, বৃষ ইত্যাদি। বলাবাহুল্য তখনকার দিনের কল্পিত আকৃতিগুলো এখন অনেক বদলে গেছে তারাদের অবিরাম নিজস্ব গতির জন্যে।

বেদাঙ্গজ্যোতিষযুগে এই নক্ষত্রচক্রের আদিবিন্দু ধরা হয় কৃত্তিকায়, পরে সিদ্ধান্তজ্যোতিষযুগে এই আদিবিন্দু ধরা হয় অশ্বিনী নক্ষত্রে। সম্ভবত গ্রীক জ্যোতিষের প্রভাবে এই অদল-বদল। বেদাঙ্গজ্যোতিসযুগের সায়নগণনাপদ্ধতিও পরিত্যক্ত হয়ে নিরয়ন গণনাপদ্ধতির প্রচলন হয় এইসময়। ফলিত-জ্যোতিষ এবং তার ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ নিরয়ন গণনাপদ্ধতির মতে মেষরাশির শুরু অশ্বিনী নক্ষত্রে। কিন্তু তা তো নয়। সায়ন (অয়নগতিসম্পন্ন) মেষরাশির প্রথমাংশ (১৯ ডিগ্রী) এখন নিরয়ন মীনরাশিতে এবং শেষাংশ (১১ ডিগ্রী) নিরয়ন মেষরাশিতে। অর্থাৎ আকাশে মেষরাশিকে যদি প্রথম রাশি ধরি তবে তার মুখটা এখন উত্তর-ভাদ্রপাদ নক্ষত্রে—অশ্বিনী নক্ষত্রে নয়।

সায়ন-নিরয়ন কথাগুলো গোলমেলে। একটু কাটাছেঁড়া করি, তবেই বোঝা যাবে নিরয়ন গণনাপদ্ধতিটা যুক্তিনির্ভর নয়—ফলিত-জ্যোতিষের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই এটার প্রবর্তন।

আকাশ-বিষুব বৃত্ত (Celestial Equator) আর আকাশে সূর্যের প্রতীয়মান সঞ্চারপথ মানে ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic)—এই দুয়ের ছেদবিন্দু দুটি হলো মহাবিষুববিন্দু আর শারদবিষুববিন্দু। প্রথমটিকে ধরা হয় স্ফুট গণনার মূলবিন্দু; 'মেষরাশির আদিবিন্দু' বলে এই মূলবিন্দুটিকে বলা হয়, কারণ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০ দশকে এই ছেদবিন্দুটি মেষরাশির আদিবিন্দু অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রেই ছিল। পৃথিবীর অয়নগতির ফলে মহাবিষুববিন্দু স্থির নয়—চলমান। সূর্যপ্রদক্ষিণরত অবস্থায় আমাদের ক্রন্দসী পৃথিবী লাট্টুর মতো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরছে, ফলে পৃথিবীর ভূমেরু শূন্যে এক বিশাল বৃত্ত রচনা করে চলেছে ছাব্বিশ হাজার বছর ধরে। নিউটনের মহাকর্ষবাদতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত অঙ্ক করে এগুলো প্রমাণিত হয়েছে। মনগড়া কথা নয়। আজ পৃথিবীর উত্তর দিক নির্দেশ করছে ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা সেখানে চিরধ্রুব হয়ে থাকবে না। এরপর পৃথিবীর উত্তর শিয়রে আসবে শিবি (Cepheus), ছায়াগ্নি (α-Cygni), অভিজিৎ (Vega)। আবার ছাব্বিশ হাজার বছর পরে আসবে ধ্রুব। পৃথিবীর ভূমেরু দুলছে—অতএব দুলছে বিষুব-বৃত্তও। ফলে ঐ যে ছেদবিন্দুটি, সে-ও চলছে ক্রান্তিবৃত্ত ধরে পশ্চিমদিকে বছরে ৫০.২৪ সেকেণ্ড পরিমাণ প্রায়; ছাব্বিশ হাজার বছর পরে ঠিক আগের জায়গায় ফিরবে। একে অয়নচলন (precession of equinoxes) বলে। এই

অয়নচলনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেই বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা দেশবাসীকে বলেছিলেন যে, বৈশাখ মাসে যেটাকে মহাবিষুব-সংক্রান্তির দিন বলে মনে করা হচ্ছে সেটা আদৌ সে-দিন নয়—দিনটা এগিয়ে গেছে চৈত্র মাসে। এটা যুক্তিসঙ্গত কথা। এখন, মূলবিন্দুর অয়নচলনের ফলে গ্রহ-তারার স্ফুট বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত—এটা সহজেই অনুমেয়। এই মহাবিষুববিন্দু বা মূলবিন্দুর প্রকৃত অবস্থিতি থেকেই জ্যোতিষ্কদের প্রকৃত অবস্থিতি পরিমাপ করা বিধেয়। বর্তমানে সারা পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞান সায়ন (অয়নগতিযুক্ত) স্ফুট নিয়েই কারবার করে। কিন্তু নিরয়ন গণনাপদ্ধতি (অয়নগতিবর্জিত) ছাড়া তো ফলিত জ্যোতিষের চলে না—লৌকিক ধর্মাচরণও হয় না। নিরয়ন নক্ষত্রসঞ্চার, রাশিসঞ্চার এইসব দিয়েই লৌকিক ধর্মের অচলায়তন তৈরি, সেটা ভাঙ্গা দুষ্কর। আবার মেষরাশি ও অশ্বিনী-নক্ষত্র অভিন্ন ধরে (যা সত্যি নয়) ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের নানা শ্লোক তৈরি করা হয়েছে বরাহমিহিরের কাল থেকে—সেগুলোও বদলানো দুষ্কর, সুতরাং সরকার প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ সায়ন-গণনা ও নিরয়ন-গণনার মধ্যে একটা আপোষ-রফা করল—একটা সাঁকো ফেলে দিয়ে। সাঁকোটার নাম অয়নাংশ। অয়নাংশ হচ্ছে সায়ন মেষরাশি ও নিরয়ন মেষরাশির পার্থক্য, বা হিন্দু নিরয়ন রাশিচক্রে আদিবিন্দু ও প্রকৃত মহাবিষুববিন্দুর পার্থক্য। একই কথা। এখন সাঁকোটা বাঁধতে হলে দুটো জিনিস চাই—প্রথমত জানা চাই সুদূর অতীতে কবে নিরয়ন ও সায়ন রাশিচক্র অভিন্ন ছিল অর্থাৎ 'শূন্য অয়নাংশ বর্ষ'-টা কবে? দ্বিতীয়ত মহাবিষুববিন্দুর পশ্চিমে এগোবার গতিবেগটা বছরে কত? দ্বিতীয়টা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ভালোভাবেই অঙ্ক কষে এবং পর্যক্ষেণ করে দিয়েছে…কিন্তু প্রথমটা তো জানা নেই! সূর্যসিদ্ধান্তের মতে এটি ছিল ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রহ্মগুপ্তের মতে ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে, ভাস্করাচার্যের মতে ৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে, বরাহমিহিরের মতে ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এরা সকলেই সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষযুগের বাঘা বাঘা দিকপাল। কারুরটাই ফেল্না নয়। এমনি করে ভারতীয় জ্যোতিষগ্রন্থগুলো খুঁজলে ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনেকগুলো শূন্য অয়নাংশ বৎসরের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তদসম্পর্কিত অয়নাংশের মান পাওয়া যায় ২৭ রকমের—১৯ ডিগ্রী থেকে শুরু করে ২৪ ডিগ্রী পর্যন্ত। এত রকমফেরের কারণ বোধহয় তৎকালীন গণনাপদ্ধতির বিভিন্নতা এবং সঠিক পর্যবেক্ষণের অপ্রতুলতা ও অসম্পূর্ণতা। অতীতকালে আকাশ পর্যবেক্ষণের নির্ভুল তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং কে বলে দেবে কোন্ অয়নাংশটা সত্যিই যুক্তিনির্ভর? ফলিতজ্যোতিষে বহুরকম অয়নাংশের ব্যবহার আছে।

সুতরাং সরকার প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ বেশ বুদ্ধিমানের মতো বরাহমিহির নির্দেশিত ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দকেই শূন্য অয়নাংশ বৎসর বলে মেনে নিল। এতে ফলিত-জ্যোতিষের এক বড় সমর্থক দল, যাদের বলা হয় 'চিত্রাপক্ষ', তারা সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু পাল্টা 'রেবতীপক্ষ' এই শূন্য অয়নাংশ বর্ষের বিরুদ্ধে। রেবতীপক্ষের প্রবক্তা সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষযুগের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট। তিনি বললেন, ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিষুববিন্দু ছিল রেবতীতে।—তাহলে কার কথা মেনে নেওয়া ঠিক? পর্যবেক্ষণের নথিপত্র কোথায়?

এতসব লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত শুনে পাঠকদের নিশ্চয়ই দমবন্ধ হয়ে যাবার দশা, কারণ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান যখন পর্যবেক্ষণ আর গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বের নানা রহস্যের উন্মোচন করছে তখন আমরা পূজা-পাঠ কোন্ তিথিতে হবে তাই নিয়ে টানাটানি করে চলছি আর ফলিতজ্যোতিষকে সরকারি সহায়তায় পুষ্ট করছি, শক্তি ও অর্থের কি অপচয়!

রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গে কি নেই ভাবতে অবাক লাগে—জন্মনক্ষত্র অনুসারে গণ ও দশা, তারাশুদ্ধি-চন্দ্রশুদ্ধি, নিরয়ন গ্রহস্ফুট, নিরয়ন নক্ষত্র ও রাশিসঞ্চার, অষ্টোত্তরী-বিংশোত্তরী দশা, লগ্নারম্ভকাল—অর্থাৎ "বিজ্ঞানসম্মতভাবে" গণকঠাকুররা যাতে জন্ম-ঠিকুজি করতে পারেন তার নিপুণ ব্যবস্থা। "বিজ্ঞানসম্মতভাবে" ধর্ম-কর্ম করাও শেখানো হয়েছে—শুভ-অশুভ কাল, বিপণ্যারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ভূত চতুর্দশীতে চৌদ্দশাক ভক্ষণ—সবকিছু দেওয়া আছে এতে। বিজ্ঞানচর্চার (??) বাকি নেই কিছু! এসব দেখে বড় দুঃখে প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাটির দুটি পংক্তি মনে পড়ে যায়—

হিন্দু না আমি মুসলিম ভাবি
খুঁজি টিকি-দাড়ি নাড়ি কাছা—

আজীবন হিন্দু-মুসলমানের মিলনপ্রয়াসী কবির এই পরিহাস-উজ্জ্বল খেদোক্তির মানে বুঝি। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না, রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ কেন একই সঙ্গে ধর্মাচরণ আর ফলিতজ্যোতিষের টিকি-দাড়ি আর ধর্মের কাছাটাকে নেড়ে চলেছেন। এটাতে কি দেশের লোকের বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়বে?

পূরবা রায়

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

গ্রহরত্ন, বিজ্ঞান ও শিক্ষিত সমাজ

কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুকে দেখলাম, হাতে পরেছেন তামাটে রঙ-এর একটা বড় চ্যাপ্টা বালা জাতীয় জিনিস। আজকাল এ-কিছু নতুনত্ব নয়। কত লোকেই কত কিছু কত কারণেই অঙ্গে ধারণ করছে। আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ওটি আবার কি?' উনি বল্লেন—"আমার পিঠে একটা ব্যথা ছিল জান তো; তা অমুক বললো, একটা তামার বালা পরে দেখ, দেখবে ব্যথা কমে যাবে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তা ব্যথা কমেছে?" বন্ধু বল্লেন—"মনে হয় আগের চেয়ে একটু ভালো আছি।" আমি বল্লাম—"তুমিও তাহলে এসবে বিশ্বাস কর?" বন্ধু বল্লেন—"বিশ্বাস আর কি! অমুক বল্লো, পরে ফেল্লাম। কিছু হলে ভালো, না হলেও ক্ষতি তো কিছু নেই।"

যে-বন্ধুর কথা বলছি তিনি বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করেছিলেন এবং সারাজীবন তাঁর বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকৃত দক্ষতা ও কুশলতার সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতম দায়িত্বসম্পন্ন পদ অধিকার করে এখন অবসর গ্রহণের মুখে এসেছেন। যে-হিতৈষী বন্ধুটির কথায় তিনি তামার বালাটি পরেছিলেন, তিনিও এঞ্জিনিয়ার—কলকাতার অন্যতম বৃহত্তম বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের মধ্যে একজন।...খুব সম্প্রতি এক প্রসিদ্ধ উচ্চশিক্ষিত পরিবারের একজন ভদ্রমহিলার মুখে শুনলাম, তিনি বয়সকালে কোন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে দুম্ করে কালীঘাটের কালী না হয় অন্য কোন এক দেবীর কাছে কিছু মানত করে বসেছিলেন, তারপর পরীক্ষা পাশ হওয়ার পর খুব বিবেক-সংকটে পড়লেন। মানত করাটা কুসংস্কার, এ-ধরনের কুসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য গ্লানি অনুভব করলেন; অপরদিকে দেবীকে মানত করা সুতরাং কাজটা না করেও শান্তি পাচ্ছেন না।

এই দু-টি ঘটনার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, আধুনিক ভারতীয় সমাজে জ্যোতিষ, গ্রহরত্ন, তাগা-তাবিজ, পূজা, মানত, ধরণা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষিত মানুষের যে-মনোভাবের কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই, তা ঐ ঘটনাগুলির মধ্যে খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে। প্রথম কাহিনীর ভদ্রলোক মোটেই এসব তুক-তাকের ক্ষমতায় প্রচণ্ডভাবে আস্থাশীল নন। তার মনোভাব

তার কথাতেই প্রকাশ পায়, 'কিছু হলে ভালো, না হলেও ক্ষতি তো কিছু নেই!' দ্বিতীয় কাহিনীর ভদ্রমহিলার যদি সত্যি মানত করায় বিশ্বাস থাকতো তো পরে দ্বিধার সংকটে পড়তেন না। আমাদের দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষ, দেশবাসীর মধ্যে যারা সংখ্যায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ, তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাদের মনের ওপর যুক্তিভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার কোন প্রভাবই কোনদিন পড়ে নি, যারা জীবনের প্রতি পদে কিছু সংস্কারের দ্বারা চালিত হন, ঐ সংস্কারগুলির পিছনে কোন যুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত করার কোন প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করেন না; সংস্কারগুলিকে তারা অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকেন, শত অসুবিধা সত্ত্বেও কোন আপোষ করেন না। যত কুসংস্কারাচ্ছন্নই হোক, এ জাতীয় ব্যক্তিদের চরিত্রে একজাতীয় দার্ঢ্য বা দৃঢ়তা আছে। জীবন সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এদের ধারণাবলী আগাগোড়া ভ্রান্ত হলেও কিন্তু চরিত্রবলের অভাব এদের মধ্যে নেই। আমি যাদের কথা আলোচনা করছি, অর্থাৎ আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসী, তাদের মধ্যে ঐ চারিত্রিক দার্ঢ্য নেই, কুসংস্কারে যেমন তাদের আস্থা বা বিশ্বাস নেই, তেমনি বিজ্ঞানেও নেই। জীবন, সমাজ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে এদের ধারণা, বহুল পরিমাণেই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, আর একই কালে ঐ একই মনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবত্তার সঙ্গে কুসংস্কার সহাবস্থান করে। এই সম্পূর্ণ বিপরীত মনোবৃত্তিগুলির সংঘাতহীন সহাবস্থানকে আমরা আধুনিক ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের এক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি।

'ঠিক হতেও পারে, নাও পারে, করলে ক্ষতি কি?'—এই যে মনোভাব, তাকে বিশ্লেষণ করলে কি কি উপাদান আমরা পাব? এক, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার অভাব। চিন্তার আলস্য। যুক্তির শিথিলতা। কোনভাবেই কোন প্রকারেই অনুসৃত কর্ম এবং আকাঙ্ক্ষিত ফল—এই দুয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় না, তথাপি তাদের মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক ধরে নেওয়া। রত্ন ধারণ করলেই যদি ঈপ্সিত ফল পাওয়া যেতো, মানত করলেই যদি প্রার্থিত পুরস্কার মিলত তাহলে সংসারে মানুষের অপ্রাপ্তিজনিত খেদ খুবই কম থাকত। হস্তরেখা বা রাশি-গণনা করে ভবিষ্যৎ জানা যদি সম্ভব হতো, তো কাউকেই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা শোকগ্রস্ত হতে হতো না—বরং ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে জীবন থেকে দুঃখকে নির্বাসিত করে তাকে সমৃদ্ধ ও সুখবহ করে তোলা যেতো। তা যে যায় না, সেটা সকলেরই জানা। তা জানতে বৈজ্ঞানিক হতে হয় না। কিন্তু জানা সত্ত্বেও যে এই প্রকারের উপায় অবলম্বন

করা হয়ে থাকে, তাতে আর একটি মানসিকতা প্রকাশ পায় তা হলো এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাপ্রকার চক্রান্ত রয়েছে ব্যক্তিমানুষের জীবনকে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার জন্য, সে চক্রান্তগুলি বিজ্ঞানের আয়ত্তের অতীত। কিন্তু তারা একই সঙ্গে এতই সস্তা যে, সামান্য পরিশ্রম ও সামান্য অর্থব্যয়েই ঐ চক্রান্তদের ব্যর্থ করে দেওয়া যায়। কখনও পাঁচ টাকা, কখনও কুড়ি টাকা, কখনও পাঁচশো টাকা, খুব বেশি হলে কয়েক হাজার টাকা—এই হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গূঢ়-গুপ্ত নিয়মাবলীর মূল্য। যে টাকা দিয়ে একটা চলনসই শার্টও কেনা যায় না, সেটুকু টাকা দিয়েই সম্ভব হয় 'ফেল'কে করে দেওয়া পাশ, মৃত্যুমুখীকে পুনর্জীবিত, ভগ্ন-বিবাহকে পুনর্নির্মিত। তৃতীয় যে-মনোবৃত্তির প্রকাশ এর মধ্যে দেখি তা হলো নির্জলা লোভ ও সুবিধাবাদিতা। বাস্তব জগতের নিয়ম অনুসারে কোন কাম্য বস্তু বা অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে চেষ্টা বা পরিশ্রম ও অনুশীলন করতে হয়। যেমন, পরীক্ষা পাস করতে হলে পড়তে হয় (অথবা টুকতে হয়)। চাকরিতে উন্নতি করতে হলে ভালোভাবে কাজ করতে হয় (অথবা ওপরওয়ালাকে তেল দিতে হয়)। সংসারে শান্তি বজায় রাখতে হলে স্ত্রীকে স্বামীর কথা মেনে চলতে হয়, শাশুড়ীর চোখের সামনে ভিজে বিড়ালটি হয়ে থাকতে হয়। এসব জাগতিক মূল্যগুলি দেবো না, অথচ পরীক্ষায় ভালো ফল করবো, চাকরিতে উন্নতি করবো, শান্তিতে সংসার করবো—এই কাঁঠালের আমসত্ত্বের প্রতি লোভ, তুকতাকের আশ্রয় নেওয়ার পিছনে একটি কার্যকরী শক্তি। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ আছে ভারতীয় মধ্যবিত্ত মনে।

এই কুসংস্কারের সঙ্গে আপোষের ঘটনাটা কতটা সাধারণ? কতটা তার ব্যাপ্তি? আবারও মনে করিয়ে দিই, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের কথা বলছি না, বলছি সমাজের শিক্ষিতমহলের কথা। এই মহলের ব্যাপ্তি, আমার মনে হয়, শতকরা শত ভাগই। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে এই আদিম যাদুবিদ্যায় আস্থা নেই এমন ব্যতিক্রম সত্যিই বিরল। সব ক-টা কুসংস্কারে সকলেই বিশ্বাস করে তা অবশ্যই বলছি না। আমার যে-বন্ধুর কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তিনি হাতে বালা পরেন বটে, কিন্তু যাত্রার সময় নির্ধারণ করতে পঞ্জিকা ঘাঁটেন না। অনেকেই অনেক কিছু মানেন না, আবার অনেক কিছু মানেনও। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা তো প্রকাশ্যেই গণৎকার ও বিভিন্ন ধরনের গুরুদের আশীর্বচন নিয়ে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রের নেতারা রাষ্ট্রীয় প্রকল্পগুলিকে যাত্রাপথে চালিত করার উপলক্ষে

যাগযজ্ঞ হোম প্রভৃতি করে থাকেন। প্রকল্পগুলির যে হাল, বিদ্যুতেরই হোক, পরিবহনেরই হোক, আর শিল্প উৎপাদনেরই হোক, তা থেকে তো এইসব ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর বিশেষ আস্থা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ফল দিয়ে বিচার করা তো বিজ্ঞানমনস্কতারই পরিচায়ক। সুতরাং ফলনিরপেক্ষভাবেই এইসব ক্রিয়াকাণ্ডে আস্থা বজায় আছে।

রাজনীতিবিদদের কথা, রাষ্ট্রনেতাদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মহলেও যুক্তির ওপর এই অনাস্থা, প্রাকৃতিক শক্তির চেয়ে অলৌকিক শক্তির ওপর অধিকতর আস্থা, অন্য কোন সম্প্রদায়ের চেয়ে কিছু পরিমাণে কম নেই। অনেক ডাক্‌সাইটে প্রখর মেধাসম্পন্ন প্রতিভাধর ব্যক্তির কথা জানা যায়, যারা সাঁইবাবা বা অন্য কোন বাবা বা মায়ের চরণতলে তাদের সমস্ত বুদ্ধি-বিবেককে অঞ্জলি দিয়ে বসে আছেন। কমল মজুমদারের মতো উৎকট রকমের আধুনিক একজন লেখক যে তার অনেক দুর্বোধ্য লেখা শুরু করতেন 'গোবিন্দায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করে তা বোধহয় নিতান্তই মস্করা নয়! তার চেয়েও বড় অপরাধ—জ্ঞাতসারে ইচ্ছাকৃতভাবে বৈজ্ঞানিক মনকে কাঁচকলা দেখিয়ে ঐতিহ্যের নামে কুসংস্কারকে গৌরবমণ্ডিত করে দেখানো। একজন উৎকট রকমের আধুনিক চিত্রশিল্পী বেশ কিছুদিন যাবৎ তার চিত্রকলার মাধ্যমে তন্ত্রের প্রচার করেছেন, যে তন্ত্রের অনুশীলন তিনি নাকি করেছিলেন খোদ পারী শহরে বসে। এই দুই ব্যক্তির চেয়েও উদাহরণ হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, আধুনিকতা তথা মার্কসবাদের ধারক হিসেবে এই প্রতিভাধর সাহিত্যিককে কিংবদন্তীতে পরিণত করা হয়েছে। কয়েকবৎসর পূর্বে প্রকাশিত তার শেষ জীবনের ডায়েরী থেকে জানা যায় যে, সুরাসক্তির বন্ধন-দশা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি মায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ঐ ডায়েরীর ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে 'মা মাগো' এই কাতর আবেদন।

অনেকে আছেন যারা মনে করেন আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যাটা হলো এদেশের লোক কতটা বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বাস করে, আর কতটাই বা তাদের মার্কসবাদের আওতায় আনা গিয়েছে। এই সমস্যাটা যে কতটা ফাঁকা ও ফাঁপা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাহরণটা তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো 'দেবযানে' বিশ্বাস করতেন, তিনি আমাদের কাছে কোন সমস্যা নন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক, পরিণত বয়সে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এরা তো কবি-সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা পেশায় বৈজ্ঞানিক, তাদের চেহারাটা কি রকম? খুব আলাদা নয়। এদের আচরণের মধ্যে আমাদের সমাজের আত্মিক সংকট যেভাবে প্রকাশিত—সেভাবে আর কোন কিছুর মধ্যেই নয়। আমাদের বিজ্ঞানীদের মনটা স্পষ্টতই দুই ভাগে বিভক্ত। তারা যখন তাদের গবেষণাগারে কাজ করেন তখন 'একটা' মন নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু বাদবাকি সময় 'অন্য একটা' মন তাদের আচরণকে চালিত করে, যে মনটা আপামর জনসাধারণের আদিম সংস্কার-আশ্রয়ী মনের থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। পূজা-পার্বন বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে, যে-সব আদিম বিজ্ঞানবিরোধী ভাবধারা স্তরে স্তরে সাজান, সেসব তো তারা প্রকারান্তরে মেনে নেনই, উপরন্তু অনেকেই ভাগ্যের অন্বেষণে জ্যোতিষের আশ্রয় নেন, গ্রহরত্ন ধারণ করেন, পরলোকগত আত্মার সঙ্গে প্লানচেট মারফত কথাবার্তাও বলেন।

বিজ্ঞানের আছে একটি বিশ্বদর্শন। প্রকৃতি একটি নিয়মের রাজত্ব। অনুসন্ধান করলে প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায় এমন কিছু কিছু নিয়ম যা অমোঘ এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। কোন ব্যক্তির পক্ষেই কোন উপায়েই সেই নিয়মগুলির এদিক ওদিক করা সম্ভব নয়। এই নিয়মের রাজত্বে আস্থা বৈজ্ঞানিক বিশ্বদর্শনের মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। এই বিশ্বদর্শনের অধীনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীর কয়েকটা মূলসূত্র। প্রথমটি হলো এই যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান-অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে কোন বিষয়ের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে প্রকল্পের (hypothesis) আকার দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার যথার্থতা যাচাই করা। যথার্থতা বিচার করতে যে এক্সপেরিমেণ্ট বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, তাতে কিছু নিয়ম যত্ন ও নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ করতে হয়। যথা, দু-টি অবস্থার মধ্যে তুলনা করতে গেলে, অন্য সব অবস্থাকে যত দূর সম্ভব একপ্রকার রাখা (যে শর্ত অনুসৃত হলে পরীক্ষাকে বলা হয়, controlled experiment); প্রকৃতির থেকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু বস্তুর নির্বাচনে random sampling-এর পদ্ধতি গ্রহণ করা, ইত্যাদি। যতদিন পর্যন্ত কোন একটি বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা প্রভূত পরিমাণ সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত না হচ্ছে, ততদিন সেই প্রস্তাবনাকে প্রকল্পের অধিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না, সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আমাদের দেশের অনেক বৈজ্ঞানিক তাদের পেশাগত চর্চার ক্ষেত্রে এই বিশ্বদর্শনে আস্থাশীল এবং বিশেষ সূত্রগুলিরও সবকটিকেই তারা মেনে চলেন। কিন্তু তাদের চর্চার বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে সম্পূর্ণ বিপরীত এক বিশ্বদর্শন দ্বারা তারা চালিত হন। এই দ্বিতীয় দর্শন অনুসারে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা—যেমন পূজা-আর্চা, যাগযজ্ঞ,

যোগসাধনা, তাগা-তাবিজ, গ্রহরত্ন প্রভৃতির দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিদের ইচ্ছানুসারে ব্যাহত করা যায়। এই বিশ্বদর্শন অনুযায়ী জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান-অর্জন করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই, সিদ্ধান্ত ও প্রকল্পের ভেদ মনে রাখার দরকার নেই, অতিপ্রাকৃত উপায়ে মহাপুরুষ ব্যক্তিরা নাকি অনেক কিছুই জানতে পারেন যা বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে।

ঘটনা এই যে, আমাদের দেশে অনেক স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছে, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচলন হয়েছে, অগণিত সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞানে পারদর্শিতার খেতাব নিয়ে বার হচ্ছে, অনেকে বিদেশে গিয়ে উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতর কুশলতা অর্জন করে ফিরে আসছে ; কিন্তু যে ভাবজগতে তারা বাস করে, সেই ভাবজগতে কোন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবই সংঘটিত হয় নি, যেমন বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ইয়োরোপে রেনেসাঁসের যুগে।

ইয়োরোপ আমেরিকার লোকদের মধ্যে যে কুসংস্কারের অস্তিত্ব নেই, তা মোটেও নয়। সেদেশেও মেলায় তাঁবু খাটিয়ে জিপ্‌সী মেয়েরা হস্তরেখা বিচার করতে বসে, কৌতূহলী প্রমোদকারীরা জেনে নেয়, তাদের প্রেমিকের সঙ্গে মিলন হবে কি হবে না ; বিদেহী আত্মাদের সঙ্গে কথোপকথন করা জাতীয় ক্রিয়াকলাপও অনেক মহলে জনপ্রিয়। কিন্তু সেদেশে বিজ্ঞান ও কুসংস্কার একই মনে সহাবস্থান করে না। কুসংস্কার পিছু হটেছে, বিজ্ঞান তার জমি দখল করে নিচ্ছে, কুসংস্কারে আস্থাশীল ব্যক্তিরা উত্তরোত্তর সংখ্যায় নগণ্য হয়ে উঠছে।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা যে কি রকমভাবে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারে তার একটা বিশেষ উদাহরণ নেওয়া যাক। আমি কিছু অত্যন্ত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে জানি, যারা গণিতশাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায় পারঙ্গম, তারা নিষ্ঠাসহকারে জ্যোতিষ-চর্চা করেন। এদের কাছে কিছু বলতে গেলে, তারা বোধহয় বলবেন,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছুই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত, এই কথা তো আধুনিক বিজ্ঞানেরই একটি মূলসূত্র, সুতরাং মানুষের জীবন গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে না কেন ? তাদের এই যুক্তিকে মেনে নিয়েও একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, যে-প্রশ্নটা তাদের নিজেদেরই করা উচিত ছিল। দূর-দূরান্তরের কোন গ্রহের অবস্থান এবং কোন একটি ব্যক্তিবিশেষের জীবনে পাশ-ফেল করা, চাকরি পাওয়া, অসুস্থ হওয়া, বিয়ে হওয়া প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে যদি কোন যোগসূত্র থাকেও তো তা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান যা গত কয়েক শতব্দীতে বিপুল পরিমাণ সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তাদের দ্বারা একালে আবিষ্কৃত হলো না, হলো গিয়ে সুদূর প্রাচীনকালে, যখন বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতির উন্মেষই ঘটে নি ; আর যদি বা তা হলো এতদিনেও বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সেসব প্রতিষ্ঠিত হলো না—ঘটনাটি কি আশ্চর্য নয় ?

ধরা যাক গ্রহের অবস্থান ব্যক্তিমানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু সে-অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান কি, সেই প্রাচীনকাল থেকে অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে ? বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞান কি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ওঠে নি ? এই অগ্রগতির কোন প্রভাবই যে জ্যোতিষশাস্ত্রে পড়ে নি সেটা কি খুব অদ্ভুত নয় ? আধুনিক গণিতের তুলনায় জ্যোতিষীদের দ্বারা ব্যবহৃত গণনা কি একেবারেই আদিমস্তরের নয় ? এই অতি সাধারণ প্রশ্নগুলি জাগে না যে বৈজ্ঞানিকের মনে তিনি কি রকমের বৈজ্ঞানিক ?

কিছুই কি করার নেই ? এই ব্যাপক কুসংস্কারের প্রভাব যা বৈজ্ঞানিকদেরও অনেককে গ্রাস করে রেখেছে—তার প্রতিবিধানের জন্য কিছুই কি করার নেই ? আছে। 'উৎস মানুষ'-এ প্রবন্ধ লেখা বা 'উৎস মানুষ'-এ প্রবন্ধ পড়ার অধিক করার অনেক কিছুই আছে। চিন্তার ও আচরণের জগতে পরিবর্তন আনার জন্য শুধু উৎকৃষ্ট বা সঠিক চিন্তার প্রচারই যথেষ্ট নয়, আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। কি জাতীয় আন্দোলন করা যেতে পারে, তার সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কিছু ধারণা দিচ্ছি। আন্দোলন করা যেতে পারে এমন আইন প্রণয়নের জন্য, যে-আইনের প্রয়োগে গ্রহরত্ন-তাগাতাবিজধারী ব্যক্তিদের সরকারি চাকরি থেকে পদচ্যুত করা যাবে। (অবশ্য এরকম আইন প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কেন না অধিকাংশ মন্ত্রীরাই—এমন কি বামফ্রন্ট সরকারেরও, আগাপাশতলা এইসব কুসংস্কারে আবৃত।) যে-সব রাজনৈতিক পার্টিরা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে দাবি করে, তাদের সভ্যরা আন্দোলন করতে পারে, এই প্রকার কুসংস্কারে আস্থাশীল ব্যক্তিদের সদস্যপদ না দেওয়ার জন্য। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে যে-আন্দোলন তা করতে পারে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা। এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুঁজলে নিশ্চয়ই এমন অনেককে পাওয়া যাবে, যারা এখনো সজীব মনের অধিকারী। তারা এই বলে আন্দোলন করতে পারে যে, অধ্যাপকদের মধ্যে যারা এইসব কুসংস্কার মেনে চলেন তাদের বিজ্ঞানের ক্লাশ নেওয়ার কোন অধিকার নেই। আন্দোলন হতে পারে ক্লাশ বয়কট করে এবং যত উপায়ে সম্ভব সেইসব অধ্যাপকদের লজ্জা দিয়ে নির্যাতন করে। এই প্রকার আন্দোলন করলে বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা বাধ্য হবেন দুটোর একটাকে বেছে নিতে—বিজ্ঞান বা কুসংস্কার। ঐ দুয়ের মধ্যে গোঁজামিল দিয়ে জীবনধারণ করার ব্যভিচার থেকে তাদের জোর করে নিরস্ত করা যেতে পারবে।

শ্রী রুদ্রের এই রচনাটিকে কেন্দ্র করে কিছু বিতর্ক উঠেছিল, পাঠকের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল 'উৎস মানুষ'-এর পাতায়। সে চিঠি এখানে প্রকাশ করা হলো না। স. ম.

অশোক রুদ্র

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

আশ্বাস বিশ্বাস নিরাময়

ক-বাবু ধাতুর বালা ধারণ করে বাতে উপকার পেয়েছেন, খ-বাবু গোমেদের আংটি পরার পরই স্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় প্রণয় স্থাপন করতে পেরেছেন, গ-বাবু ভালো জ্যোতিষীকে দিয়ে রতি পাল্টানোর পরই তার দীর্ঘকালের ক্লান্তি-অবসাদের দুরারোগ্য ব্যাধিটা সেরে গেছে।…এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে কমবেশি। গ্রহরত্নের শারীরিক প্রভাবকে বিজ্ঞান স্বীকার না করলেও মানসিক প্রভাব তো থাকতেই পারে। আর শরীর ও মনের সম্পর্ক তো যথেষ্ট নিবিড়। হঠাৎ মনের জোর পেয়ে আধমরা লোক চাঙ্গা হয়ে উঠেছে—এ ঘটনা তো বিরল নয়। কাজেই মনস্তত্ত্বের দিকটা যত ধোঁয়াটে থাকে, রত্নধারণে অসুখ সারার প্রচারকাহিনীগুলি তত রহস্যময় হয়ে ওঠে ; অন্যদিকে আবার শরীর-মনের বৈজ্ঞানিক সম্পর্কটা সম্যক জানা না থাকলে, অল্পবিদ্যা থেকে অবাঞ্ছিত 'বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি'ও জন্ম নেয়। সেই অল্প-আলোচিত বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি মূলত পাভলভীয় মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত। স. ম.

বৃষ্টি কেন পড়ে? কিভাবে বিদ্যুৎ চমকায়? জোয়ার-ভাটা কেন হয়? জন্মরহস্য কি?—এইরকম আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে থেকেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল, কারণ বের করা যায় নি তখন। এরকম অনেক ঘটনা এখনও ঘটছে। যতদিন পর্যন্ত কোন ঘটনা ঘটার কারণ আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন পর্যন্ত ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক রহস্য অনেক অতিজাগতিক তত্ত্ব বা গল্পগাথা গড়ে ওঠার অবকাশ থাকে। অনেকে সেটা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান যে, ঐ রহস্য কোনদিনই উদ্‌ঘাটিত হবার নয় ; সুতরাং অলৌকিক-অতিজাগতিক দর্শনের অবতারণা অবধারিতভাবে এসে যায়। আজকের দুনিয়ায় এই অলৌকিকতায় বিশ্বাসী এবং প্রচারকদের বক্তব্য বা ভবিষ্যৎ কথনের অমোঘতাকে দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব—কারণ বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং তৎপ্রসূত গতিময় বাস্তবতা একের পর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে যাচ্ছে এবং এমন এক বৈজ্ঞানিক ধারা সৃষ্টি করেছে যে-ধারা রহস্যোদ্‌ঘাটনের অনিবার্যতাকেই সূচিত করেছে। তবে এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখা দরকার যে—কোন ঘটনার কারণ

আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত, তাকে বাস্তব ঘটনা হিসেবেই পক্ষপাতহীন চোখে দেখতে হবে, আলৌকিকতা প্রশ্রয় পাওয়ার আশঙ্কায় ঘটনার বাস্তবতাকেই অস্বীকার করা একই রকম অবৈজ্ঞানিক ধারণার পরিচায়ক।

রোগ, তা সে শারীরিক বা মানসিক যাই-হোক না কেন, প্রকৃত চিকিৎসায় তার বেশিরভাগই সারে—এটা আজকে প্রায় তর্কাতীত সত্য। প্রকৃত চিকিৎসা বলতে ওষুধ, অস্ত্রোপচার, উপযুক্ত পরিবেশ, উপযুক্ত পথ্য, বিশ্রাম, ব্যায়াম ইত্যাদি বেশিরভাগ মানুষ বোঝেন। কিন্তু বিশ্বাস বা আশ্বাস, তা সে নিজের প্রতি বিশ্বাস বা নিজের প্রতি নিজেরই দেওয়া আশ্বাস হোক বা অপরের পরামর্শ বা আশ্বাসই হোক—রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এই আশ্বাস-বিশ্বাস-পরামর্শ-নির্দেশ ইত্যাদির যে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, তা আজ বহুপরীক্ষালব্ধ নিরাময়ের বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মানুষ, বিশ্বাসে রোগ সারার ঘটনাকে রহস্যাবৃত অলৌকিকত্বের পর্যায়ে ফেলে রেখেছেন। আবার অনেক বৈজ্ঞানিক-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষও আজকে তথ্য ও জ্ঞানের অভাবে বিশ্বাসে রোগ নিরাময়ের ঘটনাকে সত্য হিসাবে স্বীকৃতি দিতেই দ্বিধাগ্রস্ত। আমি পরবর্তী আলোচনার সময় নিজেকে দেওয়া আশ্বাস বা পরামর্শকে Auto-suggestion বা স্ব-অভিভাবন এবং অন্যের (চিকিৎসকদের) দেওয়া আশ্বাস বা নির্দেশকে Suggestion বা অভিভাবন বলব। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে দুটো উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। 'আমি ভালো হয়ে উঠব' এই কথাটা তো নিজেকে দেওয়া একটা নির্দেশ; আবার 'তুমি ভালো হয়ে উঠবেই'—এটা অন্যের দেওয়া নির্দেশ। দু-ক্ষেত্রেই ফল লাভের অভিজ্ঞতা বোধহয় অধিকাংশ পাঠকেরই আছে। এই স্ব-অভিভাবন ও অভিভাবনের ফলাফলের কার্য-কারণ সম্পর্কীয় আলোচনা মনোবিজ্ঞানের একটি বিষয়। কিন্তু স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়, তাই প্রাথমিক জ্ঞানের ইঙ্গিত হিসাবেই এই প্রবন্ধকে বিচার করতে পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ করছি।

তুকতাক, জড়িবুটি, জলপড়া, মন্ত্রতন্ত্র, মাদুলি, পাথর ইত্যাদির প্রচলন আমাদের দেশে এখনও ব্যাপক এবং অনেকের দাবি "এগুলোতে কাজ হয়"। দ্রব্যগুণ বা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় না গিয়ে, আমি সরাসরি তাদের দেওয়া অভয় এবং তাদের প্রতি বিশ্বাসকেই আলোচনার বিষয়বস্তু করছি।

গ্রীস, মিশর, চীন, ভারত—সব পুরনো সভ্যতার আদি পর্বে ধর্মীয় ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্মোহন প্রয়োগের প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চারের শতকে গ্রীসে সম্মোহন-চিকিৎসাবিধি চালু ছিল। অথর্ববেদে সম্মোহনের বিশেষ

উল্লেখ আছে। গ্রীস দেশে উনিশ শতকের কিছু প্রস্তরে খোদিত লিখন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা থেকে মনে হয়, আরও অনেক প্রাচীনকালে চিকিৎসাক্ষেত্রে সম্মোহনের প্রয়োগ ছিল। এসব লিখন বা লিপিতে আছে দূরারোগ্য ব্যাধিমুক্তির সংবাদ এবং ব্যাধিমুক্তির জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। খ্রীষ্টপূর্ব চারের শতকে এস্কুলিপিয়াসের যুগে চিকিৎসায় যে অভিভাবনের (Suggestion) প্রচলন ছিল, এ-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। এখন, এই সম্মোহন এবং অভিভাবন সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলার আগে মস্তিষ্ক-সম্বন্ধীয় কিছু ন্যূনতম তথ্য দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

মস্তিষ্ক বা Brain-কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। ১. Cerebrum, ২. Cerebelum, ৩. Pons, ৪. Medulla oblongata। এদের মধ্যে আবার নির্দিষ্ট গঠন এবং কাজ অনুযায়ী অনেক বিভাগ আছে। Brain stem মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে Spinal cord (সুষুম্না কাণ্ড) হিসাবে বেরিয়ে অসংখ্য Sensory ও Motor নার্ভ বা স্নায়ু মারফত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। মাথার খুলি থেকে সরাসরি কিছু ফাঁকফোকর দিয়ে ১২টি Cranial স্নায়ু মুখ, চোখ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করছে। Nervous System বা স্নায়ুতন্ত্রকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—১. Central Nervous System (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র), ২. Autonomic Nervous System (স্বশাসিত স্নায়ুতন্ত্র)। এই সমস্ত স্নায়ুব্যবস্থার নিয়ন্তাই হলো মস্তিষ্ক—মূলত সেরিব্রাম। এই সেরিব্রামেরই (Cerebrum) বাইরের দিকের আবরণকে বলা হয় Cerebral Cortex বা গুরুমস্তিষ্ক। মানুষের সেরিব্রাল কর্টেক্স ২·৫ মিলিমিটার পুরু এবং দেড় হাজার কোটি কোষ দিয়ে গঠিত (যাদের ব্যাস ০·০০৫ থেকে ·০৫ মিলিমিটার)। কোষগুলির আকৃতি পৃথক এবং কাজকর্মের দায়দায়িত্ব পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট। আজকের মস্তিষ্কবিজ্ঞান যথেষ্ট জোরের সঙ্গে এটা বলতে পারে যে, সবরকম মানসিক কর্মকাণ্ড সেরিব্রাল কর্টেক্স বা গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের ওপর সুনির্দিষ্টভাবে নির্ভরশীল বা কেন্দ্রগুলির সাথে সম্পর্কিত। যাই হোক না কেন, এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি কিন্তু শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট বিন্দু নয়। এগুলো গুরুমস্তিষ্কের (Cerebral Cortex) বিভিন্ন অংশের এক জটিল আন্তঃসম্পর্ক। এই কেন্দ্রগুলিই বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের মনের ঘাত-প্রতিঘাতকে নিয়ন্ত্রন করে, তার সংকেত-বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনুসারে। "মৌলিক শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস, পুষ্টি, রক্তসঞ্চালন, দেহের তাপমাত্রা ইত্যাদি যদিও

এই কর্টেক্সের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাহলেও মূলত এগুলির নিয়ন্তা হলো Subcortical ganglion এবং Brain stem-এ অবস্থিত কিছু নির্দিষ্ট স্নায়ুকেন্দ্র।"

মস্তিষ্ক এবং নার্ভতন্ত্রের বা স্নায়ুতন্ত্রের কাজকর্ম মূলত তিনটি নীতির (Principle) ওপর দাঁড়িয়ে আছে—উত্তেজনা (Excitation), নিস্তেজনা, (Inhibition) ও গতিময়তা ; প্রসঙ্গত মস্তিষ্কের আর একটি বিশেষ ধর্মের কথা বলে নিই। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষের নার্ভতন্ত্রও শর্তহীন পরাবর্ত (Unconditioned reflex) এবং শর্তাধীন পরাবর্ত (Conditioned reflex) —এই দুই প্রক্রিয়ায় চলে। বাইরের জগতের কোন উত্তেজনা (যথা শব্দ, গন্ধ, আলো, খাদ্য, দুর্ঘটনা, মারামারি ইত্যাদি) নার্ভতন্ত্র বেয়ে চেতনা সঞ্চালক হিসাবে কাজ করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে Motor impulse হিসাবে আর-একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া (Action বা Reaction) ঘটায়। এই হলো মোটা দাগে Reflex বা পরাবর্ত। শর্তহীন পরাবর্ত হলো—খাবার মুখে পড়লে তবে লাল ঝরা ; আর শর্তাধীন পরাবর্তের উদাহরণ—বাবা যদি রাগী হয় তাহলে বাবাকে চোখে দেখামাত্র ভয় পাওয়া। এছাড়া দুই ধরনের সংকেত-ব্যবস্থা মস্তিষ্কের আছে। প্রথম সংকেত ব্যবস্থা (First Signalling System) অন্যান্য প্রাণীরও আছে, কিন্তু দ্বিতীয় সংকেত-ব্যবস্থা (Second Signalling System) মানুষেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতীয় সংকেত-ব্যবস্থাই (SSS) হলো ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা, চিন্তা করার ক্ষমতা, সাধারণীকরণ ও বিমূর্তকরণের (Generalisation & Abstraction) ক্ষমতা।…আবার সেই উত্তেজনা, নিস্তেজনা ও গতিময়তার ব্যাপারে ফিরে আসছি। বহির্জগতের উদ্দীপক বা শরীরের ভিতরকার কোন অংশ যেন উদর, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি থেকে আসা উত্তেজনা-বার্তা নার্ভতন্ত্র এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনার ফলেই মস্তিষ্কের কোষগুলি উদ্দীপ্ত হয়ে প্রয়োজনীয় কাজটা করে ফেলে। এই উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মস্তিষ্কে নিস্তেজনা নেমে আসে—কখনও আত্মরক্ষা হিসাবে, কখনও পারম্পর্য হিসাবে, কখনও বিশৃঙ্খলা রোধ করার উপায় হিসাবে, কখনও বা কোষগুলোকে বিশ্রাম দেবার উপায় হিসাবে। আবার পূর্বোল্লেখিত শর্তাধীন পরাবর্তকে (Conditioned Reflex) এক গতিপথ থেকে প্রয়োজন অনুসারে অন্য গতিপথে স্থানান্তরিত করার কাজটি মস্তিষ্কের গতিময়তার দরুন হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ঘুমের কথাটা বলতেই হয়। ঘুম মূলত আত্মরক্ষামূলক একটি প্রক্রিয়া (Defensive & Restorative)। মস্তিষ্কের ব্যাপক নিস্তেজনাপর্বই ঘুম আনে। এই ঘুমের শারীরবৃত্তীয়

কিছু ধাপ আছে : ১. Phase of Equalisation (উত্তেজনা-নিস্তেজনার সমতা), ২. Paradoxical Phase (এমনভাবে নিস্তেজনা নেমে আসে যে দুর্বল কোন উত্তেজক সবল প্রতিক্রিয়া ঘটায়, সবল উত্তেজক দুর্বল প্রতিক্রিয়া ঘটায়) , ৩. Ultra Paradoxical Phase (অর্থাৎ নেতিবাচক উত্তেজক ইতিবাচক বিক্রিয়া ঘটায় এবং ইতিবাচক উত্তেজক কোন বিক্রিয়াই ঘটায় না), ৪. Narcotic Stage (প্রকৃত শান্ত ঘুম) ।

এবার আমরা অভিভাবন ও স্ব-অভিভাবনের (Suggestion & Auto-suggestion) উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আমরা জেনেছি, খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, মানুষের সমস্ত কাজকর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত নিয়ন্তা হলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কিংবা মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স। কয়েকটি প্রামাণ্য উদাহরণ দেওয়া যাক, যেখানে অভিভাবনের (Suggestion) প্রভাবে শারীরিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. রোগীর বয়স ৩৫ বছর। কিছু গেলবার সময় বুকে চাপ এবং ব্যথা হয়। মাঝে মাঝে ব্যথাটা বুকের ডানদিকে এবং মেরুদণ্ডের দিকে চলে যায় এবং প্রায়শই খাবার পর বমি হয়। Oesophagus-এর (খাদ্যনালীর ওপরের অংশ) টিউমার সন্দেহে এক্স-রে করা হয়, কিন্তু কোন টিউমার এক্স-রে রিপোর্টে পাওয়া যায় নি। এরপর রোগীকে মানসিক চিকিৎসা বিভাগে পাঠানো হয়। বিস্তারিত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের পর বোঝা যায় যে ২½ বছর আগে তীব্র পারিবারিক সংকটের মধ্য দিয়ে রোগীকে যেতে হয়েছিল। তার থেকেই রোগীর মানসিক আতঙ্কের রোগ 'নিউরোসিস' জন্ম নেয়। সেই আতঙ্ক থেকে Oesophageal Spasm বা খাদ্যনালীর খিঁচ—যা কিনা ঐ আতঙ্কপ্রসূত Cortial Trigger Point-এর কারণে হচ্ছিল। ৫ দিন ধরে তাকে মৌখিক সম্মোহন-অভিভাবন দিয়ে তার মন থেকে আতঙ্ক দূর করা হয় এবং ফল হিসেবে দেখা যায় রোগীর ব্যথা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উৎসর্গ চলে গেছে।

২. রোগীর বয়স ২১ বছর। ৪ মাস ধরে একটানা পেট খারাপে (Diarrhoea) ভুগছিল। এই সময় সে অত্যন্ত পরিমিত আহার করছিল। পেটের আলসার (Ulcer) সন্দেহ করা হলো প্রথমে, তারপর কোলাইটিস (Colitis) হয়েছে ভেবে চিকিৎসা চলল। কোন ফল পাওয়া গেল না। এরপর মানসিক চিকিৎসা বিভাগে বিস্তারিত পরীক্ষার পর জানা গেল একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় তাকে এই বলে ভয় দেখানো হয়েছিল যে, তার জানলার পাশে একটা বন্দুক আছে। সেই থেকে তার উপরোলিখিত সমস্যার শুরু।

সম্মোহন-অভিভাবনে তাকে ক্রমাগত বলা হতে থাকলো—"তোমার ঐ ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা তুমি ভুলে গেছ, তোমার অন্ত্র ঠিক হয়ে গেছে।" দ্বিতীয় দফার অভিভাবনের পরে তার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

আর দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। বিখ্যাত ইংরেজ কবি, রবার্ট ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংকে প্রচণ্ড শিরদাঁড়ার ব্যথা থেকে শুধু উৎসাহ জুগিয়ে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন এবং শয্যাশায়ী এলিজাবেথ শেষ পর্যন্ত তার প্রসিদ্ধ বাড়ি থেকে (যা ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং রক্ষণশীল) ঐ অবস্থায় পাঁচিল টপকে পালিয়ে রবার্ট ব্রাউনিংকে বিয়ে করেছিলেন। যদিও শিল্পসাহিত্যের উদাহরণ তবুও চার্লি চ্যাপলিনের 'লাইমলাইট' প্রকৃতপক্ষে চার্লির Suggestion (উৎসাহ দান) এবং বান্ধবী নর্তকীর প্রেরণা পাওয়ারই (Auto-suggestion) কাহিনী।

এইবার সরাসরি অভিভাবন (Suggestion) এবং স্ব-অভিভাবনের (Auto-suggestion) শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যায় চলে আসা যাক। সম্মোহনের ঘুমে মস্তিষ্কের বেশিরভাগ অংশ থাকে নিস্তেজিত, কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রহণকেন্দ্রের একটি অংশ বেশি সজাগ থাকার ফলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষিত হয়। এই বেশি সজাগ অংশটিকে বলা হয় Rapport Zone। চিকিৎসকের সঙ্গে এই যোগসূত্র স্থাপিত ও সংরক্ষিত না হলে সম্মোহন-অভিভাবনের অভীষ্ট ফল লাভ করা যায় না। এই সময়ে মস্তিষ্কক্রিয়া দুটো অংশে ভাগ হয়ে যায়। একটি অতিজাগ্রত অংশ—যা অভিভাবন গ্রহণ করতে উৎসুক। অন্যটি নিস্তেজিত অংশ—যার জন্য শরীর ও মনে একটা শিথিলতা আসে। অভিভাবন জাগ্রত অংশটিকে উত্তেজিত করে; মস্তিষ্কের ধর্ম অনুযায়ী আশেপাশের অংশে তখন নেমে আসে নিস্তেজ ভাব, ফলে সেটা হয়ে পড়ে আরো নিষ্ক্রিয় (Induced inhibition) এবং বিরোধী কোন চিন্তাভাবনা আর কাজ করে না। এই অবস্থায় অভিভাবনের ক্রিয়া অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে। এছাড়া ঘুম জাগরণের অন্তর্বর্তী Paradoxical Phase-এ অভিভাবনের মতো দুর্বল উদ্দীপক সব থেকে জোরালো মাত্রায় পরাবর্ত বা প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী পাভলভের নির্দিষ্ট তত্ত্ব রয়েছে।

যারা তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবুটি, মাদুলি-তাবিজ, পাথর, রত্ন ইত্যাদির চর্চা (বা ব্যবসা) করেন এবং যারা এইসব চর্চার সাহায্য নিতে চান, তারা যদি আদৌ কোন উপকার পেয়ে থাকেন—তাহলে তা এই অভিভাবন-স্বাভিভাবন-এর (যা কিনা সহজভাবে বললে বিশ্বাস, আশ্বাস, অভয় পরামর্শ ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দরুনই পান। (অবশ্য মানসিকভাবেও সত্যিই ক-জন উপকার পান সেটাও তর্কের বিষয়

হতে পারে।) আসলে বেশিরভাগ সময়েই মাদুলিদাতারা এমন সব শর্তের উপস্থাপনা করেন যে, তার কোন না কোন শর্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে লজ্মিত হয়ে যেতেই পারে, আর তখন কৈফিয়ৎ দেওয়ার অনেক সুযোগ থাকে। এভাবেই সেই 'মহান' ব্যক্তির প্রভাব অব্যাহত থেকে যায় এবং তার 'বাণী' সহজেই Suggestion বা অভিভাবনের ভূমিকা পালন করে চলে।

সুতরাং অলৌকিক ক্ষমতা বা অতিজাগতিক প্রভাব নয়, আশ্বাস বিশ্বাস আর অভয়ের মাধ্যমে কিছু রোগ নিরাময়ের কারণটি বিজ্ঞানেরই অনুসারী—এ কথাটা বোধহয় দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় (এখনও পর্যন্ত শারীরবৃত্তীয় ও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর ভিত্তি করেই)।

সূত্র :

১. পাভলভ পরিচিত, ১ম খণ্ড : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২. Psychology as you may like it : K. Platanov.

৩. The Word, as a Physiological and Therapeutic Factor : K. Platanov, Moscow, 1959.

৪. Essays on Patho Physiology of Higher Nervous Activities : A. G. Ivanov and Smolensky.

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

টিয়াপাখি, ভাগ্য এবং লটারিতে লাখ লাখ

সারা ভারতে এখন বিভিন্ন রাজ্য-সরকার আয়োজিত লটারি খেলার খুব ধুমধাম। পশ্চিমবঙ্গে তো এই রেওয়াজের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাসও আছে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারির একটি সভায় টাউন হল নির্মাণের প্রস্তাব থেকেই লটারি কমিটির সৃষ্টি। প্রায় তিরিশ বছর (১৮০৬-১৮৩৬) যাবৎ "কলিকাতার বহু রাস্তাঘাট, পার্ক-পুষ্করিণী সরকার ঘোষিত এই লটারির টাকায় হইয়াছে।" (কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ১৯)। পুরস্কারের টোপে ভুলে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি লটারির টিকিট কিনে কলকাতার উন্নয়নের পুঁজি যুগিয়েছিল। শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগলের লেখা থেকেই

---

১৪৩ বছর আগে সরকারি লটারির বিরোধিতা

"কলকাতা নগরীর উন্নতির জন্য গভর্নমেন্টের থেকে মোটা টাকা ঋণ করা হয়েছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলকাতায় যে সরকারি লটারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার লভ্যাংশ দিয়ে এই ঋণ শোধ করা হয়েছে। ঋণ সম্পূর্ণ শোধ হওয়ার পরও লটারি চালিয়ে যাওয়ার ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সংবাদপত্রে। লটারির সঙ্গে শুধুই টাকার প্রশ্ন জড়িত নয়, নীতির প্রশ্নও জড়িত। কলকাতার সরকারি-লটারি যে অবাঞ্ছনীয় তা বর্তমান সভ্যযুগে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই সব লটারির টিকিটের দাম কম তাই একেবারে নিঃস্ব না হলে সকলেই কিনতে পারে। এই লটারিগুলি সমাজের সকল স্তরে জুয়াখেলার প্রবৃত্তি বিস্তার করছে, অর্থাৎ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলকাতায় যাবতীয় অপরাধের একটি বৃহৎ অংশ জুয়াড়ী মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত এবং এ-স্থলে গভর্নমেন্ট-লটারি এই মনোবৃত্তিকে উৎসাহ দেয়।…লটারির সাহায্যে সজ্জিত নগরী মানবের সদ্‌গুণরাশির সমাধি ছাড়া কিছু নয়।"

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ; ৩১শে জানুয়ারি, ১৮৩৯

আরো জানা যায় যে, "পরে সরকারীভাবে ইহা (লটারি) পরিচালনা করা রীতিবিরুদ্ধ হয়।" সরকারি উদ্যোগে আবার লটারি খেলা শুরু হয় ১৯৬৭-তে, পশ্চিমবঙ্গে, যুক্তফ্রণ্টের আমলে। অন্যান্য প্রদেশ অতঃপর 'বাঙালী'র পিছু ধরে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের লটারির একটি বিজ্ঞাপনে দেখেছি একটি ঠিকুজির খাঁচা থেকে টুকটুকে লাল ঠোঁটওলা সবুজ টিয়াপাখি উড়ে আসছে। কলকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে গণৎকারদের ট্রেনিং-দেওয়া টিয়াপাখিরা তো হামেশাই মুখে করে টেনে বার করছে ভাগ্যের কার্ড—যা ওজন করার মেশিনে ভরা ছাপানো কার্ডের মতো একটি করে অভয় বা সভয় বাণী বহন করছে।

তাহলে লটারির খেলায় পুরস্কার লাভ সত্যিই কি ভাগ্যের কারবার যা জন্মলগ্নেই স্থির হয়ে গেছে? এই প্রশ্নে আসার আগে খেয়াল রাখতে হবে যে, লটারির আয়োজন যারাই করুক, তার পিছনে একটা অর্থকরী দিক থাকে। কোন্ ব্যক্তি লটারি জিতবে আগে থেকে বলা যতই কঠিন হোক, একথা নির্দ্বিধায় নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে লটারির আয়োজকরা কিন্তু লাভবান হবেই। ধরা যাক একটা লটারিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার বাবদ ছ'-লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। তার মানে নিদেনপক্ষে আট লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হবেই, না হলে আয়োজনের খরচ খরচা বাদে কি-ই বা লাভ থাকে। আবার অনুমান করা যাক যে, আট লক্ষ এক-টাকার টিকিট বিক্রি হলো। তার মানে আট লক্ষ লোক টিকিট কিনল। এই আট লক্ষের মধ্যে বিশেষ একজনের প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে কতটা?—আট লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এই আট লক্ষ লোকের মধ্যে বিশেষ একজনের তিনটি পুরস্কারের মধ্যে যে-কোন একটি লাভ করার সম্ভাবনা, আট লক্ষ ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ তিনকে আট লক্ষ দিয়ে ভাগ দিলে যা হয়। এই সম্ভাবনার কথাটুকুই শুধু নিশ্চিত করে বলা চলে, বাকি সব অনিশ্চিত। এবার দেখা যাক, আট লক্ষ ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনা ব্যাপারটা কি রকম। ধরুন একটা বাড়িতে আট লক্ষ ঘর আছে আর তার মধ্যে যে কোন একটিতে তিন লক্ষ টাকা আছে। এখন কাউকে যদি চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তার সামনে আট লক্ষ সম্ভাবনা রয়েছে—সে এর মধ্যে যে-কোন একটা ঘরে ঢুকতে পারে; কিন্তু প্রথম সুযোগেই তার ঐ টাকা-রাখা ঘরটাতে ঢুকে কিস্তি মাত্ করার সম্ভাবনা আট লক্ষ ভাগের এক ভাগ। আবার ঐ আট লক্ষ ঘরের তিনটিতে যদি পুরস্কারের টাকা থাকে তাহলে প্রথম সুযোগেই তার সাফল্যের সম্ভাবনা যৎকিঞ্চিৎ বেশি হয় অর্থাৎ আট লক্ষ ভাগের তিন ভাগ।

এবার এমন একজনের কথা ধরা যাক, যে প্রতিদিন একটা করে ভিন্ন লটারির

টিকিট কেনে। প্রতিটি লটারিতেই তার জেতবার সম্ভাবনা আট লক্ষ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু সে যদি এক বছরে ৩৬৫ টা আলাদা আলাদা টিকিট না কিনে একটা লটারির ৩৬৫টা টিকিট কিনে নেয়, তাহলে তার জেতার সম্ভাবনা দাঁড়ায় আট লক্ষ ভাগের ৩৬৫ ভাগ। (অবশ্য সম্ভাবনাতত্ত্বের গাণিতিক নিয়মের বিশদে গেলে বলতে হয়—অল্প সংখ্যক টিকিট কাটলে, যেমন ১০, ৫০ বা ১০০টা, তা একই লটারির হোক বা বিভিন্ন লটারির হোক, পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা বস্তুত সমানই।) এইসব বিচার করে একটা কথাই বলা যায় যে, লটারিতে প্রথম প্রাইজ জেতার নিশ্চিত উপায় হলো, সেই লটারির সব ক-টা টিকিট কেটে ফেলা। অর্থাৎ ছয় লক্ষ টাকার পুরস্কার যে-কেউ ইচ্ছে করলেই পেতে পারে, অসুবিধে বলতে কেবল এইটুকুই, যে, তার জন্যে তাকে আট লক্ষ টাকা খরচ না করলেই নয়। সুতরাং চোখ বন্ধ করে খড়ের গাদায় হাত ঢুকিয়ে প্রথম সুযোগেই ছুঁচ খুঁজে পাওয়া আর লটারিতে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে—বোঝাই যাচ্ছে।

এতো গেল উপমার কথা। আসলে লটারি কিন্তু প্রকৃত জাত-গোত্র-বংশ বিচারে জুয়াখেলারই হের-ফের। শুধু হের-ফের নয়, জুয়াখেলার ওপরেও এক কাঠি।

রুলেট চক্র নামে জুয়াখেলার জন্য মন্টিকার্লো'র ক্যাসিনো পৃথিবীবিখ্যাত। এই রুলেট চক্রে 0 থেকে ৩৬ অবধি সংখ্যা লেখা ৩৭টি খোপ থাকে। 0 বাদে বাকি খোপগুলির অর্ধেক লাল রঙা আর বাকি অর্ধেক কালো। লাল বা কালোর ওপর, কিংবা বিশেষ সংখ্যার ওপর বাজি ধরতে হয়। সংখ্যা বা রঙ মিললেই জিত। লটারি জেতার সম্ভাবনার মতোই বিশেষ একটা সংখ্যার ওপর বাজি ধরলে রুলেট খেলার জেতার সম্ভাবনা ৩৭ ভাগের এক ভাগ। কাজেই কেউ যদি জেদ ধরে একেবারে ৩৭টা ঘরের ওপরেই এক টাকা করে বাজি ধরে সে অবশ্যই ৩৬ টাকা ফেরৎ পাবে। অর্থাৎ ৩৭ টাকা লাগিয়ে ১ টাকা ক্ষতি বা শতকরা ২·৭ ভাগ ক্ষতি। অবশ্যই কেউ যদি বিশেষ একটা সংখ্যার ওপর প্রতিবার বাজি ধরে তাহলেও বহুদিন বহুক্ষণ খেলা চলার পরও তার হারের পরিমাণ মোট বাজি ধরার টাকার ২·৭ শতাংশেরই ধারে কাছে থাকবে। রুলেট খেলায় জেতার কোন আয়ত্তাধীন কৌশল নেই, শুধু হারের পরিমাণটাকে সবচেয়ে কমিয়ে ২·৭ শতাংশে আনা যায়। গণিতবিকাশের ইতিহাসে দেখা যায়, রুলেট খেলা, পাশাখেলা (dice), তাসের জুয়া, ফ্ল্যাশ—ইত্যাদি বিভিন্ন জুয়াখেলায় হারের সম্ভাবনা সবচেয়ে কম রাখার কৌশল বার করতে গিয়েই গণিতবিদ্যার সম্ভাবনাতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। শিভালিয়ার দ্য মিয়ার নামে এক জুয়াড়িবাবুর

অনুরোধে গণিতবিদ্ প্যাস্কাল প্রথম জুয়াখেলার হারজিতের সম্ভাবনা বিচার করেন: এবং 'ক্যালকুলাস ও প্রবাবিলিটি'র জন্মও হয় তারই হাতে। বর্তমানে খেলার হারজিত সম্ভাবনা বিচার করে জুয়াখেলার সেরা চাল নির্ধারণ করাকে 'গেমস থিওরী' বা 'খেলার তত্ত্ব' বলা যায়। 'গেমস থিওরীস্ট' বা 'খেলার তত্ত্ববিদ্'রা দেখেছেন জুয়াখেলায় সাধারণত, শেষ বিচারে, বড়লোকরাই লাভবান হয় এবং গরীবেরাই হেরে থাকে। বলাই বাহুল্য এটা কোন নীতিবাগিশের সতর্কতামূলক উপদেশ নয়, পুরোপুরি গণিতসিদ্ধ মতামত। গরীবদের পুঁজি অল্প তাই প্রথম দিকেই কয়েকবার হেরে গেলে তারা বেশিক্ষণ খেলা চালাতে পারে না, আসর থেকে বিদায় নিতে হয়। সম্ভাবনাতত্ত্ব একটা প্রাথমিক কৌশল বাত্‌লে দেয় ঠিকই, কিন্তু যত বেশিক্ষণ খেলা চালানো যাবে, ততই খেলার ফলাফল সম্ভাবনাতত্ত্বের ভবিষ্যদ্বার্তার কাছাকাছি এগিয়ে আসবে। ব্যাপারটা খুব সহজেই বোঝা যায় পয়সা নিয়ে টস করার খেলা বিচার করলে। একটা পয়সার দুটো পিঠ হেড আর টেল, তাই একবার টস করলে হেড পড়ার সম্ভাবনা দু-ভাগের এক ভাগ, টেল্ পড়ার সম্ভাবনাও তাই। অর্থাৎ আধাআধি। কিন্তু সম্ভাবনা থাকলেই যে ফলটা প্রতিবার পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই। দেখা গেল প্রথম তিনবার টস করে প্রতিবারই হেড পড়ল, তারপর একটা টেল। তাহলে সম্ভাবনা বিচার করে লাভ কি? লাভ এইটাই যে আমরা যদি বারবার টস করে যাই তাহলে দেখব হেড ও টেল পড়ার সংখ্যা ক্রমেই কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। ২০০ বার টস করলে ৬০ শতাংশ হেড ও ৪০ শতাংশ টেল পড়তে পারে কিন্তু টসের সংখ্যা যদি ২,০০০ হয় তাহলে হয়ত দেখা যাবে ৫৫% হেড ৪৫% টেল পড়েছে ; অর্থাৎ সংখ্যা আধাআধির দিকে যেতে থাকে।

এই জন্যেই অল্প পুঁজি নিয়ে গরীবদের পক্ষে দীর্ঘকাল খেলা চালিয়ে জুয়াখেলায় এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। তাছাড়া একটা মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। বেশিক্ষণ খেলা চালাবার সঙ্গতি থাকে না বলেই গরীব মানুষ একবারে দাঁও মারবার চেষ্টা করে—অবৈজ্ঞানিক উপায়ে যথেচ্ছ বাজি ধরে এবং আরো দ্রুত পরাস্ত হয়।

পৃথিবীর কোথাও এমন কোন জুয়াখেলার আসর বসে না, যেখানে নিশ্চিতভাবে জেতবার কোন গণিতসিদ্ধ উপায় আছে। বিভিন্ন জুয়াখেলায় সবচেয়ে কম লোকসান দেওয়ার উপায়টিই শুধু নিশ্চিতভাবে বাত্‌লে দিতে পারেন গাণিতিকরা।

জুয়া ও লটারি, চুরি ও ডাকাতি, দুয়েরই সবচেয়ে বড় মূলধন হলো—ভাগ্যের

ওপর, অদৃষ্টের ওপর, কপালের ও হাতের রেখার ওপর মানুষের বিশ্বাস। "এখনো ভাবছেন ? না না, ভাববার কিছু নেই। কে বলতে পারে, আপনার ভাগ্যে কি আছে! একটা টাকার কতটুকু দাম! কিন্তু ভাগ্য যদি সহায় হয়, কে বলতে পারে কালই হয়তো আপনি হবেন পাঁচলাখ টাকার মালিক ?"—গ্রামে ও শহরের বাজারে, স্টেশনের কাছে, গাড়ির মাথায় বা রিক্সায় চড়ানো লাউডস্পীকারে লটারির টিকিট বিক্রেতাদের এইরকম ঘোষণা আমরা সবাই শুনি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাতেই ছোট-বড় নানাবিধ নানা-রাজ্যের লটারি ব্যবসা চলছে। মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর সবচেয়ে জমজমাট জুয়াখেলার আসর ক্যাসিনোর অবস্থান মনাকো রাজতন্ত্রে। ক্যাসিনো থেকে মনাকো রাজ্য তার রাজস্বের একটা বড় অংশ অর্জন করে। তা বলে বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে একই উপায়ে রুলেট চক্রের চেয়েও ক্ষতিকারক লটারি নামক জুয়াখেলা থেকে রাজস্ব আদায় করছেন! এটি সম্পূর্ণ অনৈতিক।

বিশৃঙ্খল সমাজের চাপে বিপর্যস্ত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের সামনে ভাগ্যের নামে অলীক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা সামাজিক সুস্থতা নয়। এই টিকিট-কাটা একটা নেশার মতো পেয়ে বসে বেশিরভাগ সময়। আর, একবার যদি পঞ্চাশ কি একশো টাকার একটা ছোট পুরস্কার 'লেগে যায়' তো কথাই নেই। এমন শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা 'হপ্তা' পেয়েই (সাপ্তাহিক বেতন) গোটা তিন চার লটারির টিকিট কিনে ফেলেন। যদি ধরা যায়, তারা সপ্তাহে তিনটাকা করে খরচ করেন, তাহলে বছরে মোট ব্যয় হয় ১৫৬ টাকা। চল্লিশ বছর ধরে হিসেব করলে খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬,২৪০ টাকা। আর পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা ? প্রতি সপ্তাহে তিনটে টিকিট কাটলে ৪০ বছরে ৬,২৪০টা টিকিট কাটা হয় এবং এই ৬,২৪০টা লটারি অনুষ্ঠানে মোট টিকিট-ক্রেতার আনুমানিক সংখ্যা (আগের হিসাব অনুযায়ী) পঞ্চাশ হাজার লক্ষ বা ৫০,০০০,০০০,০০। এর মধ্যে প্রথম পুরস্কার পাবেন মাত্র ৬,২৪০ জন। এই ৬,২৪০ জনের মধ্যে একজন হবার আশায় ৪৯৯,৯৯৯,৩৭৬০ জন প্রত্যেকে ৬,২৪০ টাকা করে জলে ঢালবেন।

অথচ আমরা সবাই জানি, এই ভুলের ফাঁদে পা দিয়ে নিম্নবিত্ত মানুষই সবচেয়ে বেশি লটারির টিকিট কেনেন। রঙীন স্বপ্ন দেখিয়ে (হঠাৎ লাভ হলেও তো হতে পারে ভাবিয়ে) মানুষকে তার ন্যায্য সংগ্রামের পথ থেকে বিমুখ করার জন্যই নানা আয়োজন থাকে। লটারি ব্যবস্থাও সেই সব আয়োজনের একটি, যা মানুষের অদৃষ্টবাদী চিন্তাধারাকেই উত্তেজিত করে মানুষের অবস্থা-বিপাকের সুযোগ নিয়ে তাকে সরাসরি দোহন করে। তবু লটারির খেলা যদি চালাতেই

হয়, তাহলে প্রগতিশীল সরকারের পক্ষে অন্তত, প্রত্যেক লটারির টিকিটে ও বিজ্ঞাপনে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ রাখা দরকার যে, ক্রেতার পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা কতটুকু। তারপর তা জেনেও যদি কেউ এক টাকার ঠোঙাভরা মুড়ি-তেলেভাজার নিশ্চিত প্রাপ্তিকে অগ্রাহ্য করে আটলক্ষ ভাগের একভাগ সম্ভাবনাকে কেনে, তখন অন্তত সাধারণ মানুষকে ধাঁধা লাগিয়েও বিভ্রান্ত করে লটারিতে অর্থ বিনিয়োগে প্ররোচিত করার অপবাদ আর গায়ে লাগবে না।

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

লটারি, রত্নধারণ ও সম্ভাবনাতত্ত্ব

আমরা কয়েকজন বন্ধু বাসে যাচ্ছিলাম। এক বন্ধু আমার হাত দেখছিল, খেলার ছলে। আমার একপাশে এক অপরিচিত ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি আমার হাতের ওপর নজর রেখেছিলেন। পরে প্রকাশ পেল, তিনি একজন জ্যোতিষী। বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী শেষ হলে ভদ্রলোক বললেন আমার বৃহস্পতি বিশেষ অনুকূল কিন্তু অন্যান্য গ্রহের অবস্থান কিছুটা প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতার দোষ কেটে যাবে একটি শাঁখার আংটি পরলে। আমার লটারি জেতার সম্ভাবনাও নাকি বিশেষ উজ্জ্বল। কিন্তু লটারি জেতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার কিছু অনাস্থাসূচক ধারণা ছিল, তাই লটারির টিকিট আর কেনা হয় নি। সে না হয় না-ই হয়েছে, তবে এই ঘটনার প্রসঙ্গে লটারি জেতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ এসেছে।

ধরা যাক কোন লটারির দশ লক্ষ টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে। টিকিটের নম্বর 000,000 থেকে ৯৯৯,৯৯৯ পর্যন্ত। ধরা যাক, ছয়টি বাটির প্রত্যেকটিতে 0 থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি লেখা মোট দশটি করে কার্ড আছে। কোন বিশেষ

সংখ্যার প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে প্রতিটি বাটি থেকে একটি করে কার্ড তুলে পরপর সাজালে যে নম্বরটি পাওয়া যায় সেই নম্বরের টিকিটই প্রথম পুরস্কার পায়।

টিকিট ক্রেতারা স্বাভাবিকভাবেই ভেবে থাকেন যে, টিকিটের নম্বরে যদি একই অংক পুনরাবৃত্ত হয়ে সংখ্যাটি গঠন করে (যেমন ২২২,২২২) অথবা মাত্র দু'টি অংক পুনরাবৃত্ত হয়ে সংখ্যাটি গঠন করে (যেমন ২৩২৩২৩ বা ২২২৩৩৩) তবে এমন টিকিটের পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা কম, কারণ এই ধরনের সংখ্যা খুব কমই আছে। প্রথম দশ লক্ষ সংখ্যার মধ্যে একই অংক পুনরাবৃত্ত হয়ে গঠন করেছে এমন সংখ্যা আছে মাত্র দশটি। দুটি অংক পুনরাবৃত্ত হয়ে গঠিত সংখ্যা আছে দশ লক্ষের মধ্যে মোট ২,৭৯০। সারণি : ১-এ ছয় অংকবিশিষ্ট সংখ্যাগুলির মধ্যে কোন্ ধরনের কতগুলি আছে তা বোঝান হলো।

সারণি : ১

প্রথম দশ লক্ষ সংখ্যার শ্রেণীবিন্যাস

সংখ্যার ধরন	উদাহরণ	মোট কয়টি আছে
ছয়টি বিভিন্ন অংক দ্বারা গঠিত	২৪৬৫৩৭ বা ০৮৩২৫৪	১৫১,২০০
পাঁচটি বিভিন্ন অংক দ্বারা গঠিত	২৫৭৩৮২ বা ৪৩৭২২১	৪৫৩,৬০০
চারটি বিভিন্ন অংক দ্বারা গঠিত	৩২৭৩৭৬ বা ৩২৭৩৩৬	৩২৭,৬০০
তিনটি বিভিন্ন অংক দ্বারা গঠিত	০৭১১৭০১ বা ০০৭০১৭ বা ৭২৩৭৭৭	৬৪,৮০০
দুইটি অংক দ্বারা গঠিত	৫৫৬৫৫৫ বা ৫৬৫৬৫৬	২,৭৯০
একটি অংক দ্বারা গঠিত	২২২২২২	১০
		মোট ১০,০০,০০০

স্পষ্টতই চারটি বা পাঁচটি বিভিন্ন অংক দ্বারা গঠিত সংখ্যাই সব থেকে বেশি আছে। খুব পরিষ্কার করে এইভাবে না ভাবলেও আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি এই ধরনের নম্বরযুক্ত টিকিটকেই বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে এক বা দুইটি অংক দ্বারা গঠিত টিকিটের তুলনায়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, পুরস্কার পাওয়া যায় একটি নির্দিষ্ট নম্বরের টিকিটেই, তা সে পাঁচ অংক বিশিষ্টই হোক বা এক অংক বিশিষ্টই হোক ; এবং এই পুরস্কারজয়ী নম্বরটি দশ লক্ষের মধ্যে

একটিই আছে। তাই ৭৩২৫৪৩ বা ২২২২২২ এই দু-টি সংখ্যারই পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা সমান।

কোন বিশেষ সংখ্যার সম্বন্ধে প্রায়শই আমাদের বিশেষ আগ্রহ বা অনাগ্রহ থাকে। সম্ভাবনাতত্ত্বের বিচারে এই ধরনের মনোভাব ভুল। কোন বিশেষ সংখ্যা যেমন 'পয়া' বা 'অপয়া' হতে পারে না, তেমনই টিকিট ক্রেতাদের রত্নধারণের দ্বারা কোন ধরনের সংখ্যা পুরস্কার জিতবে, তার হেরফের হতে পারে না। প্রতি মাসে যদি ২০টি করে লটারি অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সব লটারির প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত নম্বরগুলি লিখে রাখা হয় তবে ২৫ বৎসরে মোট ৬,০০০ টি প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত নম্বর পাওয়া যাবে। প্রতিটি লটারিতেই যদি দশ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়ে থাকে তবে এই পুরস্কারজয়ী নম্বরগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাগুলি, মোটামুটিভাবে সারণি : ২ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

সারণি : ২

প্রথম পুরস্কারজয়ী সংখ্যার শ্রেণীবিন্যাস

ছয়টি বিভিন্ন অংক	১০৭ বার	তিনটি বিভিন্ন অংক	৩৮৯ বার
পাঁচটি বিভিন্ন অংক	২,৭২১ বার	দুইটি বিভিন্ন অংক	১৭ বার
চারটি বিভিন্ন অংক	১,৯৬৬ বার	একই অংক ছয়বার	০ বার

এই সারণিতে দেখানো সংখ্যাগুলি একেবারে ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে না, কিছু কমবেশি হবে। তবে মোটামুটি জোর দিয়ে বলা যায় যে, পাঁচটি ভিন্ন অংক দিয়ে তৈরি ছয় অংকের সংখ্যাই সব থেকে বেশিবার প্রথম পুরস্কার জিতবে। চারটি ভিন্ন অংক দিয়ে তৈরি ছয় অংকের সংখ্যা, ছয়টি ভিন্ন অংক দিয়ে তৈরি সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশিবার প্রথম পুরস্কার জিতবে ইত্যাদি। টিকিট ক্রেতারা যতই রত্নধারণ করুন, এমনটা ঘটবেই।

একটা ছোটখাট লটারির উদাহরণ নেওয়া যাক। ১০০টা টিকিটের লটারি এবং একটাই মাত্র পুরস্কার। এরকম লটারির ক্ষেত্রে টিকিট ক্রেতারা গড়ে ১০০ বারে একবার পুরস্কার পাবে। কোন নির্দিষ্ট ক্রেতা একবারও না-ও পেতে পারে এবং কেউ একাধিক বার পেতে পারে। এই ধরনের অনেকগুলি লটারির কথা ভাবা যাক। এক লক্ষ ব্যক্তির প্রত্যেকেই যদি একশ'বার টিকিট কাটে তাহলে সারণি : ৩ অনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে।

সারণি : ৩

এক লক্ষ ব্যক্তির প্রত্যেকে এক-শ'বার টিকিট কাটলে কে কতবার পুরস্কার পায়		
পুরস্কার বিজয়		ব্যক্তির সংখ্যা
একবারও না	—	৩৬,৭৮৮
একবার	—	৩৬,৭৮৮
দুইবার	—	১৮,৩৯৪
তিনবার	—	৬,১৩১
চারবার	—	১,৫৩৩
পাঁচবার	—	৩০৬
ছয়বার	—	৫১
সাতবার	—	৭
আটবার	—	১

ধরা যাক এই এক লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে থেকে দশ হাজার জনকে বেছে নিয়ে তাদের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীদের দিয়ে দেখিয়ে রত্নের বিধান নেওয়া হলো। এই দশ হাজার জনের পুরস্কার বিজয়ের বিষয়টা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে প্রায় ৩,৬৮০ জন একবারও পুরস্কার পায় নি এবং একই সংখ্যক জন মাত্র একবার পুরস্কার পেয়েছেন এক-শ'বার টিকিট কেনা সত্ত্বেও। ৩ নং সারণি বা ওপরের সংখ্যাগুলির কোনটাই বাস্তব অভিজ্ঞতায় নিখুঁতভাবে মিলবে না, তবে মোটামুটিভাবে মিলবে। এমন দশ হাজার জন ব্যক্তি যারা রত্নধারণ করেন নি এবং এক-শ'বার টিকিট কিনেছেন তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে প্রায় ৩,৬৮০ জনই পুরস্কারহীন এবং প্রায় একই সংখ্যক জন মাত্র একবার পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তি রয়েছেন। অর্থাৎ রত্নধারণের পর যে ফল পাওয়া যায়, এক্ষেত্রেও ফল প্রায় একই রকম হবে ; তা না হলে সম্ভাবনাতত্ত্বই ভুল প্রমাণিত হবে—অথচ বাস্তব জীবনের বহু অভিজ্ঞতায় এই তত্ত্ব আজ প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বীমা কোম্পানিগুলির ব্যবসা দাঁড়িয়ে আছে।

এখন কেউ তো ভাবতেই পারেন, যে পাঁচজনের ছয়বার পুরস্কার জেতার কথা, রত্নধারণের ফলে তাদের একজন তিনিও হতে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, বাস্তব ঘটনাকে প্রভাবিত করা রত্নের পক্ষে সত্যিই যদি সম্ভব হতো তবে দশ হাজার জন

'সঠিকভাবে' রত্নধারণ করলে তাদের সকলেরই পাঁচজনের মধ্যে স্থান পাবার কথা, যা নিছক যুক্তির বিচারেই অসম্ভব। আর পুরস্কার বিজয়ের ঘটনার সংখ্যার তো হেরফের হওয়া সম্ভবই নয়, কারণ লটারির পদ্ধতিই এমন থাকে যে, পুরস্কারের সংখ্যা সংগঠকদের পূর্ব পরিকল্পনা মতোই হতে বাধ্য। অর্থাৎ বলতে চাইছি, 'কপাল খুলে' যাওয়ার আশায় যত বেশি সংখ্যক লোকই রত্নধারণ করুন না কেন, পুরস্কারের সংখ্যা কিন্তু কখনোই বাড়ছে না। তাহলে, ভাগ্য কি সত্যিই ফেরানো যায় ?

এই রচনার ধারণা এবং ১ ও ৩ নং সারণির গণনা এমিল বোরেলের 'প্রবাবিলিটিজ অ্যাণ্ড লাইফ' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

মধুসূদন দত্ত

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২



গ্রহরত্নের জাতধর্ম

রত্নের নাম	খনিজ/ বৈজ্ঞানিক নাম	রাসায়নিক সংকেত পরিচয়	আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gr.)	বর্ণ	প্রতিসরাঙ্ক (Refractive index)	বৈশিষ্ট্য
হীরা (Diamond)	কারবন	C	৩·৫২	স্বচ্ছ	২·৪২	এর আলো বিচ্ছুরণের মান ০·০৬৩; হীরে কাটার পর নানা রঙের বিচ্ছুরণে অপূর্ব মনোরম রঙ দেখা যায়। এটি খনিজ পদার্থ।
চুনি (Ruby) নীলা (Blue Sapphire)	কোরাণ্ডাম (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড)	Al_2O_3	৩·৯—৪·১	লাল, নীল, হলুদ	১·৭৭	অল্প পরিমাণ লোহা, টাইটানিয়াম অথবা ক্রোমিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতি একে বিভিন্ন রূপ দেয়—পীতাম্বর, নীলা, রক্তমুখী নীলা ইত্যাদি। এটি খনিজ পদার্থ।
পান্না (Emerald)	বেরিল (বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট)	$3BeO.Al_2O_3, 6SiO_2$	২·৬—২·৮	স্বচ্ছ, সবুজ	১·৫৮	খনিজ পদার্থ। শুধু বেরিল বর্ণহীন, ক্রোমিয়াম অক্সাইড সামান্য পরিমাণ থাকলে সবুজ পান্না পাওয়া যায়।

রত্নের নাম	খনিজ/ বৈজ্ঞানিক নাম	রাসায়নিক সংকেত পরিচয়	আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gr.)	বর্ণ	প্রতিসরাঙ্ক	বৈশিষ্ট্য
বৈদুর্য মণি (Cat's eye)	ক্রাইসোবেরিল (বেরিলিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম-এর মিশ্র অক্সাইড)	$BeO.Al_2O_3$	৩·৫—৩·৮	হলুদ, সবুজ খয়েরী	১·৭৫	খনিজ পদার্থ।
গোমেদ	গারনেট (একটি দ্বিযোজী ধাতু এবং একটি ত্রিযোজী ধাতুর মিশ্র সিলিকেট)	$3MgO/CaO/ MnO.Fe_2O_3/ Cr_2O_3/Al_2O_3$ $3SiO_2$	৩·৪—৪·৩	লাল, বাদামী, কমলা	১·৭০—১·৮৯	খনিজ পদার্থ। বিভিন্ন ধাতুর সমন্বয়ে এদের বর্ণ ও রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তিত হয়।
চন্দ্রকান্ত মণি (Moon Stone) সূর্যকান্ত মণি (Sun Stone)	ফেলসপার (সোডিয়াম/ ক্যালসিয়াম/পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট)	$CaO/Na_2O,$ $K_2O.Al_2O_3$ $4/6\ SiO_2$	২·৬—২·৮	ধূসর	১·৫৩—১·৫৮	খনিজ পদার্থ।
পোখরাজ (Sapphire)	টোপাজ (অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট)	$Al_2SiO_4(OH/F)_2$	৩·৪—৩ ৬	স্বচ্ছ, হালকা হলুদ, হালকা নীল	১·৬৩	খনিজ পদার্থ।

রত্নের নাম	খনিজ/ বৈজ্ঞানিক নাম	রাসায়নিক সংকেত পরিচয়	আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gr.)	বর্ণ	প্রতিসরাঙ্ক	বৈশিষ্ট্য
নীলকান্ত মণি বা তুরস্ক মণি	টারকোয়েস (কপার অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট)	$CuO\ 3Al_2O_3\ 2P_2O_5 9H_2O$		অস্বচ্ছ নীল ও নীলাভ সবুজ	১'৬২	খনিজ পদার্থ।
বৈক্রান্ত মণি	জারকন (জারকোনিয়াম সিলিকেট)	$ZrO_2.SiO_2$	৪'৭	অস্বচ্ছ	১'৯৪	খনিজ পদার্থ।
উপল	ওপাল	$SiO_2 nH_2O$	১'৯—২'২	দুধের মতো সাদা ও জ্যোতির্ময়	১'৪১	খনিজ পদার্থ।
মুক্তা (Pearl)	পার্ল (পটাসিয়াম বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট)	K_2CO_3 বা $CaCO_3$	১'১—১'৪	সাদা		ঝিনুকের মধ্যে কণা ঢুকে গেলে তার চারপাশে লালা জমতে থাকে ; ক্রমে গোল ও শক্ত মুক্তো পাওয়া যায়। এটি একটি সমুদ্রজ পদার্থ।
প্রবাল বা পলা	কোরাল (ক্যালসিয়াম কার্বনেট)	$CaCO_3$	২'৭	গাঢ় রক্তবর্ণ, হলুদাভ রক্তবর্ণ, গেরুয়া সাদা		সমুদ্রজ পদার্থ।

সূত্র : ১. ভারতের খনিজ সম্পদ : দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃষ্ঠা ২০২, ১৯৭৮ ২. Handbook of Chemistry : Langaya

রোগ সারাতে ধাতুরত্ন

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের নাম আপনারা সকলেই শুনেছেন আর শুনেছেন তার যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা—পদার্থ অর্থাৎ ম্যাটার-এর অসীম শক্তির কথা। এই সত্যকে আজ আর কারো পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি একে একে আটটি ধাতু অর্থাৎ ম্যাটারকে একসাথে মিলিয়ে তৈরি করেছি এই অষ্টধাতুর মাদুলী। এই মাদুলীর রোগ সারানোর আশ্চর্য ক্ষমতার প্রমাণ আপনারা অনেকেই পেয়েছেন।..." ট্রেন কম্পার্টমেণ্ট বা স্টেশনের বাইরে এই 'বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক' আলোচনা শোনার সৌভাগ্য শিয়ালদহ লাইনের নিত্যযাত্রীদের অনেকেরই হয়েছে।

স্টেশন এলাকার বাইরে বেরোলেই চোখে পড়বে—'প্রখ্যাত জ্যোতিষার্ণব অমুক জুয়েলার্সে বসে সঠিক গ্রহরত্ন ধারণের মাধ্যমে সৌভাগ্যলাভ বা কঠিন রোগমুক্তির সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন।' রাস্তার ধারে সোজা এগিয়ে গেলে পাবেন —'আসল ঘোড়ার নালের তৈরি আংটি। আগুন ছাড়া তৈরি বিশেষ গুণসম্পন্ন আংটির দাম ডবল—ধারণে বিভিন্ন রোগমুক্তির গ্যারান্টি।' অফিসপাড়া বি বা দী বাগ এলাকায় পাওয়া যাবে বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ; কোন অশুভ গ্রহের প্রভাবে আপনি রোগে ভুগছেন, তার থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার বিশের গ্রহরত্নের (যেমন হীরে, পান্না, প্রবাল) কিংবা পরিবর্তে ধাতু (যেমন সীসা, তামা), আর তারও বিকল্পে আছে নানান গাছের শিকড়। আপনার আর্থিক সংগতির কথা বিবেচনা করেই এই বিকল্প ব্যবস্থা—কোন্‌টা সেবেন সে পছন্দ আপনার। আপনার অসুখ, কাজেই ধাতু না ঘোড়ার নাল নেবেন, নাকি গাছ-গাছড়ার শেকড়ের মাদুলীর সাহায্যে সারাবেন, সেটা একান্তভাবে আপনার ওপরই নির্ভর করছে।

অসুখ সারানোর জন্য বা অসুখ না হবার জন্য কোন্ পদ্ধতি আপনি বেছে নেবেন সেটা অনেকটাই নির্ভর করে অসুখ কেন হয় সে সম্পর্কে আপনার ধারণা বা জ্ঞানের ওপর। কারও মতে অসুখের কারণ দেবতার বা আত্মার (গ্রামাঞ্চলে বোঙ্গা) রোষ। এই মতে যারা বিশ্বাস করেন তারা দেবতার রোষ নিবারণের বিভিন্ন উপায় খোঁজেন পূজা-আর্চা, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

এরা যে সকলেই অজ্ঞ এমন কথা কেউ বলবে না। তথাকথিত শিক্ষিত লোকের অনেকেই এই পথের পথিক। যারা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন তাদের মতে রোগের কারণ হলো গ্রহের ফের। জন্মের সময় ও স্থানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় ঠিকুজি-কোষ্ঠী। এর থেকে নাকি জানা যায় কোন ব্যক্তির ওপর কোন্ গ্রহের প্রভাব কতটা; কিন্তু এর পরের ব্যাপারটা নিয়ে জ্যোতিষীদের মধ্যে পরিষ্কার দুটো মত চালু আছে। একালের (নিয়তিবাদী) মত—মানুষের, সেই সঙ্গে পৃথিবীর সবকিছুরই, ভাগ্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির সাথে সাথেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে—কোন কিছুতেই তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। যা হবার তা হবেই। অন্যদলের মতে, মানুষের ভাগ্য (অসুখ-বিসুখ সমেত)-পরিবর্তন সম্ভব। দুর্বল ক্ষতিকারক অশুভ গ্রহের প্রভাব থেকে জাতককে বাঁচাবার জন্যে তারা উপযুক্ত গ্রহ-রত্ন ধারণের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। তাদের এই ব্যবস্থাপত্র preventive (প্রতিষেধক) বা curative (নিরাময়কারী) দু-রকমেরই হতে পারে। যেমন—রবিগ্রহের কমতির জন্যে ভবিষ্যতে আপনার হার্টের অসুখ হতে পারে, এক্ষেত্রে তারা হয়ত নীলা ধারণের পরামর্শ দেবেন। আবার হয়ত আপনি বর্তমানে পেটের গণ্ডগোলে ভুগছেন, খুব সম্ভবত আপনার কোষ্ঠীতে মঙ্গলের ঘাটতি ধরা পড়বে, এর জন্য আপনাকে প্রবাল (পলা) ধারণের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হবে যাতে আপনার পেটের ব্যাধি নিরাময় হয়। এইভাবে সামান্য দুর্বলতা থেকে শুরু করে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ পর্যন্ত—সবকিছুর জন্যই এক বা একাধিক গ্রহরত্ন (দামী পাথর) ধারণের ব্যবস্থা দেওয়া যেতে পারে। ধারণ করবারও নিয়ম আছে। কোন পাথর পরতে হবে ডানহাতের তর্জনীতে, আবার অন্য পাথরের বেলায় হয়ত দরকার বাঁ হাতের বাহুতে। গ্রহ প্রভাবের মাত্রার কমবেশি অনুসারে পাথরের ওজনও (রতি হিসাবে) ঠিক করে দেন জ্যোতিষীরা।

জ্যোতিষী ছাড়া আরেকদল বিশেষজ্ঞও পাথর বা স্টোন দিয়ে রোগ সারাবার ব্যবস্থা করে থাকেন—যাদের বলা হয় রত্ন-চিকিৎসক (Gem Therapist)।[১] এদের প্রণালী যতটা (অপ-) বৈজ্ঞানিক ততটাই রোমাঞ্চকর। এরা ধর্মগ্রন্থ—যেমন বাইবেল, কূর্মপুরাণ ইত্যাদি ঘেঁটে বের করেছেন যে রামধনু হলো ভগবানের মহিমার প্রকাশ; রামধনুর মাধ্যমে ভগবান তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জগৎবাসীদের সজাগ করে দিয়ে থাকেন। এই রত্ন-চিকিৎসকদের মতে রামধনু হলো মহাজাগতিক (Cosmic) সাতটি রশ্মির সমন্বয়। পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের ওপর এর প্রচণ্ড প্রভাব। মানুষের শরীরে সাতটি স্নায়ুচক্র বিদ্যমান। রামধনুর সাতটি রঙ মহাজাগতিক রশ্মির মাধ্যমে এই স্নায়ুচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করছে। মানুষ যতদিন

পর্যন্ত এই সাতটি রশ্মিকে গ্রহণ করতে পারে ততদিন সুস্থ থাকে কিন্তু কোন কারণে যদি এক বা একাধিক রঙ গ্রহণ করতে অক্ষম হয় তখন তার দেহ ও মন নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই স্ব-ঘোষিত 'বৈজ্ঞানিকে'র দল গবেষণার (?) মাধ্যমে নাকি জানতে পেরেছেন (যদিও এদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন তত্ত্ব, বা যুক্তির স্তরেও কোন প্রামাণ্য সূত্র এরা দেন না, দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না)—কোন্ রঙের ঘাটতিতে কোন্ অসুখ হয়। যেমন, নীল রঙের ঘাটতি হলে মৃগীরোগ হবে, হলুদ রঙের অভাবে দেখা দেবে অর্শরোগ; অর্থাৎ তারা পৃথিবীর সব অসুখকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন। অসুখের চিকিৎসাও খুবই সরলীকৃত। রঙের ঘাটতি অনুসারে সেই রঙটি দেহে সরবরাহ করলেই ব্যাধিমুক্তি সম্ভব! লালরঙের অভাবে যদি রোগটি হয়ে থাকে তবে তাকে লাল-রশ্মি বের হয় এমন পাথর অর্থাৎ চুনী পরতে হবে, আবার হলুদের অভাব হলে (ঐ চিকিৎসকদের বিধান অনুযায়ী অর্শরোগ) যে পাথরের মধ্যে দিয়ে হলুদ-রশ্মি বের হয়, যেমন প্রবাল (পলা), সেটা ধারণ করতে বলা হবে। আগেই বলেছি, এদের বিচিত্র প্রণালীতে বৈপ্লবিক চমক রয়েছে, কাজেই অসুখের চিকিৎসায় এরা কেবল রঙীন পাথর ধারণ করতে বলেই ক্ষান্ত হন না, এদের চিকিৎসা-পদ্ধতির আর একটা দিকও আছে। প্রয়োজনীয় রঙীন পাথরটি সুরাসারে নির্দিষ্ট সময় ধরে ভিজিয়ে রাখলে ঐ সুরাসার পাথরটির মহাজাগতিক রশ্মির রঙ শুষে (absorption) নেবে। তারপর ঐ সুরাসার হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত সুগার অফ মিল্ক-এ শোষণ করে নিয়ে সেই বটিকা নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করলেও পাথর ধারণ করার মতো একই ফললাভ হবে।[২]

জ্যোতিষীর দেওয়া হোক বা কুশলী 'রত্ন-চিকিৎসকে'রই দেওয়া হোক, এই সব পাথর বা গ্রহরত্ন রোগপ্রতিষেধ বা নিরাময়ে কতটা কার্যকর বা এইসব চিকিৎসা-পদ্ধতি কতটা বিজ্ঞানসম্মত বা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কিনা সেটা জানা দরকার। পাথর ধারণ করে যদি সত্যিই রোগ সারে (যা অনেকের বিশ্বাস) তবে দেখতে হবে পাথর তার দ্রব্যগুণে রোগ সারায় না স্তোক বা suggestion-এর ফলে রোগ সারে।[৩] যদি মনে করা যায়, পাথর তার দ্রব্যগুণে রোগ সারায় তবে দ্রব্যগুণের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে শরীরের কোষ বা রক্তে পাথরটি যে পদার্থ দ্বারা গঠিত তার উপস্থিতি পরিমাপযোগ্য হতে হবে। বিভিন্ন পাথর কেলাসিত (crystallised) অবস্থায় থাকে। কোষের মধ্যে বা রক্তে পাথরের কেলাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয় নি। কোন বস্তু দ্রব্যগুণের মাধ্যমে রোগ সারায় কি না তা জানার আর একটি সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি হলো 'Double blind controlled

study'। এই পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে জানা যায় যে, কোন বস্তুর প্রয়োগে নিশ্চিতভাবে রোগমুক্তি ঘটলে সেই বস্তু ও রোগমুক্তির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ কোথায়। পাথর-ধারণ ও রোগমুক্তি নিয়ে এ ধরনের কোন পরীক্ষা আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে জানা যায় নি। কেউ এই পদ্ধতি প্রয়োগে আলোচ্য প্রাচীন গুহ্য-বিদ্যার সপক্ষে প্রমাণ রাখলে বিজ্ঞানই উপকৃত হবে সবচেয়ে বেশি; কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না।

রোগ সারানোর অন্য পদ্ধতি হলো স্তোক বা suggestion। এখানে দ্রব্যগুণের ভূমিকা নেই। আলোচনার প্রয়োজনে আমরা যদি ধরে নিই যে, পাথর এই প্রক্রিয়ায় রোগ নিরাময় করে তবে সেখানে পাথরের কোন বিশেষ ভূমিকা দাবি করা যেতে পারে না, কেননা সেক্ষেত্রে পাথরের মতো দেখতে নকল পাথর হাতে পরলেও রোগ নিরাময় হবে।[৪] কিন্তু কোন জ্যোতিষী বা রত্ন-বিশেষজ্ঞ নকল পাথরের রোগ নিরাময় ক্ষমতায় আস্থাশীল নন। সুতরাং মানতে হয় পাথরের রোগ সারাবার বিজ্ঞান সমর্থিত ক্ষমতা নেই। প্রকৃতপক্ষে ভূতে বিশ্বাস; ভগবানে বিশ্বাস, বাবা, ঠাকুর বা মায়ের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস এবং পাথর ধারণের উপকারে বিশ্বাস সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তা নিয়ে আর যাই হোক, ফলপ্রসূ কোন সুস্থ বিতর্ক চলে না।

সূত্র :

১, ২. Gem Therapy: Benoytosh Bhattacharya, Firma K. L. Mukhopadhyaya Publishers, 1971

৩, ৪. The word as a physiological and therapeutic factor : K. L. Platanov, Foreign Language Publishing House, 1959 এবং পরশুরাম গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৩৬; ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা

পীযূষকান্তি সরকার

'দেহের উপর গ্রহের প্রভাব' ও সুশ্রুত

কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী এলাকার পথের পাশে প্রায়ই দেখা যায়, কিছু সবুজ ডালপালা বা শিকড় নিয়ে, মলিন পোশাকে, বিক্রেতা বসে আছে। কারো কারো পসরার সামনে ছোটো বোর্ডে বিভিন্ন 'গ্রহ' ও তার 'শান্তির জন্য' লতা-পাতার নাম লেখা থাকে—কখনো তার সাথে 'গ্রহরত্নে'র নামও। মিলিয়ে দেখলে দেখা যায়, এরা সবাই একই রকম 'গ্রহশান্তি'র লতাপাতার নাম বলেন। যেমন —মঙ্গলের জন্য অনন্তমূল বা শনির জন্য শ্বেতদ্রোণ। বিক্রেতারা গরীব—দামী রত্ন বেচতে পারে না। অথচ এই লতাপাতা মোটেই রত্নের বিকল্প বলা যায় না। যেমন—'শ্বেতদ্রোণ' গাছের ডালপাতায় হাঁপানীর রোগীরা উপকার পায়। উল্টো করে বললে—হাঁপানী রোগটাই শনিগ্রহ !

বিক্রেতাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলে দেখেছি—এরা রোগের নাম বললে বেছে দিতে পারে 'গ্রহশান্তি' লতাপাতা বা রোগের ওষুধ। শ্লেমা অত্যধিক হলে 'রামবাসক' পাতা। সরল চিকিৎসা।

এখনকার নবগ্রহের নামের সাথে রত্নব্যবসায়ীরা যে-ব্যাখ্যাই জুড়ে দিক না কেন—সত্যিই প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নবগ্রহ অর্থে নয়টি রোগ বোঝানো হতো। আর তার চিকিৎসা বলতে, লতাপাতা ও নিয়মকানুনের ব্যবহার করা হতো। কেন 'গ্রহরত্ন' চালু হলো সেটা অন্য প্রসঙ্গ। প্রায় দু-হাজার বছর আগেও দেহের ওপর 'গ্রহের প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনায় অজ্ঞতা ছিল বটে, কিন্তু রত্নব্যবসার মতো কু-সংস্কারের ব্যবসা ছিল না।

সুশ্রুত ও নবগ্রহ

প্রাচীন ভারতের শারীরবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শল্য-চিকিৎসার বিশদ গ্রন্থ বলতে 'সুশ্রুত-সংহিতা'। এই ছাড়া আছে 'চরক-সংহিতা'। অপর গ্রন্থ 'ভেলসংহিতা' অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিমাত্র। এ তিনটিই বেশি প্রাচীন।

সুশ্রুতের নিজের সময়কাল অনেকে বলেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। সুশ্রুতের নিজস্ব সংহিতা সম্ভবত পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল। পরে অপর কোনো ব্যক্তি 'উত্তরতন্ত্রম্' নামে একটি ষষ্ঠ অংশ যোগ করে সমগ্র 'সুশ্রুত-সংহিতা' সম্পাদনা

করেন। মনে হয় এই 'সুশ্রুত-সংহিতা', সম্পাদিত আকারে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে পাওয়া যেত। 'উত্তরতন্ত্রম্' যার লেখাই হোক—নিজেকে সে-ও 'সুশ্রুত' বলে পরিচয় দিত। আর তার সমস্ত কথা যেন 'ভগবান ধন্বন্তরির'র কাছেই শোনা—'যথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরি'! আমাদের কাছে এই অংশটির লেখকও সুশ্রুত। আমাদের আলোচ্য এই 'উত্তরতন্ত্রম্'—যেখানে এমন সব বিষয়ে আলোচনা আছে যেগুলো পূর্ববর্তী পাঁচটি অংশে নেই।

জন্মের মুহূর্তে না হলেও—খুব অল্পবয়সী সন্তানের ওপর ন-টি গ্রহের প্রভাব পড়তে পারে। সুশ্রুত বর্ণিত ন-টি গ্রহ হলো – স্কন্দ, স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পুতনা, অন্ধপুতনা, শীতপুতনা, মুখমণ্ডিকা আর নৈগমেষ। উত্তরতন্ত্রের সপ্তবিংশতি অধ্যায় পুরোটাই এই নবগ্রহের দুষ্ট-প্রভাবের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা—যার আধুনিক ব্যাখ্যায় পরে আসছি।

সুশ্রুত শুধু 'গ্রহ' কথাটা ব্যবহার করেছেন—কোনো রোগের কারণ হিসাবেই। এই ন-টি গ্রহ, গ্রহরত্ন ধারণের 'নবগ্রহ' নয়। যেটা আরো স্পষ্ট হয় 'গ্রহার্তলক্ষণম্' বা রোগের লক্ষণ (Symptom) সম্পর্কে সুশ্রুতের আলোচনা পড়লে। সুশ্রুত কখনো মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব দেখাতে চান নি। বরঞ্চ প্রায় দু-হাজার বছর আগে জীবাণু সম্পর্কে বা ব্যাধির কার্যকারণ সম্পর্কে ধারণার অভাববোধ থেকেই সুশ্রুতের নবগ্রহ।

পরবর্তী ন-টি অধ্যায় (আটাশ থেকে ছত্রিশ) পুরোটাই বিস্তৃত আলোচনা—প্রত্যেকটি গ্রহের 'গ্রহপ্রতিষেধ' সম্পর্কে। এখানেও সুশ্রুত ভেষজবিজ্ঞানের সরল ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন। যেমন স্কন্দগ্রহে আক্রান্তের জন্য—

> দেবদারুণি রাস্নায়াং মধুরেণ্, দ্রুমেষু চ।
> সিদ্ধাং সর্পিশ্চ সক্ষীরং পানমস্মৈ প্রয়োজয়েৎ ॥ ২৮·৩ ॥

বা রেবতীগ্রহে—

> অশ্বগন্ধা অজশৃঙ্গী চ সারিবা সপুননাবা।
> সহে তথা বিদারী চ কষায়া সেচনে হিতা ॥ ৩১·৩ ॥

কখনো পাতা, লতার রস, তার সাথে কিছু মিশিয়ে মধু দিয়ে বা কখনো সামান্য গরমে মিশ্রন প্রস্তুত করেই সুশ্রুত বর্ণিত 'গ্রহপ্রতিষেধ'। ধূপ, ধুনো, পুজোর কথা সুশ্রুত লিখেছেন—প্রতিটি প্রতিষেধ বিষয়ে আলোচনার শেষে। স্পষ্ট উদ্দেশ্যেও কখনো লেখা আছে—সন্তানের মঙ্গলার্থে।

প্রতিষেধ করলে কি হয়? রোগ শান্ত হয়। 'গ্রহশান্তি' নয়, সুশ্রুতের ভাষায় 'হিত' বা শান্ত হয়। যেমন—'স্কন্দাপস্মারশান্তয়ে' ২৯·৩। সুশ্রুত বর্ণিত

গ্রহ যেন যন্ত্রণা, জ্বালা বা কষ্টের নামান্তর। ওষুধ ব্যবহারে—'হিতাঃ' বা 'হিতম্'।

সুশ্রুতের 'গ্রহ' মোটেই সাধুবাবাদের কার্যসিদ্ধিতে সাহায্য করে না। বরঞ্চ এটা 'বৈদ্য' সম্পর্কিত ব্যাপার। যেমন—

শকুন্যাভিপরীতস্য কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা ॥ ৩০·৩ ॥

এর পরের অধ্যায়ে (সাঁইত্রিশতম) সুশ্রুত আপাতত গ্রহ সম্পর্কে শেষ আলোচনাটুকু সেরেছেন। সে-সময়ের সীমাবদ্ধতা এখানেই বেশি করে প্রকট। প্রাচীন ইউরোপেও এই সীমাবদ্ধতার ফলে মদ বা Spirit-এর নাম আত্মা বা Spirit নামেই বলা হতো। মদের মধ্যেই হয়তো অশরীরী আত্মা লুকানো আছে, পান করলে দেহের মধ্যে ঢুকে মাতাল করে দেয়। এ-যুগে এ-কথা বিশ্বাস করার কারণ নেই। সুশ্রুত ব্যাখ্যা করতে গেছেন—কেন শিশুদেহে গ্রহ ভর করে। কারণের মধ্যে সত্যিই তো আছে, নোংরাভাবে নোংরা পরিবেশে শিশুকে রাখা। এতো সত্ত্বেও সুশ্রুত 'গ্রহ' ব্যাপারটাকে একটা নিরাকার দুষ্ট শক্তি হিসাবেই দেখিয়েছেন —রোগের অদৃশ্য কারণকে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। সুশ্রুতের 'নবগ্রহ' অন্তত্ দুটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমত, লক্ষণগুলো আধুনিককালেও রোগের সাথে তুলনা করা সম্ভব; দ্বিতীয়ত, লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধের ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ভেষজবিজ্ঞানের চর্চা রয়েছে।

সুশ্রুতের 'গ্রহ' ও আধুনিক বিজ্ঞান

আলাদা করে প্রতিটি 'গ্রহ'-আক্রান্ত শিশুর বর্ণনা সুশ্রুত বিশদ করেই দিয়েছেন। আর আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে দেখা গেছে, এগুলো প্রত্যেকটিই কঠিন বা স্বাভাবিক শিশুরোগ। লক্ষণগুলোকে তাই তুলনা করা হয়েছে এ রকম—

স্কন্দগ্রহ—Convulsion, Cerebrospinal Meningitis, Encephalitis। জানা ছিল অনিবার্যভাবেই শিশুটি পঙ্গু হয়ে যেতে পারে বা মারা যেতে পারে।

স্কন্দাপস্মারগ্রহ—Basal Meningitis, Encephalitis, Tetany। মেনিঞ্জাইটিস বা এনসেফ্যালাইটিস ঠিক স্কন্দগ্রহের মতোই পঙ্গুত্ব বা মৃত্যুর কারণ হয়।

শকুনীগ্রহ—Chicken Pox বা জল বসন্ত, Erysipelas রোগের লক্ষণ।

রেবতীগ্রহ—Green Diarrhoea, Dysentry বা আমাশয়, এবং বদ্‌হজমের লক্ষণ।

পুতনাগ্রহ—Diarrhoea, শিশুদের কলেরা এবং তীব্র বদ্‌হজমের লক্ষণ।

অন্ধপুতনাগ্রহ—হাম এবং Scarlet Fever-এর লক্ষণ।

শীতপুতনাগ্রহ—শিশুদের কলেরার লক্ষণ।

মুখমণ্ডিকাগ্রহ—Cirrhosis of Liver-এর লক্ষণ।

নৈগমেষগ্রহ—Peritonitis-এর লক্ষণ।

এখানে লক্ষণগুলোর বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বেশ অবাক হয় সুশ্রুতের 'গ্রহ' সম্পর্কে আলোচনার এই বিস্তার দেখে। অবাক লাগে 'পেরিটোনাইটিস'-এর মতো তলপেটের অভ্যন্তরের রোগের শুধু লক্ষণ নয় চিকিৎসা পর্যন্ত জানা ছিল। একই কথা বলতে হয় 'সিরোসিস' বা ক্ষতিগ্রস্ত যকৃতের রোগ সম্পর্কে। উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত শিশুরোগের লক্ষণ নিয়ে সুশ্রুতের 'নবগ্রহ।'

গ্রহ প্রতিষেধ নিয়ে কিছু কথা

যখন প্রমাণ হয়ে যায় সুশ্রুতের নবগ্রহ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নয়, এই গ্রহের চরিত্র রোগের কারণের চরিত্র, এই গ্রহের প্রভাব হলো রোগের লক্ষণ—তখনও আরো একটু আলোচনা বাকি থাকে।

সুশ্রুত রত্নধারণ করতে বলেন নি—ওষুধ খেতে ও নিয়ম পালন করতে বলেছেন। ওষুধগুলো কাজের কি না সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ। তবু ওষুধ ছিল—এমন কি দুরারোগ্য এনসেফ্যালাইটিস-এরও। সুশ্রুতের ওষুধের বেশির ভাগটাই বনৌষধি বা লতাপাতা। বেল, শিরীষ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরাট তালিকা। এসব জানলে বুঝলে বলা যায়—

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানী সুশ্রুত রোগ ও প্রতিষেধ উভয় বিষয়েই গ্রহরত্ন ব্যবসায়ীদের বিপদে ফেলবেন।

বোঝা যায়—সুশ্রুতের মতো কোনো একটি জনপ্রিয় ধারা অনুসরণ করে এখন 'গ্রহশান্তি'র জন্য লতাপাতা বিক্রি হয়—পথের পাশে। এক সময় সত্যিই হয়তো ঝোপেঝাড়ে, গ্রামের পাশে, মিলতো এই 'গ্রহশান্তি'।

আবশ্যিক তথ্যসূত্র :

১. সুশ্রুত সংহিতা : নারায়ণরাম আচার্য সম্পাদিত (নির্ণয়-সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৪৫)

২. Ancient Indian Medicine; by P. Kutumbiah (Orient Longman, Bombay, 1947)

সৌমেন গুহ

একটি কেস স্টাডি

বাতব্যাধি, বিদ্যুৎ ও ব্যানার্জিবাবু

দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ইঞ্জিনিয়ার ব্যানার্জিবাবু গত প্রায় বছর বারো ধরে কোমর আর পিঠের যন্ত্রণায় ভুগছেন। ওষুধপত্র, বেল্ট, ব্যায়াম ইত্যাদি অনেক কিছুই করেছেন। যন্ত্রণা মাঝে মাঝে একটু কমলেও আবার বাড়ে এবং ক্রমশ যেন বাড়ছেই। এমনি সময়ে এক বন্ধুর পরামর্শে তামার একটি বালা তিনি ধারণ করলেন—বিশ্বাস, তামা এই ধরনের বাত-ব্যথা কমিয়ে দেয়। অবশ্য সে তামার বালাটি সাধারণ বালা নয়—এতে নাকি ইলেকট্রিক চার্জ দেওয়া রয়েছে। বড় বড় ট্রান্সমিটার থেকে বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে যায় যে ইলেকট্রিক তার (wire) সেই তার কোন কারণে কাটা হলে সেটির একটি টুকরো সংগ্রহ করতে হয়েছে—তারপর তাকে মাটিতে না ঠেকিয়ে (যাতে 'আর্থ' না হয়ে যায়) বালার মতো করে পরতে হয়েছে। অর্থাৎ জিনিসটি দুষ্প্রাপ্য সন্দেহ নেই। বিশ্বাস, ঐ 'তারের মধ্যের বিদ্যুৎ-শক্তি' এবং তামার ধাতুগুণ—দুয়ে মিলে শরীরের ব্যথা-বেদনা শুষে নেয়। ব্যানার্জিবাবুকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এটি ধারণ করার ফলে তার ব্যথাবেদনার কিছু উপশম বুঝছেন না, তবু বছরকয়েক ধরে তিনি এটা ধারণ করে আছেন—যদি কিছু হয়, ক্ষতি তো করছে না।

এ ধরনের তামা, দস্তা, লোহার বালা, মাদুলি, আংটি অনেকেই ধারণ করেন রোগমুক্তির আশায়। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

ব্যানার্জিবাবুর বিদ্যুৎ-শক্তিযুক্ত তামার ধাতুগুণের কথাই ধরা যাক। মূল বিদ্যুৎপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি তামার তারের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে কি? না, আদৌ থাকে না। পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন কণিকার প্রবাহ-ই ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ! এরজন্য দুই তড়িৎমেরুর সংযোগকারী অবিচ্ছিন্ন বর্তনী (circuit) থাকা প্রয়োজন হয়, এই বর্তনী ছিন্ন হলেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়, ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির যোগানও বন্ধ হয়ে যায়। 'আর্থ' (earth) না করে বালা পরার ব্যাপারটিও হাস্যকর, কারণ হাতে ছোঁয়ামাত্রই তারটি 'আর্থ' হয়ে যায়, ব্যানার্জিবাবু তো মাটির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছেন। আর circuit

থেকে বিচ্ছিন্ন একটি তামার তারের টুকরোর এমন কোন পরিবর্তন ঘটে বলে বৈজ্ঞানিকভাবে জানা যায় নি যা ধাতুখণ্ডটিকে এমন কোন গুণ দিতে পারে যা বাতের ব্যথা-বেদনার ক্ষেত্রে তাকে কার্যকর করে তুলতে পারে। আসলে, ধাতু ও বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পর্কে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিরই এক ধরনের সম্ভ্রম থাকায় তারা মনে ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবকিছুই বোধহয় দারুণ একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে। তাই ব্যানার্জিবাবুর মতো ইঞ্জিনিয়ারও রোগ যন্ত্রণায় মরিয়া হয়ে, কোন কিছু না ভেবে, শোনা কথার ওপর নির্ভর করে ঐ তারের বালা ধারণ করেছেন।

ভবানীপ্রসাদ সাহু

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

অপবিজ্ঞান হটানো বড় কঠিন কাজ

বাহুতে তামার বালা

আজকাল অনেককেই দেখা যায়, হাতে একটা করে তামার বালার মতন পরে থাকতে। উদ্দেশ্য, বাত-ব্যথা ইত্যাদি নানারকম রোগ নিরাময়। জিজ্ঞাসা করলে শোনা যায় কোন হিতৈষী বন্ধু বা পরিচিত-অপরিচিত কোন গুণী ব্যক্তি 'ধারণ' করতে দিয়েছেন রোগ উপশমের নিশ্চিত আশ্বাস জানিয়ে! আরো জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় সত্যিই নাকি বাত-ব্যথা সেরেছে কারুর কারুর এই তামা-ধারণে।

বিজ্ঞানের যুগ এখন। তাই বিজ্ঞান ছাড়া শিক্ষিত মানুষ চট করে কোন কিছু বিশ্বাস করতে চায় না; বিজ্ঞানের কথাবার্তা শুনলে তবে নিশ্চিন্ত বোধ করে। তামা ধারণের বৈজ্ঞানিক এক ব্যাখ্যা তাই চালু হয়েছে বাজারে। হয়ে ব্যাপারটাকে নিছক তাবিজ-কবজ-মাদুলি ধারণের থেকে আলাদা এক তাৎপর্য দিয়েছে। ব্যাখ্যা দু-রকম। এক, তামার বালা নাকি তৈরি হয়েছে ট্রাকশনের তার থেকে, যার ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে 'হাই কারেন্ট'। এই হাই কারেন্টে

তামার তারে 'এমন একটা কিছু হয়' যার ফলে নাকি তামার নিজস্ব গুণ যায় পাল্টে। এই 'একটা কিছু' যে কি সেটা কিন্তু হাজার খোঁচাখুঁচি করেও আর জানা যায় না। যেন যথেষ্ট 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি' পেয়ে গেছে তামা ধারণেচ্ছু মানুষ, আর বেশি অনুসন্ধিৎসায় আগ্রহ নেই তার। ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়েছে শরীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি দিয়ে। মানুষের দেহে যে সমস্ত মৌল অত্যন্ত কম পরিমাণে হলেও অত্যাবশ্যক, তার ভিতর তামা একটা। বালা থেকে নিশ্চয়ই তামা 'শোষিত' বা 'অ্যাবসরবড' হয়ে সেই প্রয়োজন মেটায়, ঝেঁটিয়ে বিদায় করে রোগ-শোক। শুধু বিজ্ঞানই নয়, ইংরেজী পরিভাষা সহযোগে ব্যাখ্যার মাহাত্ম্যে মানুষের নির্ভরতা বাড়ে তামার বালার ওপর। কলকাতার এক জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের রসায়নবিদ্ কর্মকর্তাকে বিতরণ করতে শুনেছি এই ব্যাখ্যা।

তাহলে দাঁড়াল এই, হাই কারেণ্টের ফলে তামার ভিতর এমন একটা কিছু হয় যার ফলে তামা সহজেই শরীরে অ্যাবসরবড (শোষিত) হয়ে রোগ সারায়! যারা সংশয় প্রকাশ করেন ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে, তাদেরকে চালেঞ্জ জানানো হয় —প্রমাণ করে দাও দেখি ব্যাখ্যা ভুল, অপ্রমাণ কর এই বক্তব্যকে! সংশয়বাদীরা আর বেশি ঘাঁটায় না! অনুকম্পার হাসি হাসেন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। হৈ হৈ করে ওঠে সমর্থকরা—'আমাদের মাস্টার জিতেছে'।

কোন একটা ঘটনা আদৌ ঘটে কি-না, ঘটলে কেন ঘটে, তার বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ আর তত্ত্ব গঠনের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। এই প্রক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য স্মরণ করাতে চাই। কোন একটা অনুমান হাজির করলেই সেটা সঠিক তত্ত্ব হিসেবে গ্রাহ্য হয় না। যতক্ষণ না সেই অনুমান পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ সেটাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতি দেবার অধিকার থাকে না কারুরই। তামার বালার বেলায় কিন্তু প্রক্রিয়াটা গেল উল্টে। কয়েকটা আবছা অনুমান একসঙ্গে জুড়ে যে-জিনিসটা দাঁড়াল তাকেই হাজির করা হলো ব্যাখ্যা হিসাবে। সেই 'ব্যাখ্যা' প্রমাণের কোন দায়িত্বই আর নিতে রাজি নয় অনুমানকারীরা, কারণ শিক্ষিত লোকরাও বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে তাদের ব্যাখ্যা—কুসংস্কার সমর্থনের পাপবোধবর্জিত হয়ে ধারণ করছে তামার বালা। উল্টে এবারে সংশয়বাদীদেরই বলা হলো এই ব্যাখ্যা **অপ্রমাণ** করতে। নিছক কোন অনুমান বা অন্ধবিশ্বাসকে অপ্রমাণ করতে কে আর এগোয়। ব্যস্, উদ্দেশ্য সিদ্ধ। আসলে অপ্রমাণের দায়িত্ব নেওয়ার মতো উৎসাহ বা সময় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানকর্মীদের হওয়া মুশকিল, কেননা কাজটা মোটেই সহজ নয়। কেন সহজ নয়, বলছি।

এক, বলা হচ্ছে, হাই কারেণ্টের ফলে তামার তারে কিছু একটা হয়। কিন্তু এই 'কিছু একটা' যে কি সেটা রাখা হচ্ছে উহ্য। এখন ধাতুর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ কেন হয়, কিভাবে হয় সে-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা দিব্যি ওয়াকিবহাল। তামার বালা যারা বিলোচ্ছে তাদের ক'জন এর ছিটেফোঁটাও জানে সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। জানা আছে, ধাতুর ভেতরকার মুক্ত ইলেকট্রন-সমষ্টি বৈদ্যুতিক বিভবের (potential) প্রভাবে ধাতুর অণু-পরমাণুগুলির সংঘর্ষজনিত বাধা অতিক্রম করে গতিশীল হয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রধানত মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর ব্যাপার, অণু-পরমাণুর অবস্থান বা গুণাগুণের পরিবর্তন নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, এটা বলে কাজের কাজ কিছু হবে না, কারণ যে-অনুমানটাকে অপ্রমাণ করতে চাওয়া হচ্ছে সেটা মোটেই সুনির্দিষ্ট কিছু অনুমান নয়। তামার তারে 'কিছু একটা' হয় না, এটা হলফ করে বলবে কোন বিজ্ঞানী ? যেমন, কোন সৎ বিজ্ঞানীকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'হাই কারেণ্টে' কি তারের একটাও অণু বা পরমাণুর স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা নেই ? তবে সে মাথা চুলকোতে থাকবে অস্বস্তিভরে। তখনই আবার আওয়াজ উঠবে, 'আমাদের মাস্টার জিতেছে'।

দুই, বলা হচ্ছে, তামার তারে 'একটা কিছু হয়ে শরীরে তামার অ্যাবসরবড হওয়ার বা শোষিত হওয়ায় ক্ষমতা বাড়ছে।' এটা পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপার। কারুর যদি সময় আর উৎসাহ দুই-ই থাকে তবে সে হয়ত পরীক্ষা করে দেখলও যে না, এ অনুমান ঠিক নয়; তবুও তার পরিশ্রম কিন্তু সার্থক হবে না। কারণ প্রত্যেক পরীক্ষার ফলাফলেরই একটা ন্যূনতম সূক্ষ্মতার মাত্রা রয়েছে যার নিচে সেই পরীক্ষার সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। সৎ বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'আপনার এক্সপেরিমেণ্টের অ্যাকিউরেসি কত মশায় ?' সে হয়ত বলবে, শরীরের ভেতর সেকেণ্ডে এক গ্রামের ১০^{৯} ভাগের কম তামা শোষিত হলে তা পরীক্ষায় ধরা পড়বে না। দুঁদে উকিল (অবশ্যই যিনি বালা ধারণ করেন এবং বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করেন) এবারে শুধু বলবে—'তবে ?' এই 'তবে'র উত্তর আর দিতে পারবে না বেচারা বিজ্ঞানী।

তিন, বলা হচ্ছে, তামার তারের ভিতর একটা কিছু হয়ে শরীরের ভিতর তামা শোষিত হয়ে (পরীক্ষাগারে মাপজোকের অতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন পরিমাণে হলেও ক্ষতি নেই) রোগ সারাচ্ছে। এখানে বিজ্ঞানী প্রশ্ন করবে, সত্যিই ঐ রোগের ওপর তামার কোন প্রভাব আছে কি-না, থাকলে তা কি, প্রভাব কার্যকর করার জন্য ন্যূনতম কত পরিমাণ তামার প্রয়োজন, এসব তো পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপার।

তা না করে রোগ সারছে বলা যাবে কি করে? কিন্তু এখানেও অন্যান্য সব কাজ ফেলে যাবতীয় পরীক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে তাকেই, (অন্ধবিশ্বাসীরা পরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করবেন না), আর পরীক্ষার ফল তামার বালার বিরুদ্ধে গেলেও সব শেষে নিক্ষিপ্ত হবে সেই পাশুপত অস্ত্র—পরীক্ষার অপরিহার্য ন্যূনতম অনিশ্চয়তা আর ত্রুটির ভিতরেই যে নিহিত নেই তামার বালার মাহাত্ম্য, তার প্রমাণ কি?

অর্থাৎ একপাক ঘুরে এসে আবার সেই বিতর্কটা শুরু হবে, সেই আগের বিন্দু থেকে। অপবিজ্ঞান ছড়াচ্ছে যারা তারা প্রমাণের দায়িত্ব চালান করবে সবসময়ই বিজ্ঞানীদের ওপরে। কারণ দারিদ্র্য-রোগ-শোক-মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি সমস্যা-সংকট জর্জরিত সমাজে জোর তাদের। হাজার হাজার মানুষ লৌকিক অলৌকিক যে কোন উপায়ে রোগশোকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় শরণ নিচ্ছে তাদের। মেনে নিচ্ছে তাদের কথা। এই মূল জোরের ওপর ভিত্তি করে তারা যুগোপযোগী পদ্ধতিতে শানিয়ে নিচ্ছে তাদের হাতিয়ার। সাদামাটা তাবিজ-কবচের বদলে মানুষের হাতে পরিয়ে দিচ্ছে 'হাই কারেণ্ট' বওয়া তামার তার। বিজ্ঞানের ভাষা দিয়ে মাথা ঘুলিয়ে 'বুঝিয়ে দিচ্ছে' এর কার্যকারিতা।

তবে তার মানে এই নয় যে, এইসব অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের কোন আশা নেই বা কিছু করণীয় নেই। অবশ্যই আছে। অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ ক্রমাগত জোগাড় করতে হবে, বিজ্ঞানের কার্যকারিতার নিদর্শন মানুষের সম্মুখে হাজির করতে হবে। শুধু এইটুকু খেয়াল রাখতে হবে যে এতে এক ধাক্কায় অপবিজ্ঞানকে খতম করা যাবে না। এই খেয়ালটুকু না রাখলে কিন্তু নানান বিভ্রান্তি আর বিপদের সম্ভাবনা। তামার বালায় আদৌ কোন ফল হয় কি-না, না হলে কেন হয় না, এ নিয়ে যুক্তি-তর্ক-পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাজির করতে হবে বিজ্ঞানীদেরই। আর তার সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, উপযুক্ত পরীক্ষা হাজির করলেও, ভালোভাবে প্রচার করলেও, বন্ধ হয়ে যাবে না তামার বালার বা ঐ জাতীয় নতুন বা অন্য কিছুর ব্যবহার, কারণ অপবিজ্ঞানের মূল রয়েছে সমাজের মানুষের মনের অনেক গভীরে। যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের পুরো এক পাকের পর দেখা যাবে বিতর্ক শুরু হচ্ছে আবার ঐ আগের বিন্দু থেকেই। তবে বিজ্ঞানীর শ্রম পুরোপুরি বৃথা যাবে না, কারণ ইতিমধ্যে তার পাশে এসে দাঁড়াবে আরো কিছু সচেতন মানুষ যারা চাইবে অপবিজ্ঞান ছেড়ে বিজ্ঞানের অবস্থান গ্রহণ করতে। এটুকুই হবে নীট লাভ। বড় লাভ।

অভিজিৎ লাহিড়ী

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

জাদুকরী প্রতারণা

মাদুলির জাদু

ইতিহাসের এক বিস্তীর্ণ অধ্যায় জুড়ে ধর্মযাজক, ওঝা, পুরোহিত ও জাদুকরদের প্রভাব ছিল সমাজে। বহুদিন ধরে, বহু মানুষকে অত্যাচারিত ও বিভ্রান্ত হতে হয়েছে (এবং হচ্ছে) প্রতাপশালী এইসব সমাজনিয়ন্তাদের কাছে। এই ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা ছিল জাদুকরের। ডাইনীর অভিযোগে কাউকে পুড়িয়ে মারা, কোন একটা গ্রাম, সাধারণ মানুষের কাছে অপবিত্র হয়ে উঠবে বলে সেই গ্রামের কুমারী মেয়েদের ঈশ্বরদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা—এসব সে-যুগের জাদুকরদের অন্যায়-অত্যাচারের কতকগুলো নিদর্শন।

আজ জাদুকরদের নাম শুনলে আগেকার মতো আঁতকে ওঠার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ জাদুবিদ্যা এখন এক অন্যতম প্রমোদ-মাধ্যম। গল্পভিত্তিক কল্পনা আর বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবকে কেন্দ্র করে ম্যাজিক আজ সমাজে তার নিজস্ব আসন করে নিয়েছে। তবুও কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে সুযোগসন্ধানী ভণ্ড জাদুকরের দল শিকারের সন্ধানে যেখানে সেখানে ওত পেতে রয়েছে। দুটো একটা ভেল্‌কি দেখিয়ে লোকের মন জয় করে নিয়ে অর্থ, সমীহ, প্রতিপত্তি আদায়ের চেষ্টা চলে সুকৌশলে।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। গতবছর শীতকালে আমি যখন আন্দামানে গিয়েছিলাম, ওখানকার কিছু স্থানীয় লোকের মুখে এক সাধুজীর খুব নামধাম শুনি। তার কাছে নাকি যারাই কোন সমস্যা নিয়ে গেছে সবাই ফললাভ করেছে। আমি নিজের কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন সেই সাধুজীর কাছে রওনা দিলাম। পোর্টব্লেয়ার থেকে ঘণ্টা চারেকের পথ চিড়িয়াটাপ্পা, সেখান থেকে আরও কিছুটা হাঁটাপথ অতিক্রম করে যথাস্থানে গিয়ে পৌছলাম। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম—ভিড় উপচে পড়ছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম, একজন জাদুকর কিভাবে শিক্ষিত সমাজের ওপরেও ভণ্ডামির প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। সাধুজী কয়েকজন ভক্তকে একটা করে মাদুলি দিয়েছিলেন ধারণ করার জন্য। আশ্চর্যের বিষয়, সেই মাদুলিগুলো চোখের সামনে এত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, কেউ হাতে ধরে রাখতে পারছিল না। ভীষণ গরম লাগায় মাটিতে ফেলে দিচ্ছিল। ওটাই নাকি

মাদুলির তেজের নিদর্শন। অল্পক্ষণ বাদেই সেই মাদুলিগুলোর গা দিয়ে 'বিভূতি' বের হতে শুরু করল। আর সেই 'বিভূতি' বা 'পবিত্র ছাই' নেওয়ার জন্য লোকেদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ি পড়ল তা দেখবার মত। মাদুলির উত্তপ্ত হওয়ার ব্যাপারটাতে আমিও প্রথমে খুব চমকে গিয়েছিলাম কিন্তু শেষ অব্দি 'বিভূতি' দেখেই আমার সব মোহ-ভক্তি কেটে গেল, কারণ এই বিভূতি তথা ছাইটা ছিল আমার পূর্বপরিচিত। মারকিউরাস ক্লোরাইডের সংস্পর্শে এলে অ্যালুমিনিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত ধাতু ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ঠিক ঐ ধরনের ছাই তৈরি করে।

শুধু ভেল্কি নয়, ঠগ জাদুকরেরা দুর্বল মনের লোকেদের ওপর সাইকোথেরাপি বা মনঃসমীক্ষণ চালাতেও ছাড়ে না। মোহগ্রস্ত লোক যখন মনে করে নেয় যে অমুক লোকের দেওয়া মাদুলি বা কবচ ধারণ করলে তার মঙ্গল হবেই, তখন বহু ক্ষেত্রেই ঐ কবচ ধারণ করার পর হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। মনের জোর কমে গেলে এই ধরনের কবচ (যার কোনও গুণই নেই) সাময়িকভাবে মনের জোর ফিরিয়েও আনে। যদি কোন কারণবশত সাধারণ লোকের আকাঙ্খিত কাজটা সফলতা লাভ করে তখন নাম-ডাক হয় উপরোক্ত প্রতারক জাদুকরের। আর কোন কারণে যদি আকাঙ্খা-পূরণ না হয়, তখন অধিকাংশ লোকই ধারণা করে নেন—বোধহয় ঠিক ঠিক কর্তব্য বা নির্দেশ পালন করা হয় নি।

পথে ঘাটে চলতে ফিরতে মাঝে মাঝেই এমন কিছু ঘটনা নজরে পড়ে যা দেখলে আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বলে ভুল হলেও সেগুলো নিতান্তই ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমানে অধিকাংশ জাদুকর শিল্পী হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জন করেন, কিন্তু কখনও কখনও কোন জাদুকর নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করে জাদু-ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। যে কোন মানুষের মনেই জীবনের কোন না কোন সময়ে অশান্তি সমস্যা বা দুর্বলতার আগমন ঘটে। সেই মানসিক দুর্বলতাই প্রতারক জাদুকরদের প্রতি নির্ভরতা এনে দেয়। তাই, এই ধরনের ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে হবে, আর রাখতে হবে সজাগ মন যাতে কোন ভণ্ড জাদুকর অলৌকিকতার নাম করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

রানা বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

অষ্টধাতুর নষ্টামি

দু-হাতে অবিরাম কাজ করে চলেছেন আর মুখে বলে যাচ্ছেন কথা। মুখ আর হাত সমান তালে চলছে। বাঁ-পাশে রাখা মস্ত বড়ো কাপড়ের পোস্টার। অয়েল পেইন্টিং করে আঁকা নানা দেবদেবীর ছবি আর তার তলায় লেখা ধাতুর নাম। সামনে চটের চাদরের ওপর ছোট ছোট বাটিতে হরেকরকমের ধাতু। এক পাশে একটা প্রেসার স্টোভ। লম্বা হাতলওলা লোহার হাতা।

অষ্টধাতুর আঙটি গড়ার ছোট্ট রোড সাইড কারখানা।

ভদ্রলোক দৃঢ়তার সংগে বিজ্ঞাপন প্রচার করছেন তার তৈরি আঙটির। ছোটটির দাম পাঁচ টাকা। এর তিনগুণ ওজনের বড়ো আঙটির দাম, না পনের টাকা নয়, বারো টাকা। অবশ্যই বড়োটির তেজ বেশি, কেন না ধাতুর পরিমাণ তাতে তিনগুণ।

"একমাসের গ্যারান্টি। কার্ডে তারিখ বসিয়ে সই করে দেবো। যদি একমাসের মধ্যে কোনরকম উপকার না পান, আঙটি এবং কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে পুরো দাম ফেরত নিয়ে যাবেন।"

এর চেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয় না। উপকার হবেই, না হলে পয়সা ফেরত, কোন লোকসান নেই।

যাদবপুর স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া শক্ত নয়। রবিবার ছাড়া বাকি সবদিন ওনাকে সেই নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যাবে। শুধু তিনি কেন, এই অষ্টধাতুর আঙটি বানাবার কারিগর ভারতবর্ষের সর্বত্র অজস্র ছড়িয়ে আছে। এই আঙটির মধ্যে আট-টা ধাতুই আছে কি-না সে সন্দেহের অবকাশ রাখা হচ্ছে না। সর্বজনের চোখের সামনেই আটটি ধাতু মিশিয়ে-গলিয়ে, ছাঁচে ঢেলে তিনি প্রস্তুত করছেন অষ্টধাতুর আঙটি। অসাধারণ কর্মতৎপরতা দেখতে গিয়েই আটকে গেলাম। গোটা তিনেক ট্রেন ছেড়ে ভদ্রলোকের ধাতু থেকে আঙটি বানানোর পুরো প্রক্রিয়াটি দেখতে এবং ভদ্রলোকের সত্যিকারের আকর্ষণীয় এবং বিশ্বাস উৎপাদনকারী বক্তৃতা শুনতেই হলো। যেভাবে এবং যে-প্রক্রিয়ায়, সামান্য ক-টা ভাঙাচোরা জিনিস-পত্র দিয়ে বিশাল ব্যবধানের গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতু

গলিয়ে, ছাঁচে ফেলে তিনি আঙটি বানাচ্ছিলেন, তাতে ভদ্রলোকের কর্মশৈলীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগবেই। একজন দক্ষ ধাতুবিদ্যার কারিগর বটে।

* * *

প্রথমেই কয়েকটি ভুলত্রুটির দিকে নজর গেল। মুখে আটটি ধাতু বললেও তিনি মেশাচ্ছিলেন সাতটি কঠিন এবং একটি তরল ধাতু বা পারদ। কঠিন ধাতুগুলোর মধ্যে মৌল ধাতু ছিল ছ-টি, একটি ছিল সংকর ধাতু। এই সংকর ধাতুটি ছিল পেতল কিন্তু মুখে বলে যাচ্ছিলেন কাঁসা। অবশ্য ইংরাজিতে তিনি বলছিলেন ব্রাস যার বাংলা পেতল। সম্ভবত অজ্ঞতাবশতই তিনি এ-ভুলটি করছিলেন। কিন্তু এই ছোট্ট ভুলে আটটি ধাতু সাতটি হয়ে গেল—খেয়াল করলেন না ভদ্রলোক। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় কি-না পরে ভেবে দেখা যাবে।

এবার ধাতুগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

সারণি ১

ইংরেজি নাম	বাংলা নাম	সংকেত	গলনাঙ্ক/°C
কপার	তামা	Cu	১০৮৩
গোল্ড	সোনা	Au	১০৬৩
আয়রণ	লোহা	Fe	১৫৩৯
সিলভার	রূপা	Ag	৯৬০
জিংক	দস্তা	Zn	৪১৯
লেড	সীসা	Pb	৩২৭
মার্কারি	পারদ	Hg	তরল

ওপরের সারণির সাতটি ধাতু ছাড়াও দেওয়া হয় পেতল বা ব্রাস। এটি একটি ধাতু-সংকর, পৃথক কোন ধাতু নয়—যাতে শতকরা ৮০ ভাগ তামা আর ২০ ভাগ দস্তা থাকে। অর্থাৎ অষ্টধাতুর আঙটিতে আটটি ধাতু থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। পেতলের পরিবর্তে কাঁসা দিলে আটটি ধাতু এসে যাবে কারণ কাঁসায় থাকে শতকরা ৮০ ভাগ তামা এবং ২০ ভাগ টিন। টিন একটি মৌলিক ধাতু।

যাই হোক—এই ধাতুগুলোর মিশ্রণ তৈরি করা কিন্তু সহজসাধ্য নয়। পারদ বাদ দিয়ে বাকি ধাতুগুলো তাপ-প্রয়োগে গলানো হয়। সীসার সবচেয়ে কম গলনাঙ্ক ৩২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সর্বোচ্চ গলনাঙ্ক লোহার ১৫৩৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এরকম গলনাঙ্কের বিস্তৃত তফাৎ যেখানে সেই ক্ষেত্রে সার্থক মিশ্রণ তৈরি

করতে গেলে যে-বিশেষ নীতিটি গ্রহণ করতে হয়, তা-হলো 'উচ্চ-গলনাঙ্কের পদার্থ কম পরিমাণে এবং নিম্ন-গলনাঙ্কের পদার্থ বেশি পরিমাণে' নেবার নীতি। ভদ্রলোক সেই নীতিটিই গ্রহণ করছিলেন। সবচাইতে বেশি নিয়েছিলেন সীসা, তারপর দস্তা এবং বাকি সবই অত্যল্প পরিমাণে। মিশ্রণটিকে সোহাগা (বিগালকের কাজ করে) সহযোগে গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে আঙটি প্রস্তুত করলেন। হাতায় পড়ে থাকা ধাতুমল, যা কঠিন অবস্থায় ছিল, তা সরিয়ে নিলেন।

এবার আঙটিটি ঘষে-মেজে নির্দিষ্ট আকারে এনে সামান্য পারদ দিয়ে ঘষে চকচকে করে দিলেন। তৈরি হলো অষ্টধাতুর আঙটি।

প্রতীক্ষারত খদ্দেরের হাতে চলে গেল সেটি।

এখন প্রশ্ন—আঙটিটিতে কি কি আছে ?

১. প্রচুর পরিমাণে সীসা।

২. বেশ খানিকটা দস্তা।

৩. পেতল বা কাঁসা থেকে আসা কিছুটা তামা এবং দস্তা অথবা টিন।

৪. সামান্য রূপা।

৫. বহিঃগাত্রে লেগে থাকা পারদ।

৬. সোনা এবং লোহা থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। অর্থাৎ মূলত এটি একটি পারদ প্রলিপ্ত সীসা ও দস্তার আঙটি।

এই আঙটি হাতে রাখলে ভাগ্য ফেরে, দুর্ঘটনা থেকে বাঁচা যায় এবং (দৃঢ়তার সংগে দাবি করা হয়) দেহের প্রয়োজনীয় ঘাটতি ধাতু ঐ আঙটি থেকে দেহ শোষণ করে। যে কারণে, পাত্রভেদে এই আঙটিগুলোর গুণ বছর দুয়েক বজায় থাকে। তারপর প্রয়োজন হয় নতুন আঙটির।

মেটাল ট্যাবলেট, তামার বালা

মেটাল ট্যাবলেট একটি নতুন সংযোজন। যে কোন ধাতুর গুঁড়োকে ছাঁচে ফেলে চাপ দিয়ে ট্যাবলেট বানানো হয়। পরে সেই ট্যাবলেটকে উত্তপ্ত করতে হয় এমন তাপমাত্রায় যাতে ধাতু গলে না যায়। বেশ শক্ত সুদৃশ্য ধাতব ট্যাবলেট এইভাবে বানানো যায়। এগুলো খুব সুন্দর এবং অলংকার রূপে এর ব্যবহার সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক হলেও এর বিজ্ঞাপিত ব্যবহারে কিন্তু অন্য কথা বলা হয়। অষ্টধাতুর আংটির বেলাতে যেমন, এ-ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি—ভাগ্য থেকে স্বাস্থ্য—সমস্ত রকম গুণাগুণ এর ওপর আরোপিত। অষ্টধাতুর আংটি থেকে এতে কারিকুরি বেশি থাকায়, দামও এর বেশি। মেটাল ট্যাবলেট হিসেবে—

তামা, তামা-রূপার সংকর, তামা-দস্তার সংকর ইত্যাদি এবং আরো অন্যান্য ধাতু যা উজ্জ্বল অথচ বাতাসের গ্যাসীয় পদার্থ এবং জলীয় বাষ্প দ্বারা রাসায়নিকভাবে আক্রান্ত হয় না—এমন সব ধাতুর ব্যবহার করা হয়।

তামার বালার ব্যাপক প্রচার। সহজলভ্য, সস্তা ইত্যাদি কারণে এর এমন ব্যাপক প্রসারের কারণ হতে পারে। এর ভেতরে আবার 'উচ্চ ভোল্টে তড়িৎ প্রবাহিত' তারের চাহিদা বেশি। বাতের মত বেশ কিছু অসুখ সারাতে নাকি এর কোন বিকল্প নেই, যদিও 'উচ্চ ভোল্টে তড়িৎ প্রবাহিত' তারের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না।

এ ছাড়াও ঘোড়ার নালের আঙটি ইত্যাদি বেশ দামে বিক্রি হয়। এ সবই কিন্তু 'শরীরের সংস্পর্শে ধাতুর ব্যবহার' এই পর্যায়ভুক্ত। অষ্টধাতুর আঙটি থেকে ঘোড়ার নালের আঙটি কিংবা মেটাল ট্যাবলেট অথবা তামার বালার ধাতুর সংস্পর্শে থেকে মানুষের ভাগ্য ফেরার কোন কারণ নেই এবং বর্তমান আলোচনায় এই অসম্ভব ব্যাপারটি নিয়ে কোন আলোচনা করা হবে না। কিন্তু শরীরের অসুখ-বিসুখ সারাতে ধাতুর ব্যবহার থাকলেও থাকতে পারে—এমন বিশ্বাসে অনেকেই অকাতরে অর্থ বিনিয়োগ করেন। অথবা, আসলে 'ভাগ্য ফেরাবার' গূঢ় ইচ্ছার জন্যই তারা এইসব বস্তু ধারণ করেন কিন্তু অপরাধবোধ অথবা হীনম্মন্যতার কারণে 'মার জন্য'—'স্ত্রীর ইচ্ছা'—'ফালতু বাড়ির ঝামেলা এড়াতে, বুঝলে না, নাহলে আমার তো জানাই আছে এসব বুজরুকি' ইত্যাদির সংগে 'বিশেষ বিশেষ ধাতু বিশেষ বিশেষ সময়ে আমাদের শারীরিক অনেক কিছুই…' যুক্ত হয়েছে। একটু দেখা যাক ধাতু এবং শরীরের সম্পর্কটা কেমন।

ধাতু এবং মানবদেহ

প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহে প্রায় ৪০টি মৌল থাকে। এর মধ্যে ২৫টি মৌল সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানবদেহের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এগুলো দু-নম্বর সারণিতে দেখান হল।

সারণি ২

ধাতু :	সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাংগানিজ, আয়রন, কোবাল্ট, কপার, জিংক, মলিবডেনাম, টিন।
অধাতু :	হাইড্রোজেন, কার্বন, সিলিকন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, সালফার, সেলেনিয়াম, ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন।

এর ভেতরে ১১টি বেশি পরিমাণে থাকে। সেগুলো হলো, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, সালফার এবং ক্লোরিন ; মাঝারি পরিমাণে থাকে ম্যাংগানিজ, আয়রন, কোবাল্ট, কপার, জিংক, মলিবডেনাম, ক্রোমিয়াম ; অত্যল্প পরিমাণে থাকে সিলিকন, ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, টিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন এবং সেলেনিয়াম।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে, এই মৌলগুলি শরীরে থাকে বিভিন্ন যৌগের রূপে। একা স্বাধীন মৌল অক্সিজেন বা সামান্য একটি-দুটি ছাড়া কোন মৌলই দেহে থাকে না। এই যৌগগুলি মানবদেহে থাকে কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাজ করার জন্য। শরীরে এদের কার্যকলাপ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং বিশেষ কয়েকটি কাজ ছাড়া এরা অন্য কোন কিছু করে না। আরেকটি প্রয়োজনীয় তথ্য হলো—এদের উপস্থিতির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে এদের উপকারের বিষয়টি। অল্প পরিমাণে যার থাকার কথা বন্ধুর মতো, পরিমাণে বেড়ে গেলেই তারা হয়ে যায় পরম শত্রু। জীবনহানিও ঘটাতে পারে তারা, সেই অবস্থায়। মানবদেহে যত মৌল থাকে, তার শতকরা মাত্র তিন ভাগ ধাতু। বাকিটা অধাতু। একজন ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের মানুষের দেহে ক্যালসিয়াম থাকে ১৭০০ গ্রাম, পটাসিয়াম ২৫০ গ্রাম, সোডিয়াম ৭০ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৪২ গ্রাম, আয়রন ৭ গ্রাম, ম্যাংগানিজ, কোবাল্ট, কপার, জিংক এবং মলিবডেনাম প্রতিটি ১ গ্রামের কম।

এবারে অষ্টধাতু

অষ্টধাতুর আংটিতে মূলত থাকে দস্তা বা জিংক এবং সীসা। ওপরের প্রলেপ পারদ। মানবদেহে জিংকের প্রয়োজন ১ গ্রামেরও কম এবং তা-ও ধাতু রূপে নয়, বিশেষ যৌগরূপে। আর সীসা বা পারদের কোন প্রয়োজনীয়তা মানবদেহের নেই। ধাতব জিংক, পারদ এবং সীসা মানব-শরীরের পক্ষে বিষাক্ত। যে কারণে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যে-ধাতব পাত্র, কৌটো ব্যবহার করা হয়, তাতে লোহার ওপর টিনের আস্তরণ দিতে হয় ; জিংকের আস্তরণ দেওয়া আইন-বহির্ভূত, যদিও তা সস্তা। সীসা জিংকের থেকেও বেশি বিষাক্ত। যারা পটারি কারখানায় কাজ করে অথবা যারা কলের মিস্ত্রি তাদের মাড়িতে সীসার বিষক্রিয়ার জন্য নীল দাগ দেখতে পাওয়া যায়। আবার পারদ বা মার্কারি সীসার থেকেও বিষাক্ত। এই ধাতুগুলো যদি কোন ভাবে পেটে যায় তবে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলো শরীরে বিষক্রিয়া ঘটাবে।

ধাতুর সংগে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক থাকার জন্য ধাতু নিয়ে মানুষের অনেক দুর্বলতাও আছে। অনেক ভুল ধারণা, অবৈজ্ঞানিক ধারণারও সূত্রপাত এখান থেকে। ধাতু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে এই ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না। কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হলো।

এক : ধাতু এবং ধাতব লবন ভিন্ন ধর্মের, সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। 'রক্তে লোহা থাকে', এই সরল বাক্যটি কিন্তু নির্ভুল নয়। রক্তে লোহা মৌলটি থাকে না, থাকে লোহার জটিল একটি যৌগ। একটি অন্য উদাহরণ দেওয়া যাক। সোডিয়াম এবং ক্লোরিন দু-টি মৌল, দু-টিই মানুষকে মেরে ফেলার মতো বিষাক্ত। কিন্তু এই দুই মৌলের যৌগ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড, যার অপর নাম খাদ্য লবণ—নুন।

দুই : মানুষের দেহে কোন মুক্ত ধাতু থাকে না। ধাতুর যৌগ থাকে।

তিন : ধাতু জলে বা অন্যান্য খাদ্যে মিশে পেটে যায়। পেটের আন্ত্রিক পাচক রসে দ্রবীভূত হয়ে রক্তে মিশে যায়। এভাবেই ধাতুর বিষক্রিয়া শুরু হয়।

চার : চামড়া বা ত্বকের ওপরে ধাতু থাকলে শরীর তা কোনভাবেই শোষণ করে না। ধাতুবিশেষ যৌগ অবস্থাতেই শরীরে শোষিত হয়।

পাঁচ : সীসা, মার্কারি বা পারদ এরকম দু-একটি ধাতু ত্বকের সংগে প্রতিক্রিয়াও ঘটায় এবং দুরারোগ্য চর্মরোগ সৃষ্টি করতেও সাহায্য করে, কিন্তু মৌল ধাতুরূপে দেহে শোষিত হয় না।

অতএব, অষ্টধাতুর আংটি শরীরের কোন উপকার করতে সক্ষম তো নয়ই বরং তা বিষক্রিয়ার কারণ হবার সম্ভাবনা-ই রাখে।

মেটাল-ট্যাবলেটে প্রচণ্ড বিষাক্ত কোন ধাতু ব্যবহৃত না হলেও তার বিষক্রিয়া একদম নেই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। কোন ধাতুই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শরীরে প্রবেশ করানো বিপজ্জনক। সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়তা করা ছাড়া মেটাল-ট্যাবলেটের অন্য কোন গুণাগুন নেই।

অন্যান্য ধাতব বস্তু অংগে ধারণ করা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। একটা কথা উপসংহারে বলা প্রয়োজন। ধাতু এবং ধাতব যৌগ এক জিনিস নয়। রক্তে লোহার যৌগ হিমোগ্লোবিন থাকে। লোহার বালা হাতে পরে থাকলে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বা গুনাগুন পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা নেই। যে সমস্ত ধাতু যেভাবে মানবদেহে থাকে তা প্রাকৃতিকভাবেই আসে ; সংশ্লেষিত হয়, আবার বিশ্লেষিতও হয়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম বা আয়রন ইত্যাদির যৌগগুলির কোন

পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হলে যে-সমস্ত অসুখ মানুষের হয় ঠিকমতো ডাক্তারি চিকিৎসাতেই তার প্রতিরোধ সম্ভব, অন্যভাবে নয়। অষ্টধাতুর আংটি, মেটাল-ট্যাবলেট, তামার তার কোন কিছুরই এ-জাতীয় ব্যবহার বিজ্ঞান-সম্মত নয়, যতই তার মধ্যে বিজ্ঞান-বিজ্ঞান গন্ধ থাক না কেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. General and Inorganic Chemistry : P. K. Dutta ; Science Book Agency.

২. Fundamental Principle of Inorganic Chemistry : D. Banerjea ; Sultan Chand & Sons ; (Chapter : Role of Metal Complexes in Biological Systems).

৩. Chemical Elements ; Mir Publisher, Moscow.

শঙ্কর ঘটক

মার্চ ১৯৮৮

নাভিশঙ্খের 'জীবন্ত' তাবিজ

দু-বেলা যাতায়াতের পথে ফুটপাতে, বাজারে, স্টেশন চত্বরে বা রাস্তার মোড়ে 'পবিত্র নাভিশঙ্খে'র প্রচার নিশ্চয়ই অনেকেরই নজরে এসেছে। দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে ভিড়ে গলা বাড়িয়ে উঁকিও দিয়েছেন অনেকে। প্রচারক-বিক্রেতাদের মতে নাভিশঙ্খ হলো গভীর সমুদ্রের এমন এক প্রাণী যাকে বাহুতে কবচ আকারে ধারণ করলে নানা রোগ থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। ছোট্ট গোল বোতামের মতো এই বস্তুগুলি নাকি সদা-জীবন্ত ; এদের অলৌকিক প্রাণশক্তিই কবচের মধ্য দিয়ে শরীরে ঢুকে রোগের সাথে লড়াই চালায়। চমৎকার বাক্চাতুর্যে বিমোহিত সাধারণ মানুষের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্রেতারা নাভিশঙ্খের শক্তি প্রদর্শনও করে। প্রদর্শনীটা এ রকম :

একটি কাঁচের মসৃণ প্লেটে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে তার ওপর গোটা-কয়েক নাভিশঙ্খ ভালোভাবে ঘষে ছেড়ে দেওয়া হয় ; ওইগুলি ইতস্তত ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় প্লেটের ওপর। দর্শকদের চোখ বিস্ফারিত হয়। তখনই প্রচারকদের গলা বাড়ে—'মরা দেখালেও এগুলি জ্যান্ত, এদের মধ্যে তেজ রয়েছে যা রোগমুক্তির সহায়ক।' এরকম চমকে দেওয়া কাণ্ডের সাথে বিশ্বাস-আকর্ষণী প্রচারক স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল-চিত্ত লোকেদের প্রভাবিত করে। সম্পূর্ণ অন্ধ বিশ্বাসে পকেট থেকে টাকা বের করেন ক্রেতারা একে একে সেই জীবন্ত তাবিজ সংগ্রহের জন্য।

এ তো গেল খোলা চোখের দেখা। একটু বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক।

নাভিশঙ্খ হলো চ্যাপ্টা শামুক জাতীয় ছোট প্রাণী (সামুদ্রিকও হতে পারে)। তবে ওই তাবিজ বানিয়ে যেগুলো বিক্রি হয়, যার কথা ওপরে বললাম, সেগুলো নাভিশঙ্খের খোলা। এরা মোটেই জীবন্ত নয়। শামুকের খোলার মতোই এরা নিষ্প্রাণ বস্তু। কাঁচের প্লেটে যে তরলটি ঢালা হয় সেটা কোন তরল সাবান, যেমন 'জেন্টিল' বা ওইরকম কিছু। এই সাবান কাঁচের প্লেট জুড়ে একটা অতি পাতলা পর্দা বা আস্তরণ (**Film** বা **layer**) তৈরি করে। প্রত্যেক তরল পদার্থের ওপরতলে একটা পৃষ্ঠটান (**Surface Tension**) রয়েছে। সেই ধর্ম অনুযায়ী ওই সাবানের আস্তরণেরও নিজস্ব পৃষ্ঠটান থাকে। স্বাভাবিক সাম্য অবস্থায় এই পৃষ্ঠটান বা টেনশনের জন্যই তরলতল স্থির থাকে, ফাটে না বা সেখানে বুদ্বুদ জন্মায় না। কিন্তু নাভিশঙ্খের কৌশল দেখানোর সময় শঙ্খের তলার দিকে একটু লেবুর রস লাগিয়ে নিয়ে প্লেটে ছাড়া হয়। এই লেবুর রস আসলে, বিজ্ঞানের ভাষায়, একটি তড়িৎ-বিশ্লেষক (**electrolyte**)। এরা নিজে থেকে তড়িৎকণা (**charged**) বা আয়নে ভেঙে যেতে পারে। এখন, কাঁচের পাত্রে সাবানের পর্দার ওপর লেবুর রস পড়ে এরকম কতকগুলি পজিটিভ-নেগেটিভ তড়িৎকণা তৈরি করে। বিপরীত চরিত্রের তড়িৎকণা বা আধারগুলি পারস্পরিক আকর্ষণে সাবান-স্তরের ওপর সেই সেই জায়গায় টান বাড়িয়ে দেয়। এই বর্ধিত টানের ফল এই হয় যে, পাত্রের ওপর খুব ছোট ছোট প্রায়-অদৃশ্য বুদ্বুদ তৈরি হয়ে শঙ্খ-তাবিজের গায়ে জমা হতে থাকে। এটি একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।

বুদ্বুদ জমা হওয়ার অন্য আরেকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। শঙ্খের খোলাটি আসলে ক্যালসিয়াম কারবনেটের তৈরি। ঐ শামুকজাতীয় প্রাণীর জীবন্ত অবস্থায় তার জৈবিক প্রক্রিয়াতেই ক্রমাগত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দেহের

ওপর জমতে জমতে খোলাটি তৈরি হয়। আর লেবুর রসে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড। সাইট্রিক অ্যাসিড ও ক্যালসিয়াম কারবনেটের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হয় ক্যালসিয়াম সাইট্রেট এবং কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। এই কারবন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস খোলার গায়ে জমা হয় ছোট ছোট বুদ্বুদের আকারে। এবার রোদ্দুরের তাপে সেই ক্ষুদে বুদ্বুদগুলো একটা-দুটো করে ফাটতে থাকে চটপট, তাতে তাবিজটার গায়ে এধার-ওধার থেকে অসমান বলের ধাক্কা পড়ে, আর অমনি সেটা ইতস্তত চলে বেড়াতে থাকে পিছল পাত্রের ওপর।

ঘটনাটা বিজ্ঞানের চোখে দেখা যাচ্ছে এই। এবার ভাবুন তো, নাভিশঙ্খের কবচ বা তাবিজের বিচিত্র বিচরণে সত্যিই কোন দৈবশক্তির ক্রিয়া রয়েছে, না কি নিছক ভেল্কি দেখিয়ে লোক ঠকানোর ফিকির এটা?

চিত্ত সামন্ত

ফেব্রুয়ারি ১৯৮১

ভুয়া বিজ্ঞান

রত্নের রশ্মিশোষণ

স্তম্ভিত হওয়ার মতই ঘটনা বটে।

লোকটির হাতে ছোট মসৃণ একটা পাথর—বলল, চন্দ্রকান্ত মণি। এক টুকরো কাপড়ে এঁটেসেঁটে জড়ানো হলো স্টোনটা, তারপর ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বেলে আগুনের শিখাটা কাপড়-জড়ানো পাথরের গায়ে ধরে রাখা হলো বেশ কিছুক্ষন। আজব কাণ্ড—কাপড় পুড়ল না! পাথরের গায়ে সেঁটে থাকা কাপড়, সরাসরি তার ওপরেই আগুন লাগছে, তবু সেটা পুড়ল না। কেন? কিভাবে সম্ভব এটা?

ব্যাখ্যা দিলেন প্রদর্শক নিজেই। তিনি বললেন,—রত্নের, বিশেষত চন্দ্রকান্ত মণির, অসাধারণ অবিশ্বাস্য ক্ষমতার জলন্ত প্রমাণ এটা। এই মণি তার আপন বৈশিষ্ট্যে দেশলাই-এর শিখার তাপরশ্মিকে দ্রুত শোষণ করে নিচ্ছে—এত দ্রুত যে রত্নের গায়ে লাগানো কাপড়টা পুড়ে যাওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না; এহেন

অলৌকিক গুণপনার কারণেই এরকম রত্ন নানাবিধ রশ্মি বা বিকিরণকে, এমনকি ঊর্ধ্বাকাশের মহাজাগতিক রশ্মিকেও, শোষণ করে নেয়। সুতরাং এ রত্ন দেহে ধারণ করলে মহাজাগতিক রশ্মি রত্নের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢুকে যাবতীয় রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, মন্দভাগ্যকে ধ্বংস করবে এবং নির্মল সুখ-শান্তি এনে দেবে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মেশানো কিছু প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খায়। এই চমকপ্রদ প্রদর্শনীটি প্রথম দেখেছিলাম এক কোর্টের চত্বরে। প্রদর্শক একজন পাথর ব্যবসায়ী, বিক্রির জন্যেই তার প্রদর্শনী ও বক্তৃতা।··· এরকম অভিজ্ঞতা আবারো হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে। দক্ষিণ কলকাতায় এক কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যাপকদের আড্ডায় প্রায় একই নাটক আরেকবার দেখলাম। একজন চটপটে তুখোড় বক্তা ঠোঁটে ধূমায়িত সিগারেট নিয়ে বিজ্ঞান্-অবিজ্ঞান-অধ্যাত্মবাদ-গুপ্তবিদ্যা নিয়ে অনর্গল কথা বলছিলেন। কথা বলার মাঝেই সামনে বসা অধ্যাপকের আঙুলটা টেনে নিয়ে তার গোমেদ-বসানো আংটির ওপর নিজের রুমালটা একপাক জড়িয়ে দিলেন টান টান করে। তারপরই জলন্ত সিগারেটের আগুনটা ঝপ্ করে চেপে ধরলেন রুমাল জড়ানো গোমেদের ওপর। হ্যাঁ, রুমালটা পুড়ল না। এবারেও সেই বিস্ময়।

'—দেখুন! স্টোন, মানে রত্নের শক্তি দেখুন। এরকম পরীক্ষা করে আপনারা দেখেন না তাই বিশ্বাসও করেন না। আমরা বিজ্ঞান জানি কিন্তু এটা জানি না যে, বহু গুপ্তবিদ্যা বা occult science আধুনিক বিজ্ঞানকে হার মানিয়ে দিতে পারে। প্রাচীনবিদ্যাকে আমরা বিদ্রূপ করি, ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করি, অথচ এভাবে হাতেনাতেই প্রমাণ করা যায়—রত্নের ক্ষমতা কত প্রবল। একটা ক্রিস্টালাইন সাবস্ট্যান্স মহাজাগতিক রশ্মিকে মানে 'কসমিক-রে'কে শুষে নিয়ে মানবদেহ এবং মনের অসাম্য অর্থাৎ ইমব্যালেন্সকে অ্যাডজাস্ট করে। বাইরের রেডিয়েশনের এই সিলেকটিভ অ্যাবসরপ্শন—রত্নের এ ধর্ম এত নিপুণ, এত প্রিসাইজ, যে কাপড় বা কোন বেরিয়ার সেখানে ফ্যাকটর নয়। কসমিক-রে সব অগ্রাহ্য করে রত্ন দিয়ে ঢুকে যায়। দেখলেন তো নিজের চোখেই।

সত্যিই তো, দেখলামই তো আমরা সবাই! রীতিমতো শক্তিশালী ব্যাপারই যেন মনে হয়। এত আকর্ষণীয় পরিভাষা সহযোগে ব্যাখ্যা, তায় আবার একজন বিজ্ঞান-জানা লোকের মুখে—এক কথায় মেনে নিতে ইচ্ছে হয়। কোর্টের সেই লোক আর এখানে 'বৈজ্ঞানিক' পরিমণ্ডলের বক্তা—এরকম অভিজ্ঞতা যে-কাউকে গুপ্তবিদ্যা বা রহস্যবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট করতেই পারে। কেমন গোলমাল পাকিয়ে যায় সব।···আসুন তাহলে একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই।

হাজার দেড়-দুই বছর আগে জাদুবিশ্বাসকে ভিত্তি করে আধা-বৈজ্ঞানিক বিদ্যাচর্চার মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছিল গুপ্তবিদ্যা বা occult science—অপ-রসায়ন, জ্যোতিষ, ডাইনীবিদ্যা ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশধারার সঙ্গে এই প্রাচীন-বিদ্যাগুলি তাল রাখতে পারে নি, ক্রমশ বিরাট ফারাক এসে গেছে ; মধ্যযুগের পর প্রাচীনত্বের স্থবির প্রাসাদে বন্দী রয়ে গেছে সেকেলে গুহ্যবিদ্যাগুলি। কিন্তু এদের মধ্যে চমক ছিল, কল্পনার রঙ-বাহারি খেলা ছিল, তাই আজও অনেকে এই গুপ্তবিদ্যাকে মূলধন করে সাধারণ মানুষকে মোহিত করে। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যতত্ত্বের কিছু প্রলেপ দিয়ে, এখানে ওখানে গোঁজ লাগিয়ে, নানাবিধ পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। যেমন—রত্ন-চিকিৎসা বা Gem Therapy, দূর-সংযোগ সমীক্ষণ বা Teletherapy, ফটো মাধ্যমে বিকিরণ চিকিৎসা বা Radiasthesia, চৌম্বক চিকিৎসা বা Magnetotherapy ইত্যাদি। আধা-অপবিজ্ঞান আর আধা-বিজ্ঞান মিশিয়ে এসব বিদ্যা এক বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় চেহারা নিয়েছে। আমাদের আলোচ্য প্রদর্শনী-দুটির বিষয়টাকেই উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক :

বলা হচ্ছে—মণি বা রত্নের ভেতর মহাজাগতিক রশ্মি শোষিত হয়ে ঢুকে যায়। আমরা এখন জানি, মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক-রে (Cosmic ray) অত্যন্ত শক্তিশালী তড়িৎ-কণার অদৃশ্য বিকিরণ যা পৃথিবীর বাইরেকার মহাকাশের দুনিয়া থেকে নেমে আসে। কিন্তু পার্থিব চৌম্বক বেল্টের পাহারায় এরা সরাসরি পৃথিবীর বুকে পড়তে পারে না ; যে সামান্য পরিমাণ গৌণ কসমিক রশ্মি শেষমেশ মাটিতে আসতে পারে তাদের তীব্রতা অতি নগণ্য ; আমরা প্রত্যহ এই অদৃশ্য রশ্মির পরিমণ্ডলেই ঘুরে বেড়াচ্ছি—কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ছে না ; তাহলে আংটির মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢুকে এই রশ্মি বাড়তি কি প্রভাব ফেলবে? কেমন হবে সে প্রভাবের প্রকাশ? জানা নেই। রত্ন-চিকিৎসার প্রবক্তারা এর উত্তর দেন না। অবশ্য তারা বোধহয় সূর্যালোকের সাতটা রং (যা রামধনুতে দেখা যায়) আর অতিবেগুনি ও অবলোহিত রশ্মিকেই মহাজাগতিক রশ্মি ধরেন জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দরুন। তা হলেও কিভাবে যে রশ্মিগুচ্ছ রত্নের মধ্যে একত্রে হুড়মুড় করে ঢুকছে সে প্রক্রিয়ার কথাও কিন্তু তারা বলেন না। আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে পরিচিত সমস্ত রত্নের কেলাসগঠন (Crystal structure) ও আণবিক সজ্জা ভূ-পদার্থবিদ্‌রা জেনেছেন ; এসব কেলাসিত বস্তুর (রশ্মি, আলো, তাপ ইত্যাদি) শোষণ ও বিকিরণের ধর্মও জানা হয়ে গেছে। সে জ্ঞানের নিরিখে আমাদের চমক-লাগানো প্রদর্শনীর ততোধিক চমকপ্রদ ব্যাখ্যার কোন

সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কি আধুনিক বিজ্ঞানের উর্ধ্বে কোন কিছু আছে যা দিয়ে ব্যাখ্যা মেলে? কিন্তু সেই "কিছু"টা কি? কোন্ রশ্মি কি ভাবে রত্নে ঢুকছে, ঢুকে কোন্ ধর্মের বলে নির্দিষ্ট বিকিরণ রত্নধারকের শরীরে যাচ্ছে এবং গিয়ে কিভাবে রোগ সারাচ্ছে, বিপদ কাটাচ্ছে, ভাগ্য ফেরাচ্ছে—এরকম অজস্র প্রশ্নের একটারও উত্তর গুপ্তবিজ্ঞানের প্রবক্তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

তা না-হয় না-ই পাওয়া গেল, কিন্তু এই চমৎকার প্রদর্শনীটা? ঘটনাটা ঘটছে তো! রত্নের গুণ না হলে অন্য কিভাবে এটা সম্ভব?…এ কৌতূহলের নিবৃত্তি সত্যিই দরকার।

প্রথম থেকেই রহস্যের আঁচে মন আচ্ছন্ন না করে নিজের হাতেই পরীক্ষাটা করা যেতে পারে। মণি-বসানো আংটি একটা জোগাড় করুন, গোমেদ বা পলা বা চন্দ্রকান্ত মণি—যে কোন একটা হলেই হবে। এক টুকরো কাপড়ে টান টান করে জড়িয়ে নিন ওটা—সেই কোর্টের রত্ন বিক্রেতা বা কলেজের বিজ্ঞানী ব্যক্তিটির মতোই। তারপর, কোনরকম ভণিতা না করে ওই অবস্থায় কাপড়টার গায়ে আগুন লাগান। দেখুন, কাপড়টা পুড়ছে না। এবার আংটির রত্নের বদলে একটা কাঁচের গুলি বা মসৃণ পাথরজাতীয় কিছুর ওপর একইভাবে কাপড় জড়িয়ে তাপ দিন, এবারেও পুড়বে না। তৃতীয় পর্যায়ে, অন্য যে-কোন অদাহ্য বস্তু (অর্থাৎ কাঠ, মোম, গালা ইত্যাদি ছাড়া) নিয়ে পরীক্ষাটা করুন। (কেবল খেয়াল রাখতে হবে জিনিসটা যেন মসৃণ হয়; জড়ানো কাপড়টা কুঁচকে থাকলে, ঢিলেঢালা থাকলে, অর্থাৎ লেপ্টে না থাকলে কিন্তু পুড়ে যাবে—'রশ্মি শোষণ' আর হবে না।) এক্ষেত্রেও একই ফল মিলবে। সুতরাং সহজ এবং একমাত্র সিদ্ধান্ত হলো—গোমেদ-পলা-মুন স্টোন ইত্যাদি রত্নের সঙ্গে অন্যান্য সাদামাটা বস্তুগুলির এ-ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই; রত্নের 'অ-সাধারণ শক্তি'র এই প্রমাণটা অন্তত ধোপে টিকছে না!

কিন্তু কাপড়টা কেন পোড়ে না বা জ্বলে না? আগে দেখা যাক, পোড়া বা দহন ব্যাপারটা কি। কোন দাহ্য বস্তু, ধরুন এক টুকরো কাপড় যখন যথেষ্ট তপ্ত কিছুর সংস্পর্শে আসে (যেমন দেশলাই শিখা কিংবা জ্বলন্ত সিগারেট) তখন আশ-পাশের বাতাসের অক্সিজেনের আওতায় স্পর্শবিন্দুটা জ্বলে ওঠে। এই জ্বলে ওঠা জায়গাটা এবার চারধারের লাগোয়া সুতোয় তাপ ছড়িয়ে দেয়। সেই তাপ আর অক্সিজেনের যৌথ প্রভাবে পাশের অঞ্চলটা পুড়ে ওঠে, সেখান থেকে আবার দহনের তাপ পাশে ছড়ায়—এইভাবে কাপড়ের টুকরোতে প্রথম পুড়ে ওঠা

বিন্দুটা দ্রুত গোলাকার হয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি পুরো ভেস্তে যায় যদি কাপড়টা কোনকিছুর সঙ্গে একেবারে লেপ্টে থাকে, কেননা তখন কাপড়ের একপিঠে কোন বাতাস বা অক্সিজেন সাপ্লাই থাকছে না; যেহেতু বিনা অক্সিজেনে জলন সম্ভব নয়, তাই তপ্ত শিখার ছোঁয়াতেও কাপড়ের স্পর্শবিন্দুটা জ্বলে উঠতে পারে না। আর, একবার পোড়া শুরু না হলে পরের ধাপগুলিও এগোতে পারে না অর্থাৎ দগ্ধ বৃত্ত পুড়তে পুড়তে দহন ছড়াতে পারে না। কেবল এক্কেবারে শুরুতে, আগুন ছোঁয়া লাগার সময়, কাপড়ের ওপরের তলটা ঝলসে যায় (ইংরেজিতে যাকে বলে charring)। গোড়াতে অল্প বাতাস লাগোয়া জায়গাটায় ছিল—তাতে অল্পই অক্সিজেন ছিল—ফলে অসম্পূর্ণ দহন। এতে কাপড়ের সুতোর রাসায়নিক উপাদান সেলুলোজ ঝলসে গিয়ে পোড়া কার্বন তৈরি করে—পুরোপুরি জ্বলে ছাই হয় না। এই ঝলসানো কার্বন দেখাও যায় চোখে; যে তিন ধাপে পরীক্ষা করা হলো তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—দেশলাই শিখা বা সিগারেটটা যেখানে কাপড় স্পর্শ করেছে সে জায়গাটা সামান্য কালচে বা খয়েরি বর্ণের হয়ে গেছে।

এই হলো ফাঁকি। এই হলো বিজ্ঞানের মুখোশ পরা ভুয়াবিজ্ঞান বা pseudo science। একটা চমক লাগানো ঘটনাকে সামনে রেখে অল্পবিদ্যা আর অর্ধজ্ঞানের ধোঁয়াটে ব্যাখ্যা দিয়ে সরাসরি কিছু মনগড়া সিদ্ধান্ত হাজির করার এই উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরী। মানুষের ক্লেশ, বঞ্চনা, বিভ্রান্তিকে মূলধন করে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বিজ্ঞানবিরোধী মতবাদীরা তাদের ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় রয়েছে এরকমই অনেক ভুয়া-বিজ্ঞানের শিখণ্ডীকে সামনে রেখে। কোর্টের সেই পাথর-বিক্রেতার ব্যবসা আর কলেজের সেই 'বিজ্ঞ' ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক-চিন্তার বিরোধিতা (বুঝে বা না-বুঝে) সাংস্কৃতিক স্তরে এক মারাত্মক ক্ষতিকারক বাষ্প ছড়িয়ে যাচ্ছে—এটা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

হস্তরেখার কি ও কেন

মনে পড়ে সেই ছোটবেলার চীনা গল্প। রাজ-জ্যোতিষী রাজার হাত গুণে বললেন, মহারাজ আপনার আয়ু আর মাত্র দশ দিন। রাজা বললেন, আপনি নিজের হাতটা গণনা করে দেখুন তো আপনার আয়ু কত? জ্যোতিষী বললেন, এখনো বেশ কয়েক বছর আছি। রাজা তখনই কোতোয়ালকে ডাকলেন। রাজসভাতেই গণনার বাণীকে নস্যাৎ করে রাজজ্যোতিষীর গর্দান নেওয়া হলো।

চোখের সামনে হাতটা মেলে ধরলে ছোট-বড়,সূক্ষ্ম-স্থূল অসংখ্য দাগ দেখা যায়। এককথায় এদের সবাইকেই হস্তরেখা বলা গেলেও প্রকৃতি অনুযায়ী এদের দুটো পৃথক ভাগ আছে। মোটা দাগগুলো হলো ভাঁজ বা crease, যেমন আঙ্গুলের তিনটি করে কররেখা, হাতের তালুর হৃদয়রেখা (heart line), শিররেখা (head line,) আয়ুরেখা (life line)—এই সব। আর আছে সূক্ষ্ম রেখাগুলি বা ridge ; খুব নজর করে দেখলে দেখা যাবে এরা লুপ, আর্ক ইত্যাদি বিশেষ প্যাটার্ন করে আছে। হস্তরেখা বিচার করে যে অতীত ভবিষ্যৎ গণনার বিদ্যা রয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কের অবসান করার উদ্দেশ্যে এই রচনা নয়। আমি কেবল হস্তরেখার বৈজ্ঞানিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব —পরবর্তী ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের দায় পাঠকের।



ভাগ্য মানুষের হাতে



মানুষের হাতেই ভাগ্য

ভাঁজ (Crease) বা রেখা (Ridge) উভয়েই একইভাবে তৈরি হয়। এরা দেহ-গঠনতান্ত্রিক বা আনাটমিক্যাল খাঁজ ছাড়া কিছু নয়। মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণ তৈরি হতে থাকে তখন হাতের বিভিন্ন হাড়ের জয়েন্ট বরাবর তালু এবং আঙ্গুলের চামড়া ভাঁজ হয়ে বিভিন্ন দাগ তৈরি করে। শিশু মায়ের গর্ভে হাত মুঠো করে থাকে, তা থেকেই চামড়ার ভাঁজের রেখা তৈরি হয়। তবে কেন যে এমন হাত মুঠো করা থাকে সেটা ঠিকঠাক বলা মুশকিল। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা—অভিব্যক্তির (evolution) সূত্র ধরে এই প্রকৃতি শিশুর মধ্যে আসতে পারে, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব-পূর্ব-পুরুষদের গাছের ডাল আঁকড়ে থাকার অভ্যেসটা বংশগতির সূত্রে চলে আসছে। আর অন্য মতে, ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন—কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকা বা অবলম্বন করে থাকা মনুষ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

চামড়ার নিচে আছে মাংসপেশী। এই মাংসপেশীর ওপর মাপে মাপে চামড়া এঁটে বসে আছে, টাইট রাবারের দস্তানা যেমন থাকে। ভ্রূণ অবস্থায় ৭/৮ সপ্তাহের মধ্যে শিশুর মাংসপেশী ও চামড়া তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু ওই সময়ে মাংসপেশীগুলোতে জলের ভাগ বেশি থাকে, ফোলা ফোলা ভাব থাকে। ১২/১৪ সপ্তাহ নাগাদ পেশীতে জলের ভাগ কমে, ফলে তাদের সংকোচনও হতে থাকে। পেশী-সংকোচনের দরুন তার ওপরকার চামড়ার টান (tension) কমে যায়, ফলে চামড়া কুঁচকে ভাঁজ (skinfold) তৈরি করে। আমরা জানি দেহের মাংসপেশীরা পেশীতন্তু বা muscle-fibres দিয়ে তৈরি। শিশুর বৃদ্ধির সাথে সাথে কোঁচকান চামড়ার খাঁজগুলো ক্রমে দাগে পরিণত হয়—এক একটা পেশীতন্তুর সংকোচন থেকে এক একটা সূক্ষ্ম রেখা বা ridge তৈরি হয়। যেখানে ছুটো প্রধান পেশীখণ্ডের জোড় আছে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই চামড়ার ভাঁজ বেশি গভীর হবে, আর সেখানেই তৈরি হবে skin crease—অর্থাৎ—আমাদের পরিচিত আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা ইত্যাদি।

কারুর হস্তরেখার সাথে তার জীবনের ভালোমন্দ, উন্নতি-অবনতি, অতীত-ভবিষ্যতের ঘটনা-দুর্ঘটনার কোন সম্পর্ক বিজ্ঞান স্বীকার করে না বলাই বাহুল্য, কেননা হস্তরেখা ও ভাগ্যের কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, যোগসূত্র নেই। তবে হাত ও আঙ্গুলের সুসম্বদ্ধ নড়াচড়ার জন্য রেখা ও ভাঁজগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো না থাকলে সূক্ষ্ম কাজকর্ম হাত দিয়ে করা সম্ভব হতো না। নৃবিজ্ঞানীরা (Anthropologists) বলেন, হাতের প্রধান তিনটে রেখা আঙ্গুলের নড়াচড়ার সাথে সম্পর্কিত। জন্ম থেকে যদি কারুর বুড়ো আঙ্গুল (thumb)

না থাকে, তবে তার আয়ুরেখাও থাকবে না। (তাহলে কি তার একদিনও বাঁচার কথা নয়?)

বিজ্ঞানী কিউমিন্‌স ও মিড্‌লো দেখেছেন (Science To-day, June '80) পরিণত বয়সে প্রধান রেখাগুলি (Distal crease বা হৃদয় রেখা, Proximal crease বা শিররেখা, Radial Longitudinal crease বা আয়ুরেখা) পাল্টায় না। তবে ছোট ছোট রেখা তৈরি হতে বা মুছে যেতে পারে—এর সবটাই নির্ভর করবে চামড়ার নিচের মাংসপেশীগুলির সঙ্কোচন-প্রসারণের ওপর, অর্থাৎ ব্যক্তির জীবিকা বা হাতের দৈনন্দিন নড়াচড়ার ওপর। অবশ্য কোন্ কাজকর্মের জন্য হস্তরেখা কেমনভাবে পাল্টায় তার কোন নির্দিষ্ট ফর্মুলা আদৌ নেই, তার কর্মফলের ছবি হাতে ওঠা ও হস্তরেখা বিচারে সে ফল বলে দেওয়ার কোন সুযোগও বিজ্ঞানে নেই।

সুভাষ সান্যাল

অক্টোবর ১৯৮০

হস্তরেখা বিচার

নিচের এই হস্তরেখা বিচার করেছেন হাওড়ার বালী অঞ্চলের এক প্রখ্যাত পেশাদার হস্তরেখাবিদ,



গণনায় বলা হয়েছে—

☐ জাতক কানে কম শোনে ☐ অসম্ভব মেজাজ ☐ মৃগী রোগে আক্রান্ত তাই ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যায় ☐ পেটের গণ্ডগোল আছে, শ্লেষ্মার ধাত আছে খুব ☐ ব্রেন ভালো, পড়াশুনা খুব ভালো হবে, তবে অসম্ভব জেদী ☐ ১৩ বছরের মধ্যে বার তিনেক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ☐ ২৩ বছরের পর উপার্জনশীল হবে ☐ আয়ু মধ্যম অর্থাৎ ৬০/৬২ বছর বাঁচবে ☐ বিপদ কাটাতে ৭ রতি মুক্তা ধারণ করা দরকার। /

কার এই হাতের ছাপ

একটি **বানরের**। নাম : রামু, বয়স : ১ বছর ৪ মাস। মালিক : সুব্রত কুমার পাল, ১৭ সদ্‌গোপপাড়া, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। সুব্রতবাবুর কাছ থেকে যে সব তথ্য জানা গেছে তা হলো : রামুর কান খুবই সজাগ, বেশ ভালো শোনে। মৃগীর কোন লক্ষণ নেই। মেজাজ একটু গরমই বটে। শরীরের অবস্থা ভালো, সর্দির ধাত খুবই কম। ব্রেন মনে হয় আর পাঁচটা বানরের মতোই—যেমন বুদ্ধি থাকে। তবে জেদ করে না। বানর তো বাঁচেই বছর ১২/১৩ অব্‌দি, উপার্জন আর কবে করবে? এরপর মধ্যম আয়ুর কথা আর আসে না। বানরের গলায় মুক্তা মানাবে কি?

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২

অন্যান্য উৎস মানুষ সংকলন

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান / বারো টাকা

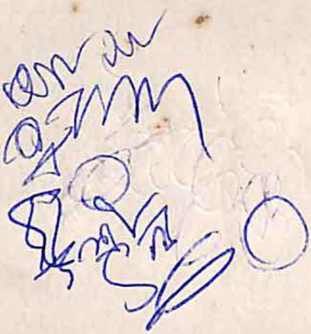
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় / ষোলো টাকা

শেকলভাঙা সংস্কৃতি / বারো টাকা

এটা কি ওটা কেন / বারো টাকা

বিবেকানন্দ অন্যচোখে / দশ টাকা

প্রমিথিউসের পথে / ছয় টাকা



'মানুষ নিজেই তার ভাগ্য গড়ে নেয়', 'Man is the architect of his fate'—একথা জেনেও আমরা রাস্তাঘাটের বিজ্ঞাপনে, পথ-চলতি কথাবার্তায়, ঠিকুজি-কোষ্ঠী, ভাগ্য, গ্রহরত্নের প্রতি অন্ধ-নির্ভরতাকে দিব্যি বাঁচিয়ে রেখেছি। এই হতাশাক্লিষ্ট, সমস্যাজর্জরিত অসহায় মনের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে জ্যোতিষ, হস্তরেখা, ভাগ্য, মাদুলী, রত্ন। জ্যোতিষ-গণনার ভিত্তি, আশ্বাস-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা-বিচার এবং প্রতারণার স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টাই এই বইটির প্রয়াস।



উপরের ছবি : সুকুমার রায়-এর 'আবোল তাবোল' থেকে নেওয়া।